নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০৮)

এম. ফিল. গবেষক ঃ
মোঃ ইমরুল কায়েস
রেজিঃ নং ৩১৮
সেশন ঃ ২০০৯-২০১০

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০৮)

তত্ত্বাবধায়ক ঃ
ড. শওকত আরা হোসেন
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম. ফিল. গবেষক ঃ
মোঃ ইমরুল কায়েস
রেজিঃ নং ৩১৮
সেশন ঃ ২০০৯-২০১০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনের তারিখ ঃ মে ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়

আব্বা ও আম্মাকে

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০৮)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

মোঃ ইমরুল কায়েস
এম. ফিল. গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য মোঃ ইমরুল কায়েস লিখিত "নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০৮)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার তত্ত্বাবধানে তার লিখিত একটি গবেষণা। লেখকের বর্ণনামতে এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেননি।

ড. শওকত আরা হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০৮) শীর্ষক গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করতে পেরে আমি প্রথমেই পরম করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। এই গবেষণাকর্মে তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতার জন্য আমি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেনের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সকল সময় আন্তরিকভাবে মূল্যবান সময় দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা এবং কার্যকর উপদেশ প্রদানের জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কেননা শ্রদ্ধেয় ম্যাডামের সুদৃঢ় সমর্থন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ব্যতীত আমার পক্ষে গবেষণাটি সম্পন্ন করা কষ্টকর হত।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণাটির জরিপ সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের প্রতি যারা আমাকে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন। আমি সর্বাধিক সহযোগিতা পেয়েছি আমার নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য সকলকে অনেক ধন্যবাদ। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক, তাত্ত্বিক ও গবেষকদের মৌলিক কর্ম আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে। এজন্য তাঁদের প্রতি আমার অশেষ কতৃজ্ঞতা।

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরন করছি আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মা ও ভাই-বোন এবং আমার আত্মীয়-স্বজনদেরকে । যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং এতদূর পর্যন্ত আসতে আমাকে সহায়তা করেছেন। সবশেষে আমার স্ত্রী লামইয়া মোস্তফা'র নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ব্যস্ততার মাঝেও তার দেয়া উৎসাহ ও সহায়তা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে একমাত্র কণ্যা সাইহা'কে যথাযথ সময় দিতে পারিনি। কতৃজ্ঞতা তোমাকেও।

তারিখ ঃ

মোঃ ইমরুল কায়েস

Dhaka University Institutional Repository

সারমর্ম

বর্তমান সময়কে গণমাধ্যমের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। গণমাধ্যম নির্ভরতা বর্তমান সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সমাজে সম্ভবত এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে গণমাধ্যম প্রবেশ করছে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রাজনীতির বিশাল পরিমন্ডলটিও বহুলাংশে গণমাধ্যমের প্রভাব বলয়ের মধ্যে চলে এসেছে। অর্থাৎ গণমাধ্যমের ভূমিকা বহুলাংশেই রাজনৈতিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে বা হচ্ছে। গণমাধ্যম রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কি ধরণের ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে গবেষণাকর্মটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের মতে, বর্তমান বিশ্বে 'গণতন্ত্রায়নের তৃতীয় স্রোত' বইছে। তাঁর এমন মন্তব্যের পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তিটি হচ্ছে এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও অনুশীলনকে এগিয়ে নেয়ার মূল নিয়ামক হলো নির্বাচন।

গণমাধ্যম প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক উপায়ের মধ্য দিয়ে তথ্য প্রযুক্তির যুগে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। 'দেখলে বিশ্বাস বাড়ে'- এই প্রত্যয় গণমাধ্যমকে অনিবার্য বাস্তবতায় পর্যবসিত করেছে। নির্বাচকমন্ডলী ও নির্বাচনী মাঠের স্টেকহোল্ডারদের চোখ-কান হিসেবে ভূমিকা পালন করছে গণমাধ্যম। গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা বহাল রাখা, নির্বাচন নিয়মিত ভিত্তিতে আয়োজন ইত্যাদি ব্যাপারে গণমাধ্যম বাংলাদেশ ভূখন্ডে বরাবর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার-দুটো মিডিয়াই জাতীয় নির্বাচনসহ অন্যান্য সকল নির্বাচনের সময় বস্তুনিষ্ঠ গণমাধ্যম হিসেবে নয় বরং ক্ষমতাসীনদের প্রচারযন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারকে অনেকে তুলনা করেন আলাদিনের অনুগত দৈত্যের সঙ্গে। জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রের পাশাপাশি ডজন তিনেক টেলিভিশন চ্যানেল, এফ এম রেডিও চ্যানেলের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্ত হয়েছে অনলাইন সংবাদপত্র। সবমিলিয়ে সংবাদময় গণমাধ্যমের অবয়ব নিয়েছে বাংলাদেশ। তবে যে হারে গণমাধ্যমের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিকাশ ঘটেছে এই ভূখন্ডে সে অনুপাতে বাড়েনি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার ও প্রকাশের স্বাধীনতা। আর সেটা আমরা লক্ষ্য করি দেশে নির্বাচনকালীন সময়ে কিছু কিছু গণমাধ্যমের নির্বাচনী রিপোর্ট প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যমে। আধুনিককালে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন পরিচালনা কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা থাকা তাই অপরিহার্য। বাংলাদেশে গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু অনেক বছর যাবৎই নির্বাচন কমিশন আস্থার সংকটে পড়ে। আর এমনটি ঘটে প্রতিষ্ঠান হিসেবে আস্থাভাজন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কমিশনের নিজস্ব অক্ষমতার কারণেই।

আইনি ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী করাই যথেষ্ঠ নয়, সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই দৃঢ় বিশ্বাস, সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োজিত করতে হবে, যাতে তাঁরা জনগণের আস্থা বজায় রাখতে পারেন। এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালি থাকতে হবে, যাতে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিরা কোনো রকম দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ে চিহ্নিত না হন এবং প্রতিষ্ঠানটির ওপর ন্যস্ত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেন। জনগণের আস্থা অর্জনের পরই কেবল নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সফল নির্বাচনী সংস্কারের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। শুধু আইন জারির দ্বারাই নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবে না, এজন্য স্বাধীন, মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চালকের আসনে বসাতে হবে। স্বাধীন শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের জন্য এটাই হচ্ছে প্রধান ও প্রাথমিক মানদন্ড।

গণমাধ্যম এমন একটি শক্তি যা হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে। গণমাধ্যমই গণতন্ত্রে ভোটারদের তথ্যের জন্য সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। গণমাধ্যম নির্বাচনের নানা বিষয় তুলে ধরে জনগণ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারকে সচেতন করতে পারে। নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনেক। কিন্তু গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা কতখানি? গণমাধ্যম আসলেই কী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে? সংবাদ প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের আদৌ কী কোন নিরাপত্তা আছে? এ গবেষণাকর্ম থেকে রাজনীতিতে, বিশেষত নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কিত অনেক তথ্য যেমন বেরিয়ে এসেছে তেমনি এক্ষেত্রে গবেষণার বিভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামোরও উদ্ভব ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

সারণি ৪.১ ঃ নিবার্চন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী পূর্ব প্রস্তুতি

সারণি ৪.২ ঃ ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা মার্চ পর্যন্ত মোট সম্প্রচার ঘন্টার অনুষ্ঠানভিত্তিক সময় বন্টন

সারণি ৪.৩ ঃ নির্বাচনের ওপর অনুষ্ঠানমালার সময় বন্টন

সারণি ৪.৪ ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় দলগতভাবে প্রার্থীদের সংখ্যা

সারণি ৪.৫ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ১৯৯১

সারণি ৪.৬ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভোট বিষয়ক তথ্য

সারণি ৪.৭ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব

সারণি ৪.৮ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও নারী সাংসদদের বয়সসীমা

সারণি ৪.৯ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স

সারণি ৪.১০ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের এবং মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা

সারণি ৪.১১ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে সাংসদদের রাজনীতি শুরুর বয়স

সারণি ৪.১২ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদান সন

সারণি ৪.১৩ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে

সারণি ৪.১৪ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

সারণি ৪.১৫ ঃ পঞ্চম সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদের সামাজিক পরিচিতি

সারণি ৪.১৬ ঃ ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

সারণি ৪.১৭ ঃ ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের অবস্থান

সারণি ৫.১ ঃ ড. ফখরুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাগণ

সারণি ৫.২ ঃ নবগঠিত উপদেষ্টা পরিষদ

সারণি ৫.৩ ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৫ বিশেষ সহকারী নিয়োগ দেন

সারণি ৫.৪ ঃ রাজনৈতিক দল, প্রতীক এবং ষোষিত আসনসংখ্যা

সারণি ৫.৫ ঃ জোট ও দলওয়ারী ফলাফল (৩০০টি আসন)

সারণি ৫.৬ ঃ বিভাগওয়ারী এবং দলভিত্তিক নির্বাচনী ফলাফল

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০৮)

পৃষ্ঠা নং

ঘোষণাপত্র ঃ iii

প্রত্যয়নপত্র ঃ iv

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ v

সারমর্ম ঃ vi

সারণি তালিকা ঃ vii

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ..... ০১ - ০৯

১.১ গবেষণার সমস্যা ..... ০১ - ০২

১.২ গবেষণার গুরুত্ব ..... ০২ - ০৩

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ..... ০৩ - ০৪

১.৪ অনুকল্প গঠন ০৪

১.৫ পুস্তক ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা ..... ০৪ - ০৬

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি ..... ০৬ - ০৭

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ০৭

১.৮ অধ্যায়সমূহের বিবরণ ..... ০৭ - ০৮

১.৯ উপসংহার ০৮

১.১০ তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ০৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নির্বাচন ও গণমাধ্যম ১০-৩১

২.১ ভূমিকা ১০

২.২ নির্বাচন ..... ১১ - ১২

২.২.১ নির্বাচনের গুরুত্ব ..... ১২ - ১৩

২.৩ নির্বাচন পদ্ধতি পর্যালোচনা ..... ১৩ - ১৪

২.৪ নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ..... ১৪ - ১৭

২.৫ গণমাধ্যম ..... ১৭ - ১৮

২.৫.১ গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও প্রভাব ..... ১৮ - ১৯

২.৫.২ সমাজে গণমাধ্যমের ব্যবহার ..... ১৯ - ২১

২.৫.৩ গণমাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব ..... ২১ - ২৩

২.৬ গণমাধ্যম ও তার স্বাধীনতা ..... ২৩ - ২৫

২.৭ নির্বাচনে গণমাধ্যমের গুরুত্ব ..... ২৫ - ২৬

২.৮ নির্বাচন ও তথ্য অধিকার ..... ২৬ - ২৮

২.৯ নির্বাচন ও গণমাধ্যম..... ২৮ - ২৯

Dhaka University Institutional Repository

২.১০ উপসংহার ..... ২৯ - ৩০
২.১১ তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৩১

তৃতীয় অধ্যায় ঃ নির্বাচন, গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ৩২- ৫৭
৩.১ ভূমিকা ৩২
৩.২ বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতি ..... ৩৩ - ৩৪
৩.৩ নির্বাচন ও সংবিধান ৩৪
৩.৪ নির্বাচন কমিশন ও তার ক্ষমতা..... ৩৫
৩.৪.১ নির্বাচন কমিশন : গঠন ও কার্যপ্রনালী ৩৫- ৪৪
৩.৫ নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন ..... ৪৪ - ৪৫
৩.৬ গণতন্ত্র ..... ৪৫ - ৫১
৩.৭ নির্বাচন ও গণতন্ত্র ..... ৫১ - ৫২
৩.৮ গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র ..... ৫২ - ৫৪
৩.৯ গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ..... ৫৪ - ৫৫
৩.১০ উপসংহার ৫৬
৩.১১ তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৫৭

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন -১৯৯১ ও গণমাধ্যম ..... ৫৮ - ৯১
৪.১ ভূমিকা ৫৮
৪.২ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের
অধীনে নির্বাচন ৫৯- ৬০
৪.২.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ..... ৬০ - ৬২
৪.২.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন..... ৬২
৪.২.৩ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত ..... ৬২ - ৬৪
৪.৩ নির্বাচনের পূর্বে গণমাধ্যমের ভূমিকা ..... ৬৪ - ৭০
৪.৪ নির্বাচনকালীন গণমাধ্যমের ভূমিকা ..... ৭০ - ৭৫
৪.৫ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা ..... ৭৫ - ৮৫
৪.৬ নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন পর্যবেক্ষক ও
প্রতিষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া ৮৫- ৮৭
৪.৭ ১৯৯১ সালের নির্বাচন ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়ন ..... ৮৮ - ৯
৪.৮ উপসংহার ..... ৮৯ - ৯০
৪.৯ তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৯১

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন -২০০৮ ও গণমাধ্যম ..... ৯২ - ১৩৩
৫.১ ভূমিকা ৯২
৫.২ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও ওয়ান ইলেভেন প্রসঙ্গ ..... ৯২ - ৯৫
৫.৩ নবগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার : নবম সংসদ নির্বাচন ২০০৮ ..... ৯৬ - ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ নির্বাচনের পূর্বপ্রস্তুতি ..... ৯৮ - ৯৯
৫.৫ নির্বাচনের পূর্বে গণমাধ্যমের ভূমিকা ..... ১০০ - ১১১
৫.৬ নির্বাচনকালীন গণমাধ্যমের ভূমিকা..... ১১১ - ১২১
৫.৭ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা ..... ১২১ - ১২৫
৫.৮ নির্বাচন সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া..... ১২৫ - ১৩১
৫.৮.১ নবম সংসদ নির্বাচন ও গণতন্ত্রায়ন ১৩১
৫.৯ উপসংহার ১৩২
৫.১০ তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ১৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উপসংহার ..... ১৩৪ - ১৩৭
সুপারিশমালা ..... ১৩৭ - ১৩৯

তথ্যসূত্র ও
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ ..... ১৪০ - ১৪৫

পরিশিষ্ট ঃ পরিশিষ্ট-১ ঃ গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনার হিসাব ১৪৬
পরিশিষ্ট-২ ঃ গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাতকারসমূহের বিবরণ..... ১৪৭ - ১৪৯
পরিশিষ্ট-৩ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার.... ১৫০ - ১৫১
পরিশিষ্ট-৪ ঃ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ
বিধিমাল, ২০০৮ ..... ১৫২ - ১৫৭
পরিশিষ্ট-৫ ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৩-২০০৮..... ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq

f~wgKv

বর্তমান সময়কে গণমাধ্যমের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। গণমাধ্যম নির্ভরতা বর্তমান সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সমাজে সম্ভবত এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে গণমাধ্যম প্রবেশ করছে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রাজনীতির বিশাল পরিমন্ডলটিও বহুলাংশে গণমাধ্যমের প্রভাব বলয়ের মধ্যে চলে এসেছে। অর্থাৎ গণমাধ্যমের ভূমিকা বহুলাংশেই রাজনৈতিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে বা হচ্ছে। গণমাধ্যম রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কি ধরণের ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে গবেষণাকর্মটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের মতে, বর্তমান বিশ্বে 'গণতন্ত্রায়নের তৃতীয় স্রোত' বইছে।[১] তাঁর এমন মন্তব্যের পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তিটি হচ্ছে এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও অনুশীলনকে এগিয়ে নেয়ার মূল নিয়ামক হলো নির্বাচন। সুষ্ঠু, সুন্দর, অবাধ ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটে, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এবং একটি দেশ জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। আর এই পুরো প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গণমাধ্যম প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক উপায়ের মধ্য দিয়ে তথ্য প্রযুক্তির যুগে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। 'দেখলে বিশ্বাস বাড়ে'- এই প্রত্যয় গণমাধ্যমকে অনিবার্য বাস্তবতায় পর্যবসিত করেছে।[২] নির্বাচকমন্ডলী ও নির্বাচনী মাঠের স্টেকহোল্ডারদের চোখ-কান হিসেবে ভূমিকা পালন করছে গণমাধ্যম। গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা বহাল রাখা, নির্বাচন নিয়মিত ভিত্তিতে আয়োজন ইত্যাদি ব্যাপারে গণমাধ্যম বাংলাদেশ ভূখন্ডে বরাবর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।[৩] অতএব গবেষণাটি বাংলাদেশের নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যথাযথভাবে পালনে সহায়ক হবে। তাছাড়া গবেষণা সমস্যা নির্বাচন করা একজন গবেষকের জন্য গবেষণাকর্মের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণা সমস্যা মূলত যে ব্যাপারে জনমনে ব্যাপক জিজ্ঞাসা রয়েছে এবং তার উত্তর সন্ধান সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে ১৯৯১ ও ২০০৮ এর অনুষ্ঠিত দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনকালীন ও নির্বাচনোত্তর সময়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে গবেষণাটি করা হয়েছে।

1.1 M‡elYvi mgm¨v

জে জি ব্লামলার ও ডেনিশ ম্যাককুয়েল বলেছেন "যার বাড়িতে টেলিভিশন ও রেডিও দুটোই আছে, সে নির্বাচনসংক্রান্ত খবরাখবর ও অনুষ্ঠানমালার জন্য প্রায় পুরোপুরিভাবেই নির্ভর করে টেলিভিশনের ওপর।"[৪] আসলে শুধু নির্বাচনের সময় নয়, টেলিভিশন সবসময়ই রেডিওর তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয়। সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার-দুটো মিডিয়াই জাতীয় নির্বাচনসহ অন্যান্য সকল নির্বাচনের সময় বস্তুনিষ্ঠ গণমাধ্যম হিসেবে নয় বরং ক্ষমতাসীনদের প্রচারযন্ত্র হিসেবে

[১] Huntington, Samuel P. : *Democracy's third wave, JOURNAL OF DEMOCRACY*, Spring, 1991.

[২] Dreyer & Rosenbaum, Roper Organization, '*An extended View of Public Attitudes Towards Television and other Media'*, 1969-71, P.153.

[৩] ভূঁইয়া, এম সাইফুলণ্ঢাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbevPb I MYZš¿ t †c¶vcU evsjv‡`k" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪,অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৯।

[৪] Blumler & Gurevitch, '*Political Effects of Mass Communication'*, 1983, P-245.

কাজ করেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারকে অনেকে তুলনা করেন আলাদিনের অনুগত দৈত্যের সঙ্গে। জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রের পাশাপাশি ডজন তিনেক টেলিভিশন চ্যানেল, এফ এম রেডিও চ্যানেলের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্ত হয়েছে অনলাইন সংবাদপত্র। সবমিলিয়ে সংবাদময় গণমাধ্যমের অবয়ব নিয়েছে বাংলাদেশ। তবে যে হারে গণমাধ্যমের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিকাশ ঘটেছে এই ভূখন্ডে সে অনুপাতে বাড়েনি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার ও প্রকাশের স্বাধীনতা।[৫] আর সেটা আমরা লক্ষ্য করি দেশে নির্বাচনকালীন সময়ে কিছু কিছু গণমাধ্যমের নির্বাচনী রিপোর্ট প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যমে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকার পাশাপাশি বেশ কিছু ব্যার্থতাও ছিল। যুদ্ধাপরাধীদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি প্রমাণিত দুর্নীতিপরায়ণ প্রার্থীদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশে সংবাদমাধ্যমগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। নির্বাচনের আগে এবং পরে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ওপর সংবাদ প্রচারে কিছু বেসরকারী চ্যানেল রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন করেছে। এক্ষেত্রে, সমস্যা হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমগুলোর সাংবাদিকদের নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নে গণমাধ্যমের সঠিক তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা কতখানি? গণমাধ্যম কী আসলেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে? সঠিক সংবাদ প্রকাশের জন্য গণমাধ্যম কর্মীদের আদৌ কী কোনো নিরাপত্তা আছে?[৬]

1.2 M‡elYvi ¸iæZ

সুষ্ঠু, সুন্দর, অবাধ ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটে, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এবং একটি দেশ জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। আর এই পুরো প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।[৭] গণমাধ্যমই গণতন্ত্রে ভোটারদের তথ্যের জন্য সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। গণমাধ্যম নির্বাচনের নানা বিষয় তুলে ধরে জনগণ, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারকে সচেতন করতে পারে। গণমাধ্যম নির্বাচনে দুর্নীতিরোধ, যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে জনগণকে সজাগ করা এবং সকল অনিয়ম উদঘাটনে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই নির্বাচনকেন্দ্রিক সংবাদ ও এ সংক্রান্ত ভাবনা শুরু করে।[৮] গণমাধ্যমে নির্বাচনী বছর কথাটাও আগে থেকে চালু হয়ে যায়। গণমাধ্যম ভোটার মতামত জরিপ, প্রার্থী বাছাই, নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে খবরাখবর, নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় নিয়ে সরকারের ভাবনা-চিন্তা, রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী সংস্কারের দাবি, নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, নির্বাচনী জোট গঠন প্রক্রিয়া, বিভিন্ন আমলে দলগুলোর তুলনামূলক শক্তি, বিভিন্ন ইস্যুতে দলগুলোর অবস্থান, সম্ভাব্য প্রার্থীদের পরিচিতি, দুর্বলতা ও সামর্থ, অতীত নির্বাচন নিয়ে গবেষণা, অন্যান্য নির্বাচন নিয়ে জরিপ, জনগণ যে ইস্যুগুলোকে জাতীয় জীবনের জন্য জরুরী বলে ভাবছে- রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যে সেগুলোর প্রতিফলন আছে কিনা,

---

[৫] মঞ্জু, কামরুল হাসান, হীরা, মান্নান ও ইসলাম, শেখ শফিউল, Ògy³ cKvkÓ ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৮, পৃ.৭-৮, ১২-১৫,২১-২৬।

[৬] তাহ্‌মিনা, কিউ এ ও গাইন, ফিলিপ, mvsew`K mnwqKv ÒZ\_¨cwÄ wbevPbx wi‡cwUsÓ evsjv‡`‡ki msm`xq wbevP‡b cvmw½K Z_¨ I cUfwg, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, (সেড), ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.-৩৪, ৫০-৫৪।

[৭] বেগম, এস এম আনোয়ারা, ÒZËveavqK miKvi I evsjv‡`‡ki mvaviY wbevPbÓ, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৮-৪৭ ।

[৮] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, beg RvZxq msm` wbevPb cwµqv wbix¶v, ২০১০, ঢাকা পৃ.১-১০।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ইত্যাদি বিষয়ে নির্বাচনপূর্ব প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে।[৯] এছাড়া গণমাধ্যম নির্বাচন ঘোষণার দিন থেকে ফলাফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন, ঘোষিত তফসিল, আচরণ বিধির সংযোজনী, রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর তৎপরতা ও প্রতিবেদন, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়ন বঞ্চিত প্রার্থীদের তৎপরতা, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পরিচিতি ও কর্মকান্ড, নির্বাচনী জনসভা, প্রার্থী পরিচিতি, কেন্দ্রিয় নেতাদের বক্তব্য, স্থানীয় জনগণের মনোভাব, নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি (নির্বাচন কমিশনের, রাজনৈতিক দলগুলোর, প্রার্থীদের, স্থানীয় প্রশাসনের), জনমত জরিপ (ভোটের ফলাফল যেমন হতে পারে তার আভাস, ভোটকেন্দ্রের পরিস্থিতি), নারী ভোটারদের অবস্থা ও অবস্থান, নির্বাচনে নারী আসন বিষয়ক, ভোট গ্রহণ পরিস্থিতি, ভোটের দিন কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা ছাড়াও নির্বাচনোত্তর সময়ে গণমাধ্যমের ফলাফলকে স্বাগত জানিয়ে উল্লাস, নির্বাচনী ফলাফল বর্জনের ঘটনা, নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের প্রতিবেদন, রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যার মূল্যায়ন, সরকার গঠনের বিভিন্নমূখী তৎপরতা, একাধিক আসনে বিজয়ীদের ছেড়ে দেয়া আসনগুলোতে উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন হামলা, নির্যাতন, মামলা, হত্যার ঘটনা বিষয়ে প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করে জনগণকে সচেতন করতে পারে। এসব বিষয় ছাড়াও নির্বাচনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে গবেষণাকর্মটিতে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১০]

1.3 M‡elYvi D‡Ïk¨

গবেষণা হচ্ছে তথ্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অন্য কথায় বারবার অনুসন্ধান। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কিছুর সংযোজন। আর নতুন কিছুর সংযোজনের জন্য প্রয়োজন হয় অনুসন্ধানের। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে একদিকে যেমন তথ্য আবিষ্কার হয় তেমনি পুরনো তথ্য ভুল প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ যখন সুসংঘবদ্ধ কর্মতৎপরতা বা কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রচলিত জ্ঞানের সত্যতা যাচাই ও নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি বা সংযোজন করা হয় তখনই তাকে গবেষণা বলে।[১১] আর এ গবেষণাকর্ম পরিচালনার পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। কারণ উদ্দেশ্য ছাড়া কোন অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। নিম্নে গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরা হলো ঃ

১। বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে পেশীশক্তি ও কালোটাকার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিরূপন করা।

২। নির্বাচনী বিধি প্রনয়ণ, আধুনিক ব্যালট বাক্সের প্রচলন, ভোটার পরিচয়পত্র প্রণয়নসহ কর্তৃপক্ষের নির্বাচন স্বচ্ছকরণে বর্তমান পদ্ধতি এবং এর আধুনিকায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।

৩। যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে গণমাধ্যম চাপসৃষ্টিকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে কিনা তার সম্যক দৃষ্টান্ত দেখানো। উদাহরণস্বরূপ স্বৈরাচারী সরকারও গণমাধ্যমের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

[৯] হোসেন, ড. নাজমুল ও এল, ড. ক্যারেন ÒB‡jKkb gwbUwis IqvwKs M"c (BGgWeeDwR) cwZ‡e'bÓ দি এশিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই-২০০২, পৃ.১৩।

[১০] টিম, ফাদার আর ডবিণ্ডউ ও গাইন, ফিলিপ, ÒwbevPb ch‡e¶Y wi‡cvU 1991Ó বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, সেপ্টেম্বর -১৯৯১, পৃ. ৬৫-৬৯।

[১১] হোসেন, এম. সাখাওয়াত (অব.) ÒwbevPb Kwgk‡b cvP eQiÓ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা,২০১৩, পৃ. ২০৬-২১২।

Dhaka University Institutional Repository

৪। সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে গণমাধ্যম যে 'ওয়াচ ডগের' ভূমিকা পালন করছে এবং আরও কী কী করতে পারে তা চিহ্নিত করা।

৫। নির্বাচনোত্তর ও পরবর্তী সহিংসতা, অপ্রীতিকর ঘটনা হ্রাসে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।

৬। নির্বাচন ও ভোটসংক্রান্ত তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা খতিয়ে দেখা।

৭। নির্বাচনে গণমাধ্যম বিবেকের ভূমিকা পালন করছে কিনা তা খতিয়ে দেখা।

৮। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণমাধ্যম নির্বাচনে ভোটারদের তথ্য অধিকার রক্ষায় সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে কিনা তা বিশ্লেষণ করা।

৯। নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নে গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা কতখানি তা খতিয়ে দেখা।

১০। নির্বাচনে গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সুনিশ্চিত করা হয় কিনা ও গণমাধ্যম কর্মীদের কোন রকম নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় কিনা তা বিচার বিশ্লেষণ করা।

১১। নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করণে গণমাধ্যম আর কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে, সে সম্পর্কিত সংক্ষিপ্তসার।

1.4 AbKí MVb

যে কোন গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে অনুমিত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুকল্প হলো এমন একটি প্রস্তাবনা যার যথার্থতা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষাধীনে আনা হয়।

১। বাংলাদেশের নির্বাচনে গণমাধ্যম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

২। আবার কিছু কিছু গণমাধ্যম নেতিবাচক ভূমিকাও পালন করে।

৩। গণমাধ্যমগুলো রাজনৈতিক ও দলীয় আদর্শীক ভূমিকা পালন করে।

৪। গণমাধ্যমের নিরপেক্ষ ভূমিকা নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

৫। গণমাধ্যম নির্বাচনের নানা বিষয় তুলে ধরে জনগণ, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারকে সচেতন করতে পারে।

৬। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গনতন্ত্রের পথচলায় গণমাধ্যম যেমন সমসাময়িক রাষ্ট্র বা সমাজের দর্পন হিসেবে কাজ করে, তেমনি জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রকেও সম্প্রসারণ করে।

৭। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সবসময় নিরঙ্কুশ নয়।

1.5 c¯ÍK I ceÜ chv‡jvPbv

সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোন শাখার বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পুস্তক ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা। কেননা পুস্তক পর্যালোচনায় গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন, অনুমান গঠন, পদ্ধতি উদ্ভাবন, তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রায়োগিক কৌশল সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

Blumler & Gurevitch, 'Political Effects of Mass Communication'- এ বলেছেন, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়ার কাজে অকার্যকর প্রমানিত হলেও রাজনৈতিক তথ্য প্রদানে গণমাধ্যমকে কার্যকরভাবে

ব্যবহার করা যায়। সাংবাদিকগণ নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমে নির্বাচন সম্পর্কিত সংবাদ ও অন্যান্য প্রচারণার প্রবাহ তুঙ্গে নিয়ে যান। আবার, গণমাধ্যমের তাৎপরতায় নির্বাচনী সংবাদ ও প্রচারণার একটি মূর্ত ফলাফল বেরিয়ে আসে যা সহজে পরিমাপযোগ্য। তাছাড়া নির্বাচনে গণমাধ্যম যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

Dreyer & Rosenbaum, Roper Organization- এর রির্পোট 'An extended View of Public Attitudes Towards Television and other Media'-তে বলেছেন, "আধুনিক রাজনৈতিক জগতে গণমাধ্যম বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। ১৯৬৩ সাল থেকে টেলিভিশন রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে জনগণের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।" ভোটারগণ এখন গণমাধ্যমের জগতের বাসিন্দা হয়ে নিজেদেরকে দলের সাথে সম্পর্কিত রেখে বা না রেখে 'স্বাধীন' হিসেবে ভাবতে চান। আর এই স্বাধীন ভোটারগণ রাজনীতি বিষয়ে মোটেও নিস্পৃহ নন, বরং উৎসাহী এবং যথেষ্ট খবরাখবর রাখেন। অর্থাৎ বইটির বিভিন্ন অংশে নির্বাচন, রাজনীতি ও গণমাধ্যম প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করা হয়েছে।

নাজমুল হোসেন ও ড. ক্যারেন এল 'ইলেকশন মনিটরিং ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইএমডব্লিউজি)'র বইয়ে বলেছেন, 'ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ একটি মিডিয়া সাব গ্রুপ করে তাদের নিজেদের প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। নির্বাচন সম্পর্কিত তথ্যগুলো কিভাবে ভোটারদের কাছে প্রকাশ করা হবে, তা নিজেরাই সমন্বয়ের মাধ্যমে ঠিক করে নেয়।' এভাবে নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসতে থাকে ওয়ার্কিং গ্রুপ মিডিয়া সাব গ্রুপকে খুব কার্যকরভাবে কাজে লাগায়, যা ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহয়তা করে। এরকম কার্যক্রমের মাধ্যমে গণমাধ্যম নির্বাচনে যে ভূমিকা রাখতে পারে তা বইটিতে খুব ভালোভাবেই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

কিউ এ তাহ্মিনা ও ফিলিপ গাইন, 'তথ্যপঞ্জি নির্বাচনী রিপোর্টিং' সাংবাদিক সহয়িকায় গণমাধ্যমের সার্বিক নির্বাচনী প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকরা যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তা বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন।

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ এর 'নির্বাচন পর্যবেক্ষন রিপোর্ট ১৯৯১' বইয়ে 'ফাদার আর ডব্লিউ টিম ও ফিলিপ গাইন' বলেছেন, 'স্বাধীন অবস্থানে থেকে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ নানারকম অনুষ্ঠানসূচী তৈরি করতে পেরেছিলেন, যে সব অনুষ্ঠান বিগত নির্বাচনগুলোতে ছিলনা, বর্তমানে টেলিভিশনের পর্দায় সেগুলো দেখা গেছে যা ভোটারদেরকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।' মোট কথা নির্বাচনে গণমাধ্যমের যে ভূমিকা তা বইটিতে তারা তুলে ধরেছেন।

এম. সাইফুল্লাহ ভুঁইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩ ও ৮৪ তে 'নির্বাচন ও গণতন্ত্র ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' বিষয়ে নির্বাচন ও গণতন্ত্রে গণমাধ্যমের অপরিসীম ভূমিকাকে ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন।

কামরুল হাসান মঞ্জু, মান্নান হীরা ও শেখ শফিউল ইসলাম, ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টারের "মুক্ত প্রকাশ" পত্রিকায় নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা, নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশে ভূমিকা, নির্বাচনে আচরণবিধি সম্পর্কে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অব.) তাঁর 'নির্বাচন কমিশনে পাঁচ বছর' বইয়ে নির্বাচনের বছরে গণমাধ্যমের সাথে নির্বাচন কমিশন যে রুটিন মাফিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। তাছাড়া নির্বাচন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ ও নির্বাচনী বিধি-বিধান গণমাধ্যমে প্রচারের কারণে ভোটারগণ যে বিভিন্নভাবে সচেতন ও উপকৃত হয়েছে তা বইটির বিভিন্ন অংশে আলোকপাত করা হয়েছে।

এস এম আনোয়ারা বেগম এর "তত্বধায়ক সরকার ও বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন" বইয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চর্চা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষন, নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিবন্ধকতা, নির্বাচনে ভোটারদের আকাঙ্খা এবং একটি ফলপ্রসূ নির্বাচন সম্পন্ন করা, নির্বাচনে গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যা এই গবেষণা কার্যক্রমে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বলে আমি মনে করি ।

হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Professor Samuel P Huntington, æJournal of Democracy" তে গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিশ্বে এখন গণতন্ত্রের Third wave বা তৃতীয় ঢেউ চলছে। যার শুরু আশির দশকের প্রথম দিকে। এই ঢেউ শীর্ষে উঠলো ১৯৮৯ তে।" ঢেউ এসে বাংলাদেশেও লেগেছিল যার প্রমাণ, আশির দশকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বিরোধী দলগুলোর যৌথ আন্দোলনে জীবন দিয়েছিল অনেকে। এখানে তিনি আরো বলেছেন, "একবিংশ শতাব্দির শুরুতে গণতন্ত্রের একটি চতুর্থ ঢেউ এর সূচনা হতে পারে।

'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা' বইয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রায় সকল বিষয়ে গণমাধ্যমের যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

1.6 M‡elYv c×wZ

কোনো গবেষণাকর্ম একটিমাত্র পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। তাই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য সাক্ষাতকার পদ্ধতি ও কন্টেন্ট এ্যানালাইসিসসহ অন্যান্য পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে।

১। সাক্ষাতকার পদ্ধতি ২। কন্টেন্ট এ্যানালাইসিস পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই ধরণের তথ্যই সংগ্রহ করা হয়েছে।

১। প্রাথমিক পর্যায়ের উৎস ঃ এ গবেষণায় কতিপয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎসের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, পর্যবেক্ষক, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, গণমাধ্যমের সাংবাদিক ও সাধারণ জনগণ তথা ভোটারের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২। মাধ্যমিক উৎস ঃ এ গবেষণাকর্মে মূলত দ্বিতীয় বা মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ, ম্যাগাজিন, প্রতিবেদন, সংবাদপত্র,

ইত্যাদি তথ্যও উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক, লিফলেট, নির্বাচন নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের গবেষণাকর্ম ও পুস্তক, নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার রিপোর্ট, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার নির্বাচনসংক্রান্ত বিশেষ আয়োজন, প্রতিবেদন, কলাম ও রিপোর্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিবেদন থেকে সার্বিক সহায়তা নেয়া হয়েছে।

1.7 M‡elYvi mxgve×Zv

পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নির্বাচনের ধরণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় না। এই গবেষণায় মূলতঃ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কাজ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণার প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো "বাংলাদেশের নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে এখন পর্যন্ত সরাসরি কোন পুস্তক প্রকাশিত হয়নি বললেই চলে। নির্বাচন কমিশন যথোপযুক্ত নিয়মে বাংলাদেশের নির্বাচনগুলোতে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কোন তথ্য-দলিল বা পুস্তক সংরক্ষণ করেনি। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে তৎকালীন প্রিন্ট মিডিয়া অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ তখনকার সময়ে বর্তমানের মতো মিডিয়ার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। বিভিন্ন ধরণের পেশার মানুষের নিকট থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হলেও অধিকাংশের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রকম মূল্যায়ন এমনকি পরস্পর বিপরীতমুখী মূল্যায়নও রয়েছে। এক্ষেত্রে সঠিক মতামত যাচাইয়ে গবেষকের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করা অধিকতর বাঞ্চনীয়। অন্যথায় গবেষণা আংশিকভাবে দুর্বল হওয়ার আশংকা থাকে। এ সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করে আলোচ্য গবেষণা সম্পাদনে যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

1.8 Aa¨vqmg‡ni weeiY

বিশ্লেষণের সুবিধার্থে গবেষণাটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে অধ্যায় বিন্যাস করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ঃ এ অধ্যায়ে গবেষণার সমস্যা, গবেষণার গুরুত্ব, গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুকল্প গঠন, প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা, গবেষণার পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নির্বাচন ও গণমাধ্যম ঃ এ অধ্যায়ে নির্বাচন, নির্বাচনের গুরুত্ব, নির্বাচন পদ্ধতি পর্যালোচনা, নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, গণমাধ্যম, গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও প্রভাব, সমাজে গণমাধ্যমের ব্যবহার, গণমাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব, গণমাধ্যম ও তার স্বাধীনতা, নির্বাচনে গণমাধ্যমের গুরুত্ব, নির্বাচন ও তথ্য অধিকার, নির্বাচন ও গণমাধ্যম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ নির্বাচন, গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ঃ এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতি, নির্বাচন ও সংবিধান, নির্বাচন কমিশন ও তার ক্ষমতা, নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যপ্রনালী, নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তণ, গণতন্ত্র, নির্বাচন ও গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৯১ ও গণমাধ্যম ঃ এ অধ্যায়ে নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত, নির্বাচনের পূর্বে গণমাধ্যমের ভূমিকা, নির্বাচনকালীন গণমাধ্যমের ভূমিকা, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা, নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন পর্যবেক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচন ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮ ও গণমাধ্যম ঃ এ অধ্যায়ে নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও ওয়ান ইলেভেন প্রসঙ্গ, নবগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার : নবম সংসদ নির্বাচন-২০০৮, নির্বাচনের পূর্বপ্রস্তুতি, নির্বাচনের পূর্বে গণমাধ্যমের ভূমিকা, নির্বাচনকালীন গণমাধ্যমের ভূমিকা, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা, নির্বাচন সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া এবং নবম সংসদ নির্বাচন ও গণতন্ত্রায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উপসংহার

এ অধ্যায়ে উপসংহারের মাধ্যমে গবেষণাকর্মের সার্বিক আলোচনার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে।

1.9 Dcmsnvi

গণমাধ্যম নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অনন্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। গণমাধ্যম এমন একটি শক্তি যা হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে। গণমাধ্যমই গণতন্ত্রে ভোটারদের তথ্যের জন্য সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। গণমাধ্যম নির্বাচনের নানা বিষয় তুলে ধরে জনগণ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারকে সচেতন করতে পারে। নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনেক। কিন্তু গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা কতখানি? গণমাধ্যম আসলেই কী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে? সংবাদ প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের আদৌ কী কোন নিরাপত্তা আছে? এ গবেষণাকর্ম থেকে রাজনীতিতে, বিশেষত নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কিত অনেক তথ্য যেমন বেরিয়ে এসেছে তেমনি এক্ষেত্রে গবেষণার বিভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামোরও উদ্ভব ঘটেছে। তবে গবেষণাটি দ্বারা নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকায় গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রন করার মানুষিকতা পরিহার, নির্বাচনী স্বচ্ছতা এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন প্রশ্নে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশ করার স্বাধীনতা, সংবাদকর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গণমাধ্যমের মালিক ও সম্পাদকদের রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে থাকা এবং রাষ্ট্রপক্ষকেও প্রভাব ও সেন্সরমুক্ত থাকার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

Z_¨mÎ I mnvqK MšcwÄ

১. Huntington, Samuel P. : *Democracy's third wave, JOURNAL OF DEMOCRACY,* Spring, 1991.

২. Dreyer & Rosenbaum, Roper Organization, *'An extended View of Public Attitudes Towards Television and other Media'*, 1969-71, P.153.

৩. ভূঁইয়া, এম সাইফুল্লাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbevPb I MYZš t †c ÿvcU evsjv‡'kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪,অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৯।

৪. Blumler & Gurevitch, '*Political Effects of Mass Communication'*, 1983, P-245.

৫. মঞ্জু, কামরুল হাসান, হীরা, মান্নান ও ইসলাম, শেখ শফিউল, Òg³ cKvkÓ ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৮, পৃ.৭-৮, ১২-১৫,২১-২৬।

৬. তাহ্মিনা, কিউ এ ও গাইন, ফিলিপ, mvsewK mnwqKv ÒZ_¨cwÄ wbevPbx wi‡cwUsÓ evsjv‡'‡ki msm'xq wbevP‡b cvmw½K Z_¨ I cUfwg, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, (সেড), ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.-৩৪, ৫০-৫৪।

৭. বেগম, এস এম আনোয়ারা, ÒZËvavqK miKvi I evsjv‡'‡ki mvaviY wbevPbÓ, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৮-৪৭ ।

৮. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, beg RvZxq msm' wbevPb cwµqv wbixÿv, ২০১০, ঢাকা পৃ.১-১০।

৯. হোসেন, ড. নাজমুল ও এল, ড. ক্যারেন ÒB‡jKkb gwbUwis IqvwKs Mæc (BGgWweøDwR) cwZ‡e'bÓ দি এশিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই-২০০২, পৃ.১৩।

১০. টিম, ফাদার আর ডব্লিউ ও গাইন, ফিলিপ, ÒwbevPb ch‡eÿY wi‡cvU 1991Ó বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, সেপ্টেম্বর -১৯৯১, পৃ. ৬৫-৬৯।

১১. হোসেন, এম. সাখাওয়াত (অব.) ÒwbevPb Kwgk‡b cvP eQi Ó পালক পাবলিশার্স, ঢাকা,২০১৩, পৃ. ২০৬-২১২।

wØZxq Aa¨vq

wbevPb I MYgva¨g

2.1 f~wgKv

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের বিকল্প নেই। তাই সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদলে নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম। ফলে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের সব ধরণের শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন অপরিহার্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। গণতন্ত্রের সঠিক কার্যকারীতা ও স্থায়ীত্বের জন্য চাই যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ নির্বাচনই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের পছন্দানুযায়ী নেতা বা প্রতিনিধি বাছাই করে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যা দেশের সংবিধান বিধিবদ্ধ। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন হচ্ছে একটি নিয়মিত ও মেয়াদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। [১]

A Dictionary of Social Science এ নির্বাচনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে ''Election denotes a proccss whereby a number of persons choose one or more candidates to fill certain offices.''

Encyclopacdia of social science এ নির্বাচন সম্পর্কে বলা হয়েছে- '' Election might be defined as a form of procedure, recognised by the rules of an organisation, whereby all or some of the members of the organisation choose a smaller number of persons on one person to hold office of authority in the organisation.'' নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারগন কর্তৃক ভোটাধিকার প্রয়োগ গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি হলেও পশ্চিমা দেশের ন্যায় শাসন করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের জন্য স্বাভাবিক ঘটনা ছিলনা। কেননা উন্নয়নশীল বিশ্বে নির্বাচনকে কখনও কখনও বৈধতার প্রশ্নে সংকটাপন্ন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সংকট মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ঐ সব দেশে নির্বাচনকে আবার আমলা ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপমুক্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা বিকাশের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবেও মূল্যায়ন করা হয়। সাধারণতঃ অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়েই বৃটিশ শাসনামলে স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতাত্তোরকালে শাসকগোষ্ঠী অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন দেয়। এখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চেয়ে ক্ষমতা বৈধকরণের উপায় হিসেবেই নির্বাচনকে ব্যবহার করা হয়। ফলে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গণতন্ত্রের এরূপ অনিয়মিত চর্চা খাঁটি ও সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ভিত্তি বিকাশে খুব একটা সহায়ক হয়নি। নির্বাচন স্বয়ং গণতন্ত্র না হলেও লক্ষ্যে একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

[১] ভূঁইয়া, এম সাইফুলণ্টাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbevPb I MYZš¿ t †c¶vcU evsjv‡`kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪,অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৯।

2.2 wbe©vPb

অধ্যাপক W.J. M. Mackenzie বলেছেন, æFree Elctions are elections in which each voter has the opportunity-an equal opportunity-to express consent in the light of his own opinions and sentiments".[2] ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল নাগরিক যখন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তখন তাকে নির্বাচন বলে। গণতন্ত্র বিকাশে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একটি সফল নির্বাচন একটি রাষ্ট্রের জন্য দিকনির্দেশনার সুযোগ এনে দেয়। নির্বাচন হচ্ছে প্রতিনিধিত্বশীল শাসনের হাতিয়ার বা বাহন।

নির্বাচন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য, অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক শর্ত। কিন্তু গণতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বের জন্য চাই যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি অত্যন্ত জীবন্ত ইস্যু। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক বা রীতিসিদ্ধ মাধ্যম হলেও এ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত উপাদানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক ।[৩]

নির্বাচন বলতে বোঝায় ভোটাভুটি ব্যবস্থায় ভোট প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করা; আর বৃহৎ অর্থে, নির্বাচন বলতে নির্বাচনের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে বোঝায় অর্থাৎ নির্বাচন ঘোষণা, প্রার্থী মনোনয়ন, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, ভোট প্রদান এবং চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা। গণতন্ত্রে নির্বাচনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যেমন ঃ

- Election as a process of withdrawing colonial power;
- Election as a process of achieving legitimacy;
- Election as a slogan of establishing people's sovereignty during nationalist movements;
- Election as a way of ensuring minority's rights and majority's rule.[4]

নির্বাচন সম্পর্কে আরও বলা যায়, æElections are means of making political choices by voting. They are used in the selection of leaders and in the determination of issues."[5]

এছাড়াও নির্বাচনকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে অনেকে মন্তব্য করেন যে, জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে যে পদ্ধতি অনুসরণে এক ব্যক্তির নিকট থেকে অন্য ব্যক্তির নিকট অথবা এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নিকট থেকে অন্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নিকট হস্তান্তরিত হয় তাকেই নির্বাচন বলা হয়।[৬]

S.E. Finer নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, æElection as the system of election of the legislature." তিনি পরবর্তীতে বলেন, æThe election by the people of the representatives to a central legislature."[7]

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি Md. Saidur Rahman তাঁর 'Law on Election in Bangladesh' গ্রন্থে নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, æThe word 'Election' has by long usage in connection with the

---

[২] Mackenzie, W.J.M, *Free Election : An Elementary Text Book,* London, 1964, p.159.

[৩] বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡`‡ki mvaviY wbe©vPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪১-৪৩।

[৪] Taylor, R.H. (ed.) *The Politics of Elections in south East Asia,* woodrow willson center Press, New York, 1996, p.3.

[৫] *The Encyclopedia of Britannica,* vol-6, University of Chicago, Chicago, p. 5-6.

[৬] ফেমা, RvZxq msm` wbe©vP‡b †cvjs G‡R‡Ui `wqZ I KZe¨, মে ২০০৬, ঢাকা , পৃ.৭।

[৭] Finer, S.E. *Comparative Government,* Penguin press, Great Britain, 1970, p.66.

providing process of election of proper on representatives in democratic institution, acquired both a wide and a narrow meaning . In the narrow sense, it is used to mean the final selection of a candidate which may embrace the result of the poll when there is polling or a particular candidate being return unopposed when there is no poll. In the wide sence, the word is used to connote the entire process culminating in a candidate being declared elected."[৮]

Muhammad Yeahia Akhter নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, æElection serves as the basic mechanism for both slection and replacing ruling eletes and for providing a regular and systematic succession for government. Election helps to determine law of a country is governed and at the same line select who will excrciese that prower.[৯]

Harrop এবং Miller নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, æElection reinforce party activites and intensity political awareness of the people, They educate voters. provide the foundations for representation and grant legitimacy to the government."[১০]

নির্বাচনের মাধ্যমে যে লক্ষ্যটা অর্জনের চেষ্টা করা হয় তা হলো সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা নিশ্চিত করে। নির্বাচন মানেই গণজোয়ার। নির্বাচন মানেই ভোটযুদ্ধ। জয় পরাজয়ের খেলা। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই বিত্তশালী, নিঃস্ব, অভিজাত, নিম্নবর্ণ, মন্ত্রী, পিয়ন, আমলা-কামলা সব একাকার হয়ে যায়। শহর আর গ্রামের মধ্যে সুসম্পর্কের সৃষ্টি হয়। কমে আসে দূরত্ব। নির্বাচনী মূল্যবোধের বিকৃতির ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তথা সামাজিক পরিবেশও হয়ে উঠে স্বৈরতন্ত্রের সহযোগী, অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের দোসর। তাই বলা যায়, সমাজে গণতন্ত্রের সৌধকে সমুন্নত রাখতে হলে সর্বাগ্রে নির্বাচনী মূল্যবোধের ব্যাপক চর্চা করতে হবে। নির্বাচন হল একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং স্থায়ী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সরকার গঠন, যার সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপ কাজ করে এবং তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

2.2.1 wbe©vP‡bi ¸iæZ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনমত প্রকাশ পায় এবং সরকার জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী শাসন সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে এবং অবাঞ্চিত রাজনৈতিক দলের অবসান ঘটাতে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। মাঝে মাঝে নির্বাচন অনুষ্ঠান করলে জনমতের কষাঘাতে অনেক দলের মৃত্যু ঘটে। নির্বাচনের ব্যর্থ তৎপরতায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি হয় এবং সচেতন রাজনীতির বিকাশ ঘটে। নির্বাচন সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। সর্বোপরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগ ঘটে। নির্বাচনের কোন বিকল্প নাই। গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার

---

[৮] Rahman, Md. saidur, *Law on Election in Bangladesh,* Dhaka-2001. p. xi.

[৯] Akhter, Muhammad Yeahia, *Electoral Corruption in Bangladesh,* Ashgate Publication, Dhaka, 2001, p.3.

[১০] Harrop, M. and Miller, W. L., *Elections and voters: A comparative Introducation,* Macmillan Education, London, 1994, p.245-246.

জন্য এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচনই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা। এই গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচন যাতে প্রকৃত অর্থেই অবাধ এবং যে কোন ধরণের প্রভাবমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচনের দিন হলো রাজনীতিবিদদের বিচারের দিন। রাজনৈতিক নেতাগণ কিভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ জনগণ লাভ করে নির্বাচনের সময়। অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব এখানেই। এক কথায় নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচন ব্যতিত গণতান্ত্রিক কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে না। এ ধারণা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও নির্বাচনের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১১]

2.3 wbe©Pb c×wZ ch©‡jvPbv

নির্বাচন ও ভোট প্রদানের প্রধান প্রধান দিক অর্থাৎ দুনিয়াজোড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অনুসৃত 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' এবং 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' ইত্যাদি পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলে নির্বাচন পদ্ধতি-সংক্রান্ত প্রসঙ্গটির সামগ্রিক অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে।

অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন-ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই হচ্ছে নির্বাচনী সংস্কার প্রচেষ্টার মুল লক্ষ্য, যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটার জনগনের পছন্দ প্রতিফলিত হয়। নির্বাচনী সংস্কার হচ্ছে একটি সদা চলমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ অসুবিধাগুলো দূর করে নির্বাচন পদ্ধতিকে যথার্থ, অবাধ ও সুষ্ঠু করা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সবার জন্য সমান সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে। নির্বাচন পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কাঠামো আইন ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের, যথা 'নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংসগঠন' অথবা 'নির্বাচন কমিশন' এর দক্ষতার সমন্বয়েই প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ যত বেশী রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে পারবে, প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক পদ্ধতিগত কাঠামো ও কার্যকারিতাও ততই বাড়বে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামোই নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।

সুষ্ঠু ও মুক্ত নির্বাচন এর অর্থ বা সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক না করেও বলা চলে, সমগ্র ব্যবস্থাটির আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্ত সব সময় এমনটি না-ও হতে পারে। ইউরোপীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে (আমাদের পরিস্থিতির) তুলনা করা যথার্থই দূরূহ। সেখানে সুষ্ঠু ও যুক্ত নির্বাচন আবশ্যিকভাবেই নিশ্চিত থাকে এবং এক্ষেত্রে ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। নির্বাচনের বুথ জবরদখল করা, অর্থের ব্যবহার, ব্যালট পেপারে ছাপমারা (Ballot stuffing) এমনকি নির্বাচন বুথ ভিড়াক্রান্ত করা (Booth jamming) ইত্যাদি শব্দ সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যথার্থই অপরিচিত, কিন্তু বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে এগুলো একান্তই যেন আঞ্চলিক ব্যাধি (Endemic) । প্রধানত এমন কারণেই এসব দেশে নির্বাচন পদ্ধতির ত্রুটি একটি বহুল আলোচিত বিষয় এবং তাই নির্বাচনী আইনকানুন প্রণয়নে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অবস্থা যেমনই হোক, সঠিকভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা হলে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নির্বাচন গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া হয়। এটাও অনস্বীকার্য, নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের দিক থেকে

[১১] ভূঁইয়া, এম সাইফুলণ্ঢাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbe©Pb I MYZš¿ t †c¶vcU evsjv‡`kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪,অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৮৭।

আইনকানুন প্রয়োগে সবার প্রতিই সমদৃষ্টি পোষণ করতে হয়। নির্বাচন পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে সুদৃঢ়ভাবে স্বাধীন হতেই হবে।[১২]

অতএব, দুটি সুনির্দিষ্ট কারণে নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়টিকে সূত্রবদ্ধ করা অপরিহার্য। এর একটি হচ্ছে পদ্ধতিগত ত্রুটি হ্রাস করে নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে এমনভাবে শক্তিশালীকরণ, যাতে সম্ভাব্য সব ধরণের দূর্বলতা ও ক্ষমতাধরদের প্রভাব এড়িয়ে মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনাকরী কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। কারণ, নির্বাচন কমিশন নানাভাবেই ক্ষমতাসীন সরকারের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের বাস্তবায়নসাপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহায়তা করাই হচ্ছে সরকারের দায়িত্ব। সে যাই-হোক, বিদ্যমান উপাদানগুলোর সঙ্গে আরও কিছু অনুঘটক থাকে, যারা নির্বাচনী সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। সংস্কারের মাধ্যমেই নির্বাচন-প্রক্রিয়ার ত্রুটিগুলো অপসারিত হয়ে থাকে। এমন ধারণা থেকে বলা যেতে পারে, নির্বাচন-ব্যবস্থার সংস্কারই হচ্ছে ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মূল চাবিকাঠি। প্রকৃতপক্ষে সব মিলিয়েই বিষয়টি প্রায়োগিক পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় হয়ে ওঠে।

2.4 wbevP‡bi wewfY c×wZ I cwµqv

ivócwZkwmZ e¨e¯vi wbevPb-c×wZ t বাংলাদেশের নির্বাচন-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার আগেই বিভিন্ন ধরণের গণতান্ত্রিক দেশে বিদ্যমান নির্বাচন-পদ্ধতি বা ভোট প্রদানের প্রচলিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতাধীনেই বিভিন্ন রকমের সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। গণতান্ত্রিক বিশ্বে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দুটি সরকারব্যবস্থা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি-পদ্ধতি এবং সংসদীয় পদ্ধতি। কিন্তু উভয় শাসনব্যবস্থাতেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে নির্বাচন-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেবল জনগণের ভোটেই নয়। 'ইলেকটোরাল কলেজ' প্রদত্ত ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে দুই দফায় প্রদত্ত ভোটে ফরাসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম দফায় সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় ভোটের প্রতিযোগীতা হয় এবং এভাবেই বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

msm'xq kvmb e¨e¯vi wbevPb c×wZ t সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিবেশে সাধারণত দুটি ভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতি বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। এর মধ্যে একটি সহজ ভোটাধিকার পদ্ধতি, অর্থাৎ ভোট প্রাপ্তির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারনের নির্বাচন, যাকে 'ফার্স্ট পাষ্ট দ্য পোষ্ট' পদ্ধতির নির্বাচন বলা হয়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন। কমনওয়েলথভুক্ত বাংলাদেশ, ভারতসহ বিভিন্ন আফ্রো-এশিয় অঞ্চলের অধিকাংশ দেশেই একক নির্বাচনী আসনে ও সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অন্যদিকে নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোসহ অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশেই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে সহজ সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি এক দফার ব্যালট বা দুই দফার ব্যালট দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।

[১২] হোসেন, এম সাখাওয়াত, evsjv‡`‡k wbevPbx ms¯‹vi (1972-2008), প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.৪৩।

ÔdvóÆ cvó ‘¨ †cvóÕ **(FPTP)** ev mnR msL¨vwaK¨ c×wZ t ‘ফার্ষ্ট পাষ্ট দ্য পোষ্ট’ বা সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতিটি হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক বা ভিত্তিমূলক নির্বাচন-ব্যবস্থা, যেখানে একটি নির্বাচনী আসনে সর্বাধিক ভোট লাভকারী (অন্যান্য প্রার্থীর তুলনায়) প্রার্থীকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এ পদ্ধতিতে একজন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট আসনের সামগ্রিক ভোটসংখ্যার ৫০ শতাংশের ভোট পেয়ে বিজয়ী হতে পারেন; ওই আসনে বিভিন্ন প্রার্থীর প্রাপ্ত মোট ভোটের ২০ শতাংশ বা কম পেয়েও বিজয়ী হতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে একটি আসনের অধিকাংশ ভোটারের সমর্থন না পেলেও একজন প্রতিযোগী প্রার্থী বিজয়ী হয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সব জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। এ ব্যবস্থায় একজন প্রার্থী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ১ ভোটের ব্যবধানেও পরাজিত করতে পারেন। প্রাসঙ্গিক একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে মাত্র দু'জন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেবল ২৫২ ভোটের ব্যবধানে একজন বিজয়ী হন। দুই দফায় প্রদত্ত ভোটের ভিত্তিতে বিজয়ী নির্ধারণের পদ্ধতি প্রচলিত থাকলে প্রথম দফায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটের প্রাপক দুজন প্রতিযোগী প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় দফা ভোট অনুষ্ঠিত হতো এবং দ্বিতীয় দফার ভোটের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিজয়ী নির্ধারণ করা হতো।

msL¨vwaK¨wfwËK c×wZi mgv‡jvPbv t সংখ্যাধিক্য পদ্ধতির একটি বিশেষ সমালোচনার দিক হচ্ছে এটা এমন এক পদ্ধতি যাকে সবকিছুই বিজয়ীর দিকে যায় বলে বিবেচনা করা চলে। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব নাও থাকতে পারে। যে সব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী অথবা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিদ্যমান রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সমবেতভাবে বৃহত্তম হলেও একক বৃহত্তম সম্প্রদায়ের প্রার্থীরই সর্বদা বিজয়ী হওয়া স্বাভাবিক। সংখ্যাধিক্য পদ্ধতির আরেকটি বিশেষ সমালোচনার দিক হচ্ছে, এক্ষেত্রে বহুদলীয় গণতন্ত্র বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকে না; বরং সংঘাতমূলক দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই শিকড় গেড়ে বসে। 'সংখ্যাধিক্য পদ্ধতির' ক্রমাগত চর্চায় দুটি মাত্র দল ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠে,অন্য দলগুলো ক্রমেই প্রান্তিকতায় অপসারিত হতে থাকে এবং একসময় হারিয়েই যায়। বিভিন্ন নির্বাচন-পদ্ধতির আওতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর প্রভাবের দিকটি 'Duverger Laws' এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Duverger আইনে বলা হয়েছে: 'একক ব্যালটের সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি ক্রমশ দ্বিমুখিনতায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে।' সংশ্লিষ্ট প্রথম বিধানটি বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতার পর থেকেই এখানে একদলীয় এবং অতঃপর দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সর্বাধিক শক্তিশালী বিকাশ ঘটে। ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে দুটি দলই পর্যায়ক্রমিকভাবে সরকার গঠন করে চলেছে এবং এ অবস্থায় এই দুটি দল এমনই সংঘাত-বৈপরীত্বে জড়িয়েছে যে, এক দলের সূচিত যে কোনো ব্যবস্থা পরবর্তী ক্ষমতাসীন দল বাতিল করে দিয়ে থাকে।

AvbycvwZK cwZwbwaZ¡wfwËK c×wZ t আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিটিকে অনেক সময় পূর্ণ প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এটা এমন এক ধরনের পদ্ধতি, যার লক্ষ্য হচ্ছে শতকরা হিসেবের ভিত্তিতে (কোনো একটি পরিমাপে চিহ্নিত) বিভিন্ন প্রার্থী-গোষ্ঠীর প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে বিজিত আসনের নিকটতম সুষমতা বিধান করা।

AvbcwZK cwZwbwaZ c×wZi wewfb g‡Wj t ‘আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব’ পদ্ধতির বিভিন্ন ‘মডেল’ প্রচলিত রয়েছে, যেগুলো প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করে অথবা উচ্চতর মাত্রায় ফলাফল নিশ্চিত করতে পারে। ‘আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব’র মডেলগুলো নিম্নরূপঃ

দলীয় তালিকানির্ভর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট দলগুলো তাদের পছন্দের অনুসারে প্রার্থীদের তালিকা উপস্থাপন করে থাকে। উপরোল্লিখিত প্রার্থী-গোষ্ঠীর সঙ্গে সাধারণতই রাজনৈতিক দলগুলোর উপস্থাপিত তালিকার সামঞ্জস্য থাকে। দলীয় তালিকানির্ভর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব মডেলের আওতায় পূর্বঘোষিত বিধান অনুসারে প্রার্থী-তালিকাটি প্রকাশ্য কিংবা গোপনীয় হতে পারে।

‘দলীয় তালিকানির্ভর আনুপাতিক প্রতনিধিত্ব’ পদ্ধতির আওতায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রার্থী তালিকা তৈরি করে। ‘গোপনীয় তালিকা’ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ভোটাররা প্রার্থীকে নয়, তালিকাটিতে ভোট দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি দল সর্বমোট যে পরিমাণ ভোট পায়, সেই অনুপাতে দলীয় তালিকায় নির্ধারিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন বরাদ্দের (বিজয়ী) ঘোষণা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে ‘প্রকাশ্য তালিকা’র মডেল অনুসরণ করা হলে ভোটাররা তালিকাবদ্ধ প্রার্থীদের মধ্য থেকে একজন অথবা দুজন প্রার্থীর অনুকূলে ভোট দিতে পারেন, অথবা তালিকার ভিত্তিতেই ক্রমানুসারে নিজেদের পছন্দনীয় প্রার্থীর উল্লেখ করতে পারেন। ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার বহু দেশ এবং ইসরায়েলেও নির্বাচনের এ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

‘আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব’র অপর একটি ‘মডেল’ রয়েছে, তাতে ‘একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট’ প্রদানের বিধান রয়েছে। এ ব্যবস্থায় নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দল থাকার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে প্রার্থী-গোষ্ঠীকে ‘পরিমাপ-চিহ্নিত’ করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপেই ভোটদাতাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে থাকে।

‘মিশ্র আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব’ প্রক্রিয়ায় আনুপাতিক পদ্ধতি এবং জেলাভিত্তিক একক আসনের সমন্বয় করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে ওই দুটি পদ্ধতিরই অনুকূল অনুষঙ্গগুলো নিশ্চিত করা যায়। এই পদ্ধতি সেই সব দেশের জন্য বিশেষ উপযোগী, যেখানে জনসংখ্যা বিশাল, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু বিদ্যমান ও বিভিন্ন ভৌগলিক সীমা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে মিশ্র আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রকমের স্থানীয় ও জাতীয় ইস্যুর ওপর গুরুত্বারোপ করা সম্ভব হতে পারে। নির্বাচনের এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, এমন বহুসংখ্যক দেশের মধ্যে রয়েছে বলিভিয়া, জার্মানি, লেসেথো, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের স্কটিশ পার্লামেন্ট ও ওয়েলস অ্যাসেমব্লি। নেপালে ২০০৮ সালে আইনসভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির দাবি প্রবল হয়ে উঠছে।

Duverger তাঁর পূর্বোল্লিখিত ‘দ্বিতীয় আইনসূত্রে বলেছেন, দ্বিতীয় দফার ব্যালট (সংখ্যাগরিষ্ঠ) পদ্ধতি এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বই বহুদলীয় ব্যবস্থার চর্চা সম্ভব করে তোলে।’ (Grofman and Lijphart: 1986) তবে Duverger-এর এমন বক্তব্যের বিরোধিতাও হয়েছে। Geovanni Sartorgi তাঁর নিবন্ধে বলেছেন, ‘নির্বাচন পদ্ধতির প্রভাব: ‘‘বিভ্রান্তিকর আইন ও বিভ্রান্তিকর পদ্ধতি?’’ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পরিবেশে ভোট প্রদানের মাধ্যমে বহুদলীয় ব্যবস্থার চর্চা-সংক্রান্ত Duvergerএর দৃষ্টিভঙ্গিকে নাকচ করে দেয়।’ বর্তমান সমীক্ষাটি যেহেতু উল্লিখিত বক্তব্যগুলোর বিশ্লেষণ বা বিপরীত

তত্ত্ব উপস্থাপনের লক্ষ্যে পরিচালিত নয়, তাই এখানে বিতর্কটি এড়ানো যেতে পারে। তবে অনস্বীকার্য যে, সাম্প্রতিককালের গণতান্ত্রিক দুনিয়ার ভোট প্রদানের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের প্রশ্নটি উত্তপ্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।[১৩]

2.5 MYgva¨g

আধুনিক বিশ্বে গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেখানে জনমতের প্রতিফলনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রমের প্রতি জনগণের আস্থা বা অবস্থার বিষয়টি প্রকাশ পায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণমাধ্যম যেমন সমসাময়িক রাষ্ট্র বা সমাজের দর্পণ হিসেবেও কাজ করে, তেমনি জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রকেও সম্প্রসারণ করে থাকে। এ কারণে গণতান্ত্রিক ও সুশাসিত রাষ্ট্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে অবাধ, স্বাধীন, শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম যা সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের দায়িত্ব পালন করবে।

গণমাধ্যমকে বলা হয় আমাদের তৃতীয় নয়ন। মনকে খানিক তৃপ্তি দিয়েই গণমাধ্যমের সমাপ্তি নয়; মানুষের মনন শক্তিকে তীক্ষ্ণ, ধারালো ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলাও তার কাজের মধ্যে পড়ে।[১৪]

গণমাধ্যম গণমানুষের কথা বলে। মানুষের সামাজিক আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে গণমাধ্যমে। সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে গণমাধ্যম সমাজের প্রতি ভূমিকা পালন করে থাকে।

গণশব্দের অর্থসমূহ, সমষ্টি, শ্রেনী বা জনসাধারণ। মাধ্যম শব্দের অর্থ যন্ত্র বা সহায়ক। অর্থাৎ যে যন্ত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাই গণমাধ্যম।

গণযোগাযোগের ভাষায়, যে মাধ্যম বৃহৎ ভৌগলিক এলাকার বিচ্ছিন্ন মানুষের নিকট বার্তা প্রেরণ করে তাকে গণমাধ্যম বলে। আবার, যে মাধ্যম আমাদের তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রভাবিত করে তাকেই গণমাধ্যম বলে।

Wilbur Schramm এর মতে, "গণমাধ্যম হল বিশেষ কিছু যন্ত্র দ্বারা একটি সুসংগঠিত কার্যক্ষম দল যা বহু মানুষের কাছে একই সময়ে একই বার্তা পৌঁছে দেয়।" অর্থাৎ গণমাধ্যম হল এমন একটি মাধ্যম যে মাধ্যমে একটি তথ্য বৃহৎ ভৌগলিক এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠীর কাছে দেয়া যায়।

বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম প্রচলিত আছে। print Media বা print Mass Media র মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম হল ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম। ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফেইসবুক, ব্লগ, গুগল, উইকিপিডিয়া ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের অন্তর্গত।[১৫]

MYgva¨‡gi aviYv

তথ্য বা বার্তার বিস্তার এবং পাঠক-দর্শক-শ্রোতাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এক শক্তিশালী বাহন। যদিও সমাজ ও মানুষের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাবের মাত্রা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তা সত্ত্বেও আমরা কোনভাবেই গণমাধ্যমের প্রভাবের বিষয়টি অস্বীকার করতে পারি না।

১৯২০ এর দশকে গণমাধ্যম সম্পর্কিত প্রথম যে তত্ত্বটি গড়ে উঠে তা সামাজিক বুলেট তত্ত্ব নামে পরিচিত। এ তত্ত্বটি আচরণবাদ ধারণা দ্বারা প্রভাবিত । এ তত্ত্বে বিশ্বাস করা হতো ইনজেকশনের সুঁই

---

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫।

[১৪] রেজা, ইসতিয়াক, MYgva¨g fvebv, কথাপ্রকাশ , ঢাকা, ২০১৩, পৃ.২৪-২৬।

[১৫] ফেরদৌস, রোবায়েত ও আনওয়ার¯স মুহাম্মদ, MYgva¨g/ †kbÿgva¨g, শ্রাবন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.১৫৫-১৫৯।

যেমন দেহের চামড়া ভেদ করে। গণমাধ্যমের বার্তাও শ্রোতাকে ঠিক তেমনিভাবে আঘাত করে। এভাবে গণমাধ্যম দর্শক শ্রোতার আচরণ নিয়ন্ত্রন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করপোরেট সংবাদ মাধ্যমগুলো কিভাবে কাজ করছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অ্যাডওয়ার্ড এস হারমেন ও নোয়াম চমস্কি তাঁদের 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট: দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব দ্য ম্যাস মিডিয়া' (১৯৮৮) গ্রন্থে 'সিস্টেমেটিক প্রপাগান্ডা মডেল' উপস্থাপন করেছে। তাত্ত্বিকদ্বয়ের মতে, গণমাধ্যম এলিটদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নোয়াম চমস্কি তাঁর 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট: দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব দ্য ম্যাস মিডিয়া' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে উল্লেখ করেন, এন্টি-কমিউনিজম মার্কিন রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেখানকার গণমাধ্যমও এ সংস্কৃতির বাইরে নয়। এন্টি-কমিউনিজমের মাপকাঠি দিয়েই মার্কিন সাংবাদিকরা 'গুড গাইজ' ও 'ব্যাড গাইজ' এর দ্বি-কোটিক প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেন। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ধারণাটি গণমাধ্যম কর্তৃক এলিট শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রিচার্ড লাইটিনেন (Richard Laitinen) ও রিচার্ড রকোস (Richard Rakos) গবেষকদ্বয় 'The control of Behavior by Media Manipulation শব্দের অবতারণা করেন। তাঁদের মতে, গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতা তথা জনগনের আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। জনগনের মাঝে কোনো ক্ষোভ দেখা দিলে, গণমাধ্যম তা নিয়ন্ত্রন করে। এভাবেই গণমাধ্যম এলিট শ্রেণীর স্বার্থ ও আধিপত্য বজায় রাখতে নিরন্তর কাজ করে। গণমাধ্যম গণমানুষের কথা বলবে, সত্য প্রতিষ্ঠা করবে, সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতারণা প্রভৃতি অশুভ চক্রকে দূর করতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করবে- এটাই সবার প্রত্যাশা। আর এজন্য আধিপত্যবাদী, পুঁজিবাদী, কুচক্রী, এলিট, মানবতা বিরোধীদের হাত থেকে গণমাধ্যমকে মুক্ত করতে হবে। পৃথিবীকে সুন্দর ও সাম্যের রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এর কোন বিকল্প নেই।[১৬]

2.5.1 MYgva¨‡gi mvgwRK ‘vqe×Zv I cfve

সামাজিক দায়িত্ব এক ধরনের ব্যবসায়িক শিষ্টাচার বা নীতি, যা সমাজের প্রতি ব্যবসার বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে ব্যবসার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে। যে পরিবেশে বা যে সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়বদ্ধতা জন্মায়। সামাজিক দায়বদ্ধতা শব্দটি পশ্চিমা বিশ্বে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের দিকে প্রচলিত হওয়া শুরু করে। বড় বড় ভোগ্য পন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই ধরণের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দেয়ার জন্য স্টেকহোল্ডার কথাটির প্রচলন করে। এই শব্দটির অর্থ হল সমাজের প্রতি সেই সকল মানুষ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়।

গণমাধ্যম একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা আছে। সমাজের উন্নতি, অবনতি, ভাল-মন্দ প্রভৃতি দিকে গণমাধ্যমের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিদ্যমান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়ে থাকে।

---

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

যে কোন দেশের শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান উপাদান হলো মিডিয়া বা গণমাধ্যম। একটি স্বাধীন দায়িত্বশীল এবং শক্তিশালী গণমাধ্যম জনগণ এবং নীতি নির্ধারকদের তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি দেশের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মতামত প্রদান করে থাকে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করে। সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব প্রবল, যে কারণে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে গণমাধ্যম বা মিডিয়াকে গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক যুগে গণমাধ্যম সকল অন্যায় অবিচার তথা দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সামাজিক যোগাযোগ যেমন বাড়ছে মানুষে মানুষে, তেমনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ।

নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও উন্নয়ন কর্মকান্ডে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে স্বপ্ন দেখার শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, ব্যবসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়।

সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ও শক্তিশালী মাধ্যম। প্রতিদিন সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটে, সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বুলিয়েই জেনে যাই আমরা।

গত কয়েক বছরে দেশে বেড়েছে সংবাদপত্র আর টেলিভিশন শিল্পে দেখা গেছে অভাবনীয় বিকাশ। বেড়েছে এর নান্দনিক ও প্রযুক্তির মান। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা আর সহজলভ্যতা মিডিয়া প্রতিষ্ঠানে দিয়েছে গতি, সাংবাদিকতা শিল্প পেয়েছে তাৎক্ষনিকতা। পাঠককে বিভিন্ন ইস্যুতে তথ্য সরবরাহ ও সচেতন করার কাজটা মূলত গণমাধ্যমেরই কাজ। এজন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মানে মিডিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গণমাধ্যমের প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে। তাদের মানসিক গড়নে গণমাধ্যম বিরাট ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন বয়সের ও শিক্ষা সংস্কৃতির লোক গণমাধ্যমের অনুষ্ঠান শোনে ও দেখে। এদের কথা মনে রেখে বার্তা প্রস্তুত করতে হবে। গণমাধ্যমে আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন থাকবে। জনগনের মুখপাত্র হবে গণমাধ্যম। এভাবেই গণমাধ্যমকে সমাজের পক্ষে ভূমিকা পালন করতে হবে।

2.5.2 mgv‡R MYgva¨‡gi e¨envi

আমাদের সমাজে ক্রিয়াশীল কিছু গণমাধ্যম রয়েছে। যেগুলো সমাজকে ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সেগুলো হলো রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ইন্টারনেট, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন, ব্লগ, ফেইসবুক, টেলিফোন, মোবাইল, টুইটার, উইকিপিডিয়া, গুগল ইত্যাদি। এগুলো ব্যবহার করে সমাজের সাধারণ মানুষেরা নিজেদের ও দেশের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকছে।

wb‡g G¸‡jvi e¨envi m¤ú‡K we¯Íwi Z Av‡jvPbv Kiv n‡jv -

‡iwWI

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে এখনও আধুনিকতার ছোঁয়া ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি সেখানেও রেডিও একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যম। রেডিওর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সম্প্রচারিত এ.এম (AM) এফ.এম (FM), আন্তর্জাতিকভাবে সম্প্রচারিত (শর্টওয়েভ) তরঙ্গ শোনা যায়।

দেশি বিদেশি বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালা এতে উপভোগ করা যায়। বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অব আমেরিকা, ডয়চে ভেলে ইত্যাদির মতো আরও কিছু আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার রেডিও সার্ভিসের অনুষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে অজপাড়া গাঁয়ের যে কোন ব্যক্তিও তাৎক্ষনিক বিভিন্ন ধরনের খবরা খবর পাচ্ছেন। নির্দিষ্ট গন্ডীর বাইরে এসে বৃহত্তর সমাজের অংশীদার হতে পারছেন। তাছাড়া বর্তমানে কমিউনিটি রেডিও দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের তথ্য চাহিদা পূরণ করে।

‡Uwjwfkb

আধুনিক গণমাধ্যমের অন্যতম হলো টেলিভিশন। টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের তথ্য বিনোদন, খবরাখবর ইত্যাদি জানতে পারি। বিগত শতাব্দীর বিস্ময়কর আবিষ্কার টেলিভিশন বিশ্বসমাজকে বদলে দিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর চারপাশে শত শত স্যাটেলাইট স্থাপনের ফলে আমরা পাচ্ছি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের অসংখ্য চ্যানেল। এতে অন্য দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, খবরাখবর সব কিছুর সাথে পরিচিত হবার এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের একপ্রান্তের লোকের সাথে অন্য প্রান্তের লোকের মিথস্ক্রিয়া ঘটছে যা বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ প্রতিষ্ঠার অবদান রাখছে।

msev‘cÎ

জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ঘটনাবলীর তথ্য বা সংবাদ গণমানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্র সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয়। একুশ শতকে এসেও প্রিন্ট মিডিয়ার চাহিদা এতটুকুও কমেনি।

বর্তমান সভ্যতার প্রজ্ঞালোকের যুগে সর্বস্তরের মানুষের দ্বারে প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনাবলী উপস্থাপন করার একমাত্র মাধ্যম সংবাদপত্র। আধুনিক সভ্যতায় সংবাদপত্রের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে জ্ঞান বিস্তারের যতগুলো মাধ্যম আকিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সংবাদপত্র অন্যতম।

একুশ শতকেও সংবাদপত্র এবং সংবাদ সেবীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে পাঠক সংখ্যাও। পাঠক প্রিয়তা বা প্রচার সংখ্যা বাড়াতে সংবাদপত্রগুলো প্রতিনিয়ত বৈচিত্র ও নতুনত্ব আনছে। যুগের সাক্ষী হয়ে সংবাদপত্র এগিয়ে চলছে ক্রমবিবর্তনের ধারায়।

B›Uvi‡bU

বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট একটি যুগান্তকারী বিপ্লব সাধন করেছে। ইন্টারনেটের বাহ্যত কোন সীমা নেই। এর দ্বারা প্রায় সবকিছুই সম্ভব । প্রবাসী বন্ধুর সাথে তাৎক্ষনিক খবর আদান-প্রদান, কোনো বিমানের সাথে যোগাযোগ বা খেলাধুলার টিকেট সংরক্ষণ ও ক্রয়, সুপার মার্কেটে কোন পণ্যের অনুসন্ধান ও তার জন্য অর্ডার দেয়া এই সবই ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব কম সময়ে ঘরে বসে সম্পন্ন করা যায়।

‡gvevBj †dvb

বর্তমান আধুনিক জীবনে টেলিফোন বা মোবাইল ফোনকে বাদ দিয়ে জীবন যাপনের কথা চিন্তাও করা যায় না। মোবাইল ফোন নামক একটি ছোট ডিভাইসকে পকেটে যে কোন স্থানে বয়ে নেয়া যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই বিশ্বের যে কোন প্রান্তে থাকা কোন ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সরাসরি কথা বলা সম্ভব হচ্ছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক-ইত্যাদিসহ নানা কাজে টেলিফোন ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে এক স্থানের লোক অন্য স্থানের লোকের সাথে ক্রমশ এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন এবং পরস্পর পরস্পরের কাছাকছি আসছেন। ফলে গড়ে উঠছে বিশ্বগ্রাম।

eøM, †dBmeK

বর্তমানে ফেইসবুক ও ব্লগ দুটিই গণমাধ্যম। ব্লগ গণমাধ্যম হলেও এতে সবার অংশগ্রহণ নেই। ফেইসবুকে প্রায় সবারই অংশগ্রহণ আছে। ইন্টারনেট চালু হওয়া সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলো মানবীয় যোগাযোগের সর্বাধুনিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত ইন্টারনেটের সামাজিক সম্পর্কের নেটওয়ার্ক ফেইসবুক, বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের নিকট অনেক জনপ্রিয়। তেমনি করে ব্লগও একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। এখানে ব্যক্তি তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারে যা সামাজিক যোগাযোগে ভূমিকা রাখে।

Pjw”PÎ

চলচ্চিত্র একটি বিশাল গণমাধ্যম। যার মাধ্যমে আমাদের মানসিক বিষয়ে শক্তিশালী ধারণা দেয়। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

D.W. Grifith বলেছেন যে , “২০১৪ সালের মধ্যে চলচ্চিত্র বিশ্বশান্তি রক্ষায় ভূমিকা রাখবে।” চীনা একটি প্রবাদ আছে, “একটা সিনেমা হাজার কথার সমান। অনেকে ভাবতেন চলচ্চিত্র গ্রেনেডের মত।” চলচ্চিত্র একই সাথে আমাদের বিনোদন তথ্য শিক্ষা দেয় এবং মাঝে মাঝে গণসচেতনতা গড়ে তুলতেও ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

এভাবেই গণমাধ্যমের বিভিন্ন মাধ্যম সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। সমাজে এমন কোন Sector নেই যেখানে গণমাধ্যমের প্রভাব বিরাজমান নেই। সকল ক্ষেত্রেই গণমাধ্যম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।[১৭]

2.5.3 MYgva¨‡gi mvgwRK ‘wqZ

গণমাধ্যম একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। Wilbur Schramm বলেছেন, গণমাধ্যম একটি মৌল সামাজিক প্রক্রিয়া। তবে গণমাধ্যমের কিছু দায়িত্ব বা কাজ রয়েছে যেগুলো আমাদেরকে প্রভাবিত করে তোলে। নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো -

(1) MYgva¨g Avgv‡‘i wkwÿZ K‡i t গণমাধ্যম কর্তৃক পরিবেশিত গণশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, বিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক কর্তৃক উপস্থাপনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিসীমাকে বৃদ্ধি করে।

উদাহরণস্বরূপ ঃ বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকাকেন্দ্রীক বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ক্লাস লেকচার এবং ইংরেজী শিক্ষার আসর, বি. বি. সি. জার্নালি, মজায় মজায় শেখা ইত্যাদি প্রচারের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়াও বিভিন্ন কৃষি ব্যক্তিত্ব যেমন শাইখ-সিরাজ কর্তৃক প্রচারিত কৃষি দিবানিশি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ কৃষি বিষয়ে অনেক শিক্ষা লাভ করছে।

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

(2) Z_¨ †‘qv t গণমাধ্যমকে তথ্যের ভান্ডার বলা হয়। কেননা আমরা সকল তথ্য গণমাধ্যমের সাহায্যে পেয়ে থাকি। গণমাধ্যম যদি না থাকত তাহলে দেশ-বিদেশে কোথায় কী ঘটছে তা আমরা জানতে পারতাম না। তাই গণমাধ্যমকে তথ্যের ভান্ডার বলা হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ঃ ২০০৩ সালের ২০ মার্চ মার্কিন বাহিনী ইরাকে আক্রমণ করে সেখানকার বিদ্রোহীদের বাগদাদে অবস্থিত আবুগারীব কারাগারে বন্দী করে। তাদের ওপর চালানো হত অমানবিক নির্যাতন। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সিক্সিস টেলিভিশনে ইরাকের আবুগারীব কারাগারে বন্দি নির্যাতনের ছবি প্রচার করলে বিশ্ববাসী আবুগারীব কারাগার সম্পর্কে জানতে পারে।

(3) we‡bv‘b †‘qv t

গণমাধ্যমগুলোর অন্যতম কাজ হল দর্শককে আনন্দ দেয়া। মিডিয়া তার প্রোগ্রামগুলো সাজানোর পেছনে যে কারণ আছে তা হল দর্শককে আকৃষ্ট করা। Devito বলেছেন, “আমি যখন কোন Typical বা জাতীয়তা মানুষকে জিজ্ঞাসা করি গণমাধ্যম কিসের ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে? উত্তর বলবে বিনোদনের জন্য।

(4) cfve we¯Ívi K‡i t Devito বলেছেন, “ব্যক্তিকে প্রভাবিত করনের এই কাজটি একেবারে মূখ্যভাবে পালন করে মিডিয়া। মিডিয়া ব্যক্তিকে পুরোপুরি প্রভাবিত করতে পারে।”

(5) mgvRe× Kiv t গণমাধ্যমের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মানুষকে সমাজবদ্ধ করে তোলে। একটি সমাজ যাতে আইনগতভাবে চলতে পারে সেজন্যে মিডিয়া তার দর্শকদের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা দেয়। এছাড়াও সমাজের ব্যক্তিদের Values, rules, opinion কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়। ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ঃ ব্যক্তি সমাজে কীভাবে চলবে, কীভাবে অন্যের সাথে মিশবে, কথা বলবে, কোন কাজটি করলে ভাল হবে, কোন পোশাক পরলে কেমন লাগবে এই সব মিডিয়া আমাদের শেখায়।

(6) kw³ ew× Kiv t ব্যক্তির আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ পরিবর্তনে মিডিয়া প্রভাব ফেলে এবং তা পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা রাখে। তবে ব্যক্তির নিজস্ব যে আচরণ থাকে তা খুব সহজেই পরিবর্তন করা যায় না। Devito বলেছেন, “অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিডিয়া পুরোপুরি আমাদের আচরণ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তি গণমাধ্যম থেকে যেসব তথ্য পায় সে সব তার আচরণ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সাথে মিশে যায়।”

(7) পwieZb K‡i t Devito বলেছেন, “ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার কাজটি একেবারে Primary level এ হয় না। কেননা মিডিয়া তার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ধাপে ধাপে পরিবর্তনের কাজটি করে থাকে।”

মিডিয়া ব্যক্তির Major behaviour যেমন রাজনৈতিক মতাদর্শে সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় মতাদর্শ ইত্যাদি পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

(8) ghv‘v c‘vb t মিডিয়া চাইলেই কোন ব্যক্তিকে বিখ্যাত আবার কোন ব্যক্তিকে কুখ্যাত করতে পারে। এ প্রসঙ্গে Joseph A Devito বলেছেন, “তুমি যদি কমপক্ষে ১০০ জন বিখ্যাত মানুষের তালিকা কর তাহলে দেখতে পাবে তাদরে বিখ্যাত হবার পেছনে কোন না কোনভাবে মিডিয়ার হাত আছে এবং তারা এর সাথে চুক্তিবদ্ধ।” যেমন, যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রতিভা থাকে তাহলে মিডিয়া তাকে খুঁজে

নিবে আর প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও মিডিয়া যদি তাকে প্রাধান্য না দেয় তাহলে তার প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে। তবে মানুষের মধ্যে প্রতিভা না থাকলে মিডিয়া চাইলে তাকে কুখ্যাত বা বিখ্যাত করতে পারবে না।

(9) mwµq Kiv t মিডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জনগণকে Active করে তোলা। কিন্তু এটা সমাজ পরিবর্তনের জন্য নয়। গণমাধ্যম তার প্রচার বাড়ানোর জন্য দর্শককে Active রাখে। যেমন, মিডিয়া যে সব বিজ্ঞাপন প্রচার করে সেগুলো যদি দর্শক পছন্দ করে তাহলে তারা পণ্যটি ক্রয় করবে।

(10) g‡bv‡hvM mwó Kiv t গণমাধ্যমের আর একটি শক্তিশালী ক্ষমতা হল এটা একই সময়ে একই সাথে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সবকিছুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Devito বলেছেন, কোন বিষয় important হওয়ার পর ছাপানো হয় নাকি ছাপানোর পর important হয়। মিডিয়া অনেক সময় important জিনিসগুলো বাদ দিয়ে তার স্বার্থের কারণে এর কম গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো ছাপায়। এভাবে পাঠকের Attention বাড়ায়।

(11) ‰bwZKZv mwó K‡i t Mass Media যে শুধু Negative Information দেয় তা নয় কখনও কখনও ভাল খবরও পরিবেশন করে । মিডিয়া মানুষকে নৈতিকতাবোধসম্পন্ন করে তোলে। মিডিয়া থেকে মানুষকে নৈতিকতাবোধসম্পন্ন করে তোলে । মিডিয়া থেকে প্রেরিত বার্তা জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

যেমন, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা রোধ ও এর বিরোধী আইন, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি জনসচেতনতামূলক কাজ।

(12) mgm¨v I mgvavb t প্রতিনিয়ত গণমাধ্যম আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করছে এবং এসব সমস্যা সমাধানও করছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এ সমাধানটি প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। মানুষ ৪-৫ ঘণ্টা TV দেখে ও বিভিন্ন সমস্যা সাধানের কথা জেনেও বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেছে না। তখন এক পর্যায়ে এসব দিক থেকে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। যেমন, মাদকাসক্ত, ইভটিজিং, যৌতুক প্রথা।[১৮]

2.6 MYgva¨g I Zvi ¯vaxbZv

গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন একটি অনিবার্য পন্থা। নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রের কথা ভাবা যায় না। উপমহাদেশে গণমাধ্যম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এদেশে উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক খুঁজে পাওয়া ভার, যার রাজনৈতিক জীবনে একবারও সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। রাজনৈতিক প্রণোদনা থেকেই সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থেই গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইংরেজ শাসনামলের পর আমরা আরেক ধরণের আধা উপনিবেশবাদী পরিবেশে পড়ে গেলাম। পাকিস্তান শাসনামলে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানদের ভার্চুয়াল মাস্টার হয়ে পড়ে।

সত্যি কথা বলতে গেলে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালে একবার সাধারণ নির্বাচন হয়েছিলো। ১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে আরেকবার নির্বাচন হয়। এর মাঝের নির্বাচনগুলো ছিল নির্বাচনের নামে প্রহসন মাত্র। মাঝখানে বিশাল একটা সময় পার করতে হয়েছে সামরিক শাসনে। অর্থাৎ পাকিস্তানের ২৩

[১৮] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের ওপর একটি পর্যবেক্ষনমূলক বিশেণ্ডষণ, ঢাকা, ২০১০।

বছরে গণতন্ত্র সেভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। আমাদের নষ্ট হলো বহু সময় আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আমার মতো দেশবাসীরও খুবই সংশয় আছে। সর্বশেষ যে পরিস্তিতি তাতে আশান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। দেশ যে সংকটের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে এটা বোঝার জন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষক হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলাদেশ এখন নানা রাজনৈতিক মেরুকরণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল যারা বিশাল একটা গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা নির্বাচনের বিষয় একত্রিত না হলে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে একটা বিপর্যয় হবে। অনেকেই এখনও ভাবছে হয়তো শেষ মুহূর্তেও একটা সমঝোতা হতে পারে। তবে পরিস্থিতি সেদিকে যাচ্ছে না।[১৯]

নির্বাচনী সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতা একটি আপেক্ষিক বিষয়। সর্বাংশে গণমাধ্যমের নিরপেক্ষ হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। পক্ষপাতিত্ব প্রতিটি গণমাধ্যমের কমবেশী থেকেই থাকে। পৃথিবীতে কোথাও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম আছে কিনা তা বলা মুশকিল। বাংলাদেশের কিছু কিছু গণমাধ্যম রাজনৈতিক অঙ্গনের দুটো পক্ষেরই খবর তুলে ধরার চেষ্টা করছে। ওয়ান ইলেভেনের পর গণমাধ্যমগুলো বিশেষ করে ইলেকট্রনিক চ্যানেলগুলোর মালিকানা নির্বিশেষে প্রায় সবারই সংবাদ বুলেটিন একইরকম হচ্ছে। গণমাধ্যমের মালিকরা জেলের বাইরে কিংবা ভেতরেই থাকুক সংবাদ পরিবেশনে তাদের পছন্দই প্রাধ্যন্য পেতো যা এখন চ্যানেলগুলো অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে।

মালিকানার ধরণ সংবাদ মাধ্যমকে অবশ্যই প্রভাবিত করে। কারণ আমাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করে তাকে প্রভাবিত করবে না এটা ভাবা যায় না। যেসব গণমাধ্যম রাজনৈতিকভাবে খুব বেশী পার্টিজান অর্থাৎ একতরফাভাবে যারা কথা বলে তাদের পাঠক খুবই কম, আবার যারা উভয় পক্ষের কথা তুলে ধরে তাদের পাঠক সংখ্যা বেশি। মানিক মিয়া বলেছিলেন, আগে সংবাদ পদবাচ্য হতে হবে। আসলেই কথাটা সে রকম। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ পরিবেশন করে যাওয়াই গণমাধ্যমের কাজ। নিজস্ব মতামত দেয় যে সব গণমাধ্যম, তারা সফলতা পায় না। তারা গ্রহণযোগ্যতা পায় না। যেমন বিটিভির কথা বলা যেতে পারে। বিটিভির বুলেটিনের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে। রাজনৈতিক সরকারের সময় তারা সরকারি সংবাদকে প্রাধান্য দিতো। এখনও এর কোন পরিবর্তন হয়নি।[২০]

তাই গণতন্ত্রের উত্তরণেও গণমাধ্যমের মালিকানার ধরণ অনেকটাই প্রভাবিত করে। গণতন্ত্রের উত্তরণে সংবাদের ভেতর গণমাধ্যমের নিজের কোন মন্তব্য দেয়া ঠিক না । বরং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উক্তি দিয়ে গণমাধ্যমকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

নির্বাচন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই গণমাধ্যমের একমাত্র ফ্যাক্টর না। রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষ এরাই নির্বাচন এবং গণতন্ত্রের প্রধান উপাদান। এছাড়াও রাজনৈতিক অবস্থান, পরিবেশ অনেক বেশি প্রভাবিত করে নির্বাচনভিত্তিক গণমাধ্যমকে।

দেশে কোন কোন সংবাদপত্রের লাখ লাখ সার্কুলেশন আছে। একটি পত্রিকা যদি চারজনও পড়ে তাহলে চার গুণ লোক ওই মাধ্যমের সংবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নির্দিষ্ট গণমাধ্যম যদি নির্দিষ্ট এজেন্ডার প্রতি ঝুঁকে পড়ে তার মানে এই নয় যে পাঠকও সেদিকে প্রভাবিত হবে। অর্থাৎ গণমাধ্যম ভোটারদের ভোট

[১৯] দৈনিক সংবাদ, ৯ অক্টোবর, ২০০৬

[২০] দৈনিক সংবাদ, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬

দেয়ার ক্ষেত্রে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে না। বাংলাদেশে এখনও নির্বাচনকে ঘিরে গণমাধ্যমের জনমত জরিপ উল্লেখযোগ্য হারে হয়নি। তবে, বেশ কয়েকটি চ্যানেল এখন এসএমএসের মাধ্যমে জনমত জরিপ করার চেষ্টা করছে। সীমিত সংখ্যক মানুষের এতে অংশগ্রহণ থাকে। ফলে এ জরিপ খুব একটা ভূমিকা রাখতে পারে না। একটা বিশেষ পত্রিকা যে জরিপ করে সেটা ওই বিশেষ পত্রিকার পাঠকরাই পড়ে। বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা এতে প্রতিফলিত হয়। তাই এ জরিপ সারা দেশের জনগণকে কতখানি প্রভাবিত করে এটা বলা মুশকিল।[২১]

ওয়ান ইলেভেনের পর গণমাধ্যমগুলোর ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এটা বলা যায় না। যে সব গণমাধ্যমের মালিক জেলে গিয়েছেন তারা যে শুধু মালিক বলেই জেলে গিয়েছেন ব্যাপারটা তা নয়। মালিক জেলে যাওয়ার পার গণমাধ্যমগুলো একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড অতিবাহিত করেছে। নির্বাচিত সরকার আসার পর দেখা যায় গণমাধ্যমের প্রতি তাদের কি আচরণ এবং গণমাধ্যম কতটুকু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে। নির্বাচিত সরকারও যে গণমাধ্যমের প্রতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে এটা বলা যায় না। তাই গণমাধ্যমেরর স্বাধীনতা রক্ষায় সবার আগে সরকার ও মালিকপক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে।[২২]

2.7 wbevP‡b MYgva¨‡gi ¸iæZ

গনমাধ্যমের আধার এবং আধেয় দুই-ই বদলে দিয়েছে তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিপ্লব। এখন উন্নত দেশের মতো আমদের দেশেও নজরকাড়া অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচেছ । দৃষ্টি নন্দন পত্রিকা বের করার আনন্দই আলাদা । তারপরও সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের উৎকর্ষ বিচার করার প্রশ্ন উঠলে সাংবাদিকতার মান এবং বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয় সামনে এসে যায় । সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সাংবাদিকতার মান এবং বিশ্বাসযোগ্যতার একটা সম্পর্ক এবং সঙ্গতি থাকলে একথা জোর দিয়ে বলা যেতো যে, বহুল প্রচারিত পত্রিকাই মানসম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য পত্রিকা ।

কিন্তু তা কি বলা যায় ? আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, অনেক সময় সস্তা জিনিস বিক্রি হয় বেশী । রুচির অবনমন ঘটিয়ে এবং গণতোষণ করে কোন পত্রিকার পক্ষে বিরাট সংখ্যক পাঠক পেয়ে যাওয়া কঠিন নাও হতে পারে । এমন দৃষ্টান্ত যে স্থাপিত হয়নি তাও নয় । কিন্তু রুচিসম্মত ও সমালোচনামূলক সাংবাদিকতা অনেক সময় বিপুল পাঠকের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হতে দেখা গেছে ।

এবার নির্বাচন ও গণমাধ্যমের কথায় আসি । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন ক্ষমতার পরিবর্তন আনায়নে মূল্যবান ভূমিকা রেখে থাকে যদি নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সবার কাছে গ্রহনযোগ্য করা যায় । তাই নির্বাচন সংক্রান্ত খবর সংগ্রহ ও পরিবেশনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে নির্বাচন কমিশন, সরকারি প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে এবং সততার সঙ্গে তাদের দ্বায়িত্ব পালন করছে কিনা । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়াকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোনভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ না হয় । মিডিয়ার স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও গণমুখী ভুমিকার গুরুত্ব অপরিসীম । অতীতে যাই হোক না কেন, এবার

[২১] দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ নভেম্বর, ২০০৬

[২২] দৈনিক সংবাদ, ৯ জানুয়ারি, ২০০৭

মিডিয়কে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সততা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা দেখাতে হবে । আমি তো মনে করি মিডিয়া দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে নির্বাচন কমিশন বাধ্য হবে।[২৩]

সংবাদপত্রের দায়িত্ব জনগণের পক্ষে কথা বলা । কিন্তু ক'টি পত্রিকা সে দায়িত্ব পালন করে! সওদাগরী স্বার্থে যদি পত্রিকা বের করা হয় এবং মিডিয়াকে যদি অনিয়ম, অপরাধ হতে রক্ষা পাবার ঢাল হিসাবে ব্যাবহার করার সুযোগ থাকে তাহলে সে সুযোগ অনেকেই নেয়ার চেষ্টা করবে, এটাই স্বাভাবিক । সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক ভাবমূর্তি তখনই মলিন হতে শুরু করে যখন তা জনস্বার্থের বদলে ভিন্ন স্বার্থে কাজ করতে শুরু করে। এটা আরও মারাত্মক হয়ে দাড়ায় যখন সেই সওদাগরী স্বার্থের পক্ষে দাড়ায় রাজনীতি। রাজনীতি কিংবা সাংবাদিকতা মানুষের উপকার করতে পারুক আর না পারুক কোনভাবে অন্যায়, অপরাধের আশ্রায় দিতে পারে না। কলুষমুক্ত সুন্দর সমাজ গঠনের মহতী লক্ষ থেকে রাজনীতি এবং সাংবাদিকতার বিচ্যুতি কোন সভ্যসমাজ সহজভাবে মেনে নেয় না। সংবাদপত্র এবং সংবাদিকতার শক্তি উন্নত দেশে ব্যবহৃত হয় দেশ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে।

তথ্য হচ্ছে সংবাদপত্রের প্রাণ। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার কাজ হচ্ছে তথ্যকে গণতন্ত্র রক্ষায় এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তি যোগাতে ব্যবহার করা। নেতা বা নেতৃত্বের শক্তি বৃদ্ধি আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধি এক কথা নয় । নেতৃত্বের শক্তি বিভিন্ন সময়ে বাড়িয়ে নিতে দেখা গেছে কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে এসব শক্তিমান নেতৃত্ব খুব কমই আগ্রহ দেখিয়েছে এবং এ ব্যপারে অবদান রেখেছে আরও কম। যদি বলা হয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে রাখার কারণে চূড়ান্ত বিচারে রাজনৈতিক শক্তিও হীন হয়ে গেছে,তাহলে নিশ্চয়ই ভুল বলা হবে না। তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ এবং তথ্যভিত্তিক মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও দক্ষতা ও নিরপেক্ষ প্রতিবেদন এবং সম্পাদকীয় লেখার সংস্কৃতি গড়ে না ওঠা পর্যন্ত আমাদের সাংবাদিকতা যে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে না একথা নির্দিধায় বলা যায়।

সাংবাদিকদের মধ্যে কাজে স্বচ্ছতা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি প্রত্যাশিত সহনশীলতা। নিজের মতের প্রতি অনড় থেকেও অন্যের মতামতের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা যায়, সাংবাদিকরা তার উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।[২৪]

2.8 wbe©Pb I Z_¨ AwaKvi

অনেক প্রতিক্ষার পালা শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের মানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছে। এই অধ্যাদেশের ফলে মানুষের জন্য সরকারি, বেসরকারী, বাণিজ্যিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সুলভ ও সহজে তথ্যপ্রাপ্তির পথ অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে জীবনমান উন্নয়নে তথ্য ব্যবহারের সুযোগ। জনমানুষের তথ্য চাহিদার পূরণের জন্য ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার সামনে নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ঘোষনা দেয়। সে অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয় এ আইনের খসড়া অধ্যাদেশের ওপর জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য ১৮ থেকে ৩১ মার্চ ২০০৮ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অধ্যাদেশটি উন্মুক্ত করে। অধ্যাদেশের ওপর দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভার

[২৩] The Daily Star, 18 December, 2008

[২৪] The Daily Star, 21 September, 2008

মাধ্যমে সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী, রাজনৈতিক নেতা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মকর্তাসহ সাধারন জনগণ খসড়া অধ্যাদেশটি জনবান্ধব করে শিগগিরই প্রণয়নের জন্য নানাবিধ সুপারিশ প্রদান করে এবং অবশেষে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ প্রণীত হয়।[২৫]

বিগত দিনগুলোতে সুশাসনের অনুপস্থিতি কীভাবে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপ্রতুল স্বাস্থ্যসুবিধা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিয়েছিল- তা দেশের নাগরিক সমাজ ভুলে যায়নি। তাই সংগত কারণেই জনস্বার্থে এসব দুষ্টচক্র থেকে জনগণকে মুক্তি দেয়ার জন্য দেশে প্রয়োজন একটি অংশগ্রহনমূলক প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার। আর এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যই দরকার জনগণের জন্য সৎ যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করার পথ নির্মাণ করা। কারণ কেবল সৎ যোগ্য প্রতিনিধি আইনের শাসন ও সাংবিধানিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে জনগণের সেবা করতে পারে। বিগত দিনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জনপ্রতিধিদের দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ জনগণ নির্বাচনের জন্য সৎ ও যোগ্য প্রার্থী খুঁজে বের করার তাগিদ অনুভব করছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত করতে হলে ভোটারদের দিতে হবে নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীর সার্বিক তথ্য জানার অধিকার। কারণ জনগণের জ্ঞাত অংশগ্রহণই গণতন্ত্রকে দেয় প্রাণশক্তি। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভোট প্রয়োগ করার আগে প্রার্থীর সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেয়া দেশের নাগরিকেরা আজ জরুরি মনে করছে। কারণ যারা নির্বাচনে নির্বাচিত হবেন তারাই দেশের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক কাঠামোকে পুনর্নির্মাণ করায় ভূমিকা রাখবেন। ভবিষ্যতের নতুন বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীরা এলাকার মানুষের প্রতি কতটুকু অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন তা নির্ভর করবে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ, সামাজিক অঙ্গীকার ও জনগণকে সেবা দেয়ার দক্ষতার ওপর। সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে তাই সক্রিয়ভাবে ভোটারদের জানার অধিকার নিশ্চিত করাই আজকের অঙ্গীকার-এটাই বর্তমান সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা।[২৬]

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন প্রশ্নে তথ্যের বিকল্প নেই। কারণ নির্বাচনী স্বচ্ছতার প্রশ্নে ভোটারদের জানার অধিকার নিশ্চিত করা না হলে অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিয়ে অস্বচ্ছতার প্রশ্ন ওঠে, এতে কোন সন্দেহ নেই। যেকোনো সচেতন নাগরিক সংগত কারণে নির্বাচনের সময় জানতে চাইবে প্রার্থীর তালিকা, প্রার্থীদের ব্যক্তিচরিত্রের স্বভাব, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এছাড়া প্রার্থীর অতীতের কোনো দুস্কর্মের জন্য অপরাধী হয়ে জেল- হাজত খেটেছেন কিনা, ফৌজদারি আদালতে তার নামে কোনো মামলা আছে কিনা, প্রার্থীর পেশা কী এবং তার ধন সম্পত্তি ও আয়ের উৎস বৈধ কিনা, দেশের কোনো ব্যাংক কর্তৃক ঋণখেলাপী ঘোষিত হয়েছেন কিনা, প্রার্থী হওয়ার জন্য শিক্ষাদীক্ষা সন্তোষজনক কিনা, সমাজের কাছে অতীত রাজনৈতিক কর্মকান্ড গ্রহণযোগ্য কিনা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মতো অপরাধে তিনি জড়িত কিনা তা ভোটাররা জানতে চাইবে। সবারই মনে রাখা প্রয়োজন যে গোটা নির্বাচনী প্রচারণা সম্পর্কে ভোটারদের জানার অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ভোটারদের জন্য তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ যত সম্প্রসারিত হবে, তত নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ভোটারদের অংশগ্রহন বেশি ত্রুটিমুক্ত হবে। ভোটারদের জন্য সঠিক তথ্যপ্রবাহ নির্ধারন করে নির্বাচনকে কার্যকর, ফলপ্রসূ ও প্রশ্নমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে তথ্য

[২৫] দৈনিক প্রথম আলো, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৬

[২৬] দৈনিক প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি, ২০০৭

অধিকার অধ্যাদেশ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। কারণ এর আওতায় নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে তার প্রাতিষ্ঠানিক দায় নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

2.9 wbevPb I MYgva¨g

নোয়াম চমস্কি'র সেই উক্তি দিয়েই শুরু করা যাক-'গণতান্ত্রিক সমাজ মানে এমন এক সমাজ যেখানে নিজেদের যাবতীয় বিষয় আশয়ের ব্যবস্থাপনায় অর্থপূর্ণভাবে অংশ নেওয়ার উপায় সাধারণ মানুষের আছে। পাশাপাশি সেখানে সংবাদ কিংবা তথ্যের মাধ্যম খোলামেলা ও স্বাধীন।' গণমাধ্যমই গণতন্ত্রে ভোটারদের তথ্যের জন্য সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। গণমাধ্যম নির্বাচনের নানা বিষয় তুলে ধরে জনগণ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারকে সচেতন করতে পারে। গণতন্ত্রকে সুসংহত করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করতে পারে গণমাধ্যম।[২৭] গণমাধ্যম নির্বাচনে দুর্নীতি, যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচনে জনগণকে সজাগ এবং সকল অনিয়ম উদঘাটনে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই নির্বাচনকেন্দ্রিক সংবাদ ও এসংক্রান্ত ভাবনা শুরু করে। গণমাধ্যমে নিবার্চনী বছর কথাটা আগে থেকে চালু হয়ে যায়। গণমাধ্যম ভোটার মতামত জরিপ, প্রার্থী বাছাই, নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে খবরাখবর, নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় নিয়ে সরকারের ভাবনা-চিন্তা, রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী সংস্কারের দাবি (যদি থাকে), নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি , তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, নির্বাচনী জোট গঠন প্রক্রিয়া, বিভিন্ন আমলে দলগুলোর তুলনামূলক শক্তি, বিভিন্ন ইস্যুতে দলগুলোর অবস্থান, প্রার্থীদের মনোয়ন লবিং, তৎপরতা, সম্ভাব্য প্রার্থীদের পরিচিতি, দুর্বলতা ও সামর্থ, অতীত নির্বাচন নিয়ে গবেষণা, অন্যান্য নির্বাচন নিয়ে জরিপ, জনগণ কোন ইস্যুগুলোকে জাতীয় জীবনের জন্য জরুরি বলে ভাবছে-রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যে সেগুলোর প্রতিফলন আছে কিনা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন-ইত্যাদি বিষয়ে নির্বাচনপূর্ব প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এছাড়া গণমাধ্যম নির্বাচন ঘোষণার দিন থেকে ফলাফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল, আচরণ বিধির সংযোজনী (যদি থাকে) রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলগুলোর তৎপরতা ও প্রতিবেদন, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোয়ন, মনোয়ন বঞ্চিত প্রার্থীদের তৎপরতা, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পরিচিতি ও কর্মকান্ড, নির্বাচনী জনসভা, প্রার্থী পরিচিতি, কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্য, স্থানীয় মনোভাব, নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি (নির্বাচন, কমিশনের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থীদের, স্থানীয় প্রশাসনের), জনমত জরিপ (ভোটের ফলাফল কেমন হতে পারে তার আভাস, ভোটকেন্দ্রের পরিস্থিতি), নারী ভোটারদের অবস্থা ও অবস্থান, নির্বাচনী নারী আসন বিষয়ক, ভোট গ্রহণ পরিস্থিতি, ভোটের দিন কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা, ভোট প্রদানে জালিয়াতি, ভোট কেন্দ্র দখল, সমর্থকদের সংঘর্ষ, ভোট গণনায় কারচুপি, বাতিল ভোটকেন্দ্র পরিস্থিতি, ভোট গ্রহণের শিডিউল, ফলাফল ঘোষণা এবং ফলাফলের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণ ও বর্জন)। এছাড়া নির্বাচনোত্তর সময়ে গণমাধ্যমে ফলাফলকে স্বাগত জানিয়ে উল্লাস, নির্বাচনী ফলাফল (যদি থাকে) বর্জনের ঘটনা (প্রতিবাদ মিছিল, বাতিল ভোটকেন্দ্রে নতুন ভোট, ভোট গণনা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা), নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের প্রতিবেদন, রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যার মূল্যায়ন,

[২৭] মোস্তফা, মনোয়ার, MYZš¿, wbevPb I bvMwiK‡`i f~wgKv GKwU mgx¶v , ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি), ঢাকা,২০০৬।

সরকার গঠনের বিভিন্নমুখী তৎপরতা, সম্ভাব্য সরকারের অংশীদার করা, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর সরকার গঠন, মন্ত্রীসভার দায়িত্ব বন্টন, সংসদে প্রথম অধিবেশন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন), একাধিক আসনে বিজয়ীদের ছেড়ে দেয়া আসনগুলোতে উপনির্বাচন এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন হামলা, নির্যাতন, মামলা, হত্যার ঘটনা বিষয়ে প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করে জনগনকে সচেতন করে। এছাড়া ও গণমাধ্যম বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করে প্রকৃত অবস্থা জনগণকে জানায়। একই সাথে কোথায় কী বাড়তি ব্যবস্থা প্রয়োজন সে বিষয়ক প্রশাসনকে সচেতন করে তোলে। নির্বাচন কমিশনার, পুলিশ ও পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, নির্বাচনী এলাকার জনগণ ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সাক্ষাতকার নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করলে নিরাপত্তা সম্পর্কে সঠিক চিত্র পাওয়া যেতে পারে। আবার নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী প্রচারণা দেখে সহিংসতার পরিমাণ অনুমান করে জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারে ।

2.10 Dcmsnvi

একটি কার্যকর সংসদ ও দক্ষ সরকার পেতে হলে ভোটারদেরকে প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তর ধারণা থাকা প্রয়োজন। দেশের বেশীরভাগ মানুষ নিরক্ষর । ফলে গণমাধ্যম প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হন তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততা সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করে জনগণকে সচেতন করতে পারে। মোট কথা নির্বাচনে সহিংসতা ও দুর্নীতি বিষয়ক রিপোর্ট গণমাধ্যমে আগে থেকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ভোটার তালিকার ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে গণমাধ্যম অনেক সংবাদই প্রকাশ করেছে। এধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে অনিয়ম কমার সম্ভাবনা দেখা দেয়। নির্বাচনের জরিপ একদিকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী সম্পর্কে জনগণের মতামত তুলে ধরে। অন্যদিকে নির্বাচনের সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থী সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে এই জরিপগুলো জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে মানুষ অনেক বেশী উৎকণ্ঠায় থাকে, এক্ষেত্রে গণমাধ্যম খুব দ্রুততার সাথে নির্বাচনী ফলাফল জানিয়ে দিতে পারে। প্রত্যেক নির্বাচনের আগেই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা, নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি এবং প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে ইশতেহার প্রকাশ করে। গণমাধ্যম এই ইশতেহারগুলো বিশ্লেষণ করে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রায়শই প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে সরকারকে জবাবদিহিতার জায়গায় দাঁড় করাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথও সুগম হয়।

নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নে গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা কতখানি? গণমাধ্যম কি আসলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে? সংবাদ প্রকাশের জন্য গণমাধ্যম কর্মীদের অদৌ কি কোনো নিরাপত্তা আছে? বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নির্বাচনে ভোট জালিয়াতি ও নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপের সমালোচনা এবং সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিবেদনের জন্য গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন।

জনগণ হয়তো গণমাধ্যমের কাছে সরাসরি সব সমস্যার সমাধান আশা করে না কিন্তু সমাধানের ব্যাপারে দ্রুত ও কার্যকর মতামত গঠনের জন্য সহায়তা পেতে চায়। সুতরাং গণমাধ্যমকে করতে হবে জনগণের জন্য সহজলভ্য, বেতার, টিভির স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে ভূমিকা রাখতে পারে। নাগরিকদের ভোটাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম প্রহরির ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম গণমানুষের হয়ে কাজ করে।

গণমানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। আর এই নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সুতারাং বাংলাদেশে নির্বাচন প্রশ্নে গণমাধ্যমকে আরো বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

Z_¨mÎ I mnvqK MšcwÄ

১. ভূঁইয়া, এম সাইফুল্লাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbevPb I MYZš t †c ÿvcU evsjv‡'kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪,অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৯।

২. Mackenzie, W.J.M, *Free Election : An Elementary Text Book*, London, 1964, p.159.

৩. বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡'‡ki mvaviY wbevPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪১-৪৩।

৪. Taylor, R.H. (ed.) *The Politics of Elections in south East Asia,* woodrow willson center Press, New York, 1996, p.3.

৫. *The Encyclopedia of Britannica,* vol-6, University of Chicago, Chicago, p. 5-6.

৬. ফেমা, RvZxq msm' wbevP‡b †cvwjs G‡R‡Ui 'wqZ I KZe¨, মে ২০০৬, ঢাকা , পৃ.৭।

৭. Finer, S.E. *Comparative Government,* Penguin press, Great Britain, 1970, p.66.

৮. Rahman, Md. saidur, *Law on Election in Bangladesh*, Dhaka-2001. p. xi.

৯. Akhter, Muhammad Yeahia, *Electoral Corruption in Bangladesh*, Ashgate Publication, Dhaka, 2001, p.3.

১০. Harrop, M. and Miller, W. L., *Elections and voters: A comparative Introducation,* Macmillan Education, London, 1994, p.245-246.

১১. ভূঁইয়া, এম সাইফুল্লাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbevPb I MYZš t †c ÿvcU evsjv‡'kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪,অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৮৭।

১২. হোসেন, এম সাখাওয়াত, evsjv‡'‡k wbevPbx ms¯'vi (1972-2008), প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.৪৩।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫।

১৪. রেজা, ইসতিয়াক, MYgva¨g fvebv, কথাপ্রকাশ , ঢাকা, ২০১৩, পৃ.২৪-২৬।

১৫. ফেরদৌস, রোবায়েত ও আনওয়ারুস মুহাম্মদ, MYgva¨g/ †kbxgva¨g, শ্রাবন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.১৫৫-১৫৯।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

১৮. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের ওপর একটি পর্যবেক্ষনমূলক বিশ্লেষণ, ঢাকা, ২০১০।

১৯. দৈনিক সংবাদ, ৯ অক্টোবর, ২০০৬

২০. দৈনিক সংবাদ, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬

২১. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ নভেম্বর, ২০০৬

২২. দৈনিক সংবাদ, ৯ জানুয়ারি, ২০০৭

২৩. The Daily Star, 18 December, 2008

২৪. The Daily Star, 21 September, 2008

২৫. দৈনিক প্রথম আলো, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৬

২৬. দৈনিক প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি, ২০০৭

২৭. মোস্তফা, মনোয়ার, MYZš, wbevPb I bvMwiK‡'i fwgKv GKwU mgxÿv , ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি), ঢাকা,২০০৬।

ZZxq Aa¨vq

wbevPb, MYgva¨g I MYZš¿ evsjv‡`k †cÖ¶vcU

3.1 fwgKv

"সৃষ্টিকর্তা যখন মানুষকে বুদ্ধি দিলেন তখণই তিনি মানুষকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দিলেন, কারণ বুদ্ধিই হলো নির্বাচন ক্ষমতা" এই উক্তিটি জনমিল্টনের। Election is the first gate of democracy building. নির্বাচনকে বাদ দিয়ে কখনই গণতন্ত্র অর্জন সম্ভব নয়। প্রাচীনকাল থেকে আজকের একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে পৃথিবীব্যাপী যে পদ্ধতি তথা সরকার পদ্ধতি, শাসন পদ্ধতি ও নির্বাচন পদ্ধতি তা সবই কিন্তু একটি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত এবং তা হলো গণতন্ত্র। এই শতকে রাষ্ট্র পরিচালনার শাসন পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্রের পাশাপাশি ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এই তিন পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে গণতন্ত্র আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে সবচাইতে বেশী প্রতিষ্ঠিত। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পতনের পরে শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা ধ্বনিত হচ্ছে সর্বত্র। তারই ফলে বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্জনের সংগ্রাম অব্যাহত। ফ্রিডম হাউসের (Freedom House) ১৯৯৩ সালের প্রতিবেদনে বিশ্বের ১৮৬টি দেশ ও ৬৬ টি ভূ–খন্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জরিপ করে উল্লেখ করা হয়েছে, উল্লিখিত দেশ ও ভূ-খন্ডের মধ্যে ৯৯টি রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিশ্বের ৬৮০ কোটি জনগণের মধ্যে শতকরা ৬৯ ভাগ এখন গণতান্ত্রিক ও মুক্ত সমাজের বাসিন্দা। উক্ত জরিপে আরো দেখানো হয়েছে বিগত দুইশ বছরে পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৬ (ছয়) গুণ অথচ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অধীনে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২ (দুই) হাজার গুণ। গণতন্ত্র অর্জনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ, নির্বাচনহীন গণতন্ত্র যেমন অর্থহীন তেমনি গণতন্ত্র বিহীন নির্বাচন পঙ্গু।[১] গণতন্ত্র একটি আদর্শ যা জনগণের প্রকৃত শাসন কায়েম করে। আর এই প্রকৃত শাসন প্রতিষ্ঠার একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো নিয়মিতভাবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগীতামূলক নির্বাচন। নির্বাচন একটি শক্তি, একটি মাধ্যম। এর কাজ হলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হলো একটি কার্যকর সংসদ, যা আইনসভা নামেও পরিচিত। এই আইনসভার সদস্যগণ জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। জনগণের ভোটের অধিকার হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম উপাদান। সার্ক (SAARC) পর্যবেক্ষকদল বলেছেন, æFree and fair elections must form part of a process of building political institutions and a democratic culture"[২] নির্বাচনী ব্যবস্থায় দেখা যায় সংসদ নির্বাচনে বেশিরভাগ প্রার্থী কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এজন্য গণতন্ত্র অর্জনের কারণ হিসেবে রাজনৈতিক দলের ব্যবস্থা কতখানি গণতান্ত্রিক তাও গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বে এ পর্যন্ত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উপায় হিসেবে স্বীকৃত নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন।

---

[১] ভূঁইয়া, এম সাইফুলণ্ডাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbevPb I MYZš¿ t †cÖ¶vcU evsjv‡`kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৯।

[২] The Daily Bangladesh Observer, 15 June 1996

3.2 evsjv‡`‡ki wbevPb c×wZ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা, এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং প্রতিষ্ঠানটিকে যেসব কাঠামোগত ও আইন-সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু ও সংকট মোকাবিলা করতে হয়, সেসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে প্রথমেই দেখা যায় ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে জারিকৃত নির্বাচনী বিধানের সংশোধনী ২০০৭-০৮ এর প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করা পাঠকের পক্ষে সহজ হবে বলে আশা করা যায়।[৩]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচন-পদ্ধতির বিষয়টি উল্লিখিত রয়েছে। এতৎসংক্রান্ত ৬৫(২) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, আইনের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট আসন (Single territorial constituencies) থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে একজন করে নির্বাচিত তিন শত সদস্যের সমন্বয়ে সংসদ গঠিত হবে, যত দিন পর্যন্ত এ আইনের ধারাটি বলবৎ থাকবে (নির্বাচিত) সদস্যকে সংসদ সদস্য হিসেবে অভিহিত করা হবে। চতুর্দশ (সংবিধান) সংশোধনী আইন ২০০৪ অনুসারে এ ধারারই (৩) উপধারায় পরবর্তী **১০** বছরের জন্য ৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং **২০১১** সালের পুনঃসংশোনীর ভিত্তিতে ওই আসনসংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, মহিলা সদস্যরা আইনানুসারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মে পূর্বোল্লিখিত সংসদ সদস্যদের প্রদত্ত 'একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট' (Single transferable vote)-এর মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। ৬৫(২) ও (৩) ধারার বিশ্লেষণ থেকে লক্ষ করা যায়, সংসদে মোট **৩৫০**টি আসনের সংস্থান রয়েছে, এর মধ্যে **৩০০**টি একক সংসদীয় আসনের সদস্যরা বহুদলীয় ব্যবস্থায় 'ফার্স্ট পাষ্ট দ্য পোষ্ট' বা সহজ সংখ্যাধিক্যভিত্তিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বাকি ৫০টি আসনের জন্য সংসদে বিদ্যমান দলীয় সদস্যসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মে পরোক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০ একক সংসদীয় আসনের নির্বাচনের জন্য সারা দেশকে জনসংখ্যাভিত্তিক ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। নির্বাচনী আইনের **১১৯**(গ) ধারা মোতাবেক প্রতিবার আদমশুমারির পর এবং যেকোনো নির্বাচনের আগে নির্বাচনী এলাকাগুলো পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। নির্বাচনী এলাকা পুনর্বিন্যাস করার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের একটি অবশ্যকরণীয় কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বর্তমান গণতন্ত্র বলতে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে বুঝায়। এ ধরণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতিগত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হলো প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি এবং অন্যটি হলো পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আইনসভার নিম্নকক্ষের সদস্যগণ এই পদ্ধতিতেই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এ ধরণের নির্বাচন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ সরল। এই পদ্ধতিতে নির্বাচকরা নির্দিষ্ট ভোটদান কেন্দ্রে এসে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে পছন্দমত একজনকে ভোট দেন। গণনায় সর্বাধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী নির্বাচিত হন। বর্তমানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এই নির্বাচন পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভারতবর্ষে লোকসভা ও বিধান সভার সদস্য নির্বাচনে এই প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সদসংদীয় পদ্ধতির সরকার বিদ্যমান। জাতীয় সংসদের সদস্যগণ

[৩] হোসেন, এম সাখাওয়াত, evsjv‡`‡k wbevPbx ms¯‹vi (1972-2008), প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৯।

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নির্বাচিত সদস্যগণই পরবর্তীতে সংসদ প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় সংসদ সদস্যগণ দেশের রাষ্ট্রপতিও নির্বাচিত করেন।

পরোক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন না করে একটি মাধ্যমিক সংস্থা গঠন করে। সেই মাধ্যমিক সংস্থার নির্বাচিত সদস্যগণই চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই মাধ্যমিক সংস্থাটিকে সাধারণত নির্বাচক সংস্থা বলা হয়। এ ধরণের নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচণের চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোটদাতাদের হাতে থাকে না। থাকে নির্বাচক সংস্থার সদস্যদের হাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এইভাবে নির্বাচিত হন। সেখানে কেবল রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করার জন্যই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে একটি নির্বাচন সংস্থা গঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচন সংস্থা গঠন করা হয় না। আইনসভাই নির্বাচক সংস্থার দায়িত্ব পালন করে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি যে নির্বাচন সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন তা গঠিত হয় সংসদের উভয় পক্ষের এবং রাজ্যের বিধানসভা সমূহের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে।[৪]

3.3 wbevPb I msweavb

নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য দরকার সাংবিধানিক সংস্থা। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকা জরুরী। যার ফলে ভোট যথাযথভাবে তালিকাভুক্ত করা, গণনা করা, ফলাফল প্রকাশ করা, নির্বাচনের ফলাফল সঠিক কিনা তা যাচাই করা ইত্যাদি সম্ভব হয়। নির্বাচন যাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হয় তার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিধান থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি সাংবিধানিক দিক। নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন আছে। এই কমিশনের একজন প্রধান থাকেন যাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলা হয়। তার অধীনে কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকে। কিন্তু ইহার নিজস্ব কর্মচারী সংখ্যা কম এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য ইহাকে শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে কমিশনের পক্ষে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা কঠিন হয়ে পড়ে। নির্বাচন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় যখন অস্ত্রের ভাষা প্রাধান্য পায় এবং যুক্তি কোনঠাসা হয়। কিন্তু আমাদের সংবিধানে এবং কোন রাজনৈতিক দল বিষয়ক আইনে এই জটিল রোগ নিরাময়ের কোন ব্যবস্থা নেই। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার লক্ষ্যে সংবিধানে এসব দিকের সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান থাকা একান্ত আবশ্যক। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা সর্বত্র গণতন্ত্রের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। বাংলাদেশেও এর স্পন্দন আজ বিস্তৃত। গণতন্ত্রের এই স্পন্দন আরো উন্নত করার লক্ষ্যে নির্বাচনের আরো বেশী সাংবিধানিক নিয়ম-নীতি সৃষ্টি করা উচিত। যতই পড়িবে ততই শিখিবে যেমন বলা হয় ঠিক তেমনি বলা যায় নির্বাচন যতবেশী সাংবিধানিক অধিকার পাবে ঠিক ততবেশী নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে।[৫]

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৫০।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯,

3.4 wbevPb Kwgkb I Zvi ÿgZv

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংবিধানই নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার উৎস। নির্বাচন কমিশন হচ্ছে সংবিধানের ১১৮ নম্বর ধারার আওতায় গঠিত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। ১১৮(৪) নম্বর ধারায় নির্দিষ্ট করেই বলা হয়েছে, সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানের আয়তাধীন এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় নির্বাচন কমিশন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীয় কার্যাবলি পরিচালনা করবে। (সর্বশেষ সংশোধনীসহ ২০০৬-এর ১ আগষ্ট মুদ্রিত বাংলাদেশ সংবিধানের ৭ খন্ড নির্বাচন) নির্বাচন কমিশনকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপায় এবং সম্ভাব্য যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা সংবিধানসূত্রেই দেয়া হয়েছে। ধারা ১১৯(১)-এ উল্লেখ আছে: 'রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন এবং অনুরূপ অপরাপর নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে নজরদারি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা সাংবিধানিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের সূত্রেই নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকবে।' (সর্বশেষ সংশোধনীসহ ২০০৬-এর ১ আগষ্ট মুদ্রিত বাংলাদেশ সংবিধানের পার্ট ৭ম খন্ড নির্বাচন)। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২০০৫ সালের রিট মামলা নম্বর ২৫৬১...আবদুল মোমেন চৌধুরী ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিচারের রায় প্রদানকালে ২৪ মে ২০০৫ বিজ্ঞ আদালত ধারা ১১৯(১) সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেন, সংবিধানের ১১৯ ধারাটির পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে নজরদারি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং তা এতদুদ্দেশ্যে যেরূপ ক্ষমতা অত্যাবশ্যক, সেরূপই প্রদত্ত বলে গণ্য হবে, যদি না প্রকাশ্যভাবে বাতিল করা হয়। (রিট ২৫৬১, আগষ্ট ২৪, ২০০৫)।

এভাবেই নির্বাচন কমিশন যে শুধু সাংবিধানিকভাবেই ক্ষমতা লাভ করে, তা-ই নয়; দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভিভাবক ও রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী অপরাপর প্রতিষ্ঠানেরও সমর্থন পেয়ে থাকে। এরূপ ক্ষমতার পরিধিতে অপরাপর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন পূণর্গঠনমূলক যেসব ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে, সেগুলো ২০০৮ সালের সংসদীয় এবং পরবর্তী অপরাপর নির্বাচনে যর্থাথই সুফলদায়ক প্রতিপন্ন হয়। এযাবৎ যেসব গঠনমূলক উদ্যোগ, বিশেষত ২০০৭-০৮ সালে বাস্তবায়িত হয়েছে, সেগুলো বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন-ব্যবস্থাকে অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের তুলনায় উন্নততর করতে পেরেছে।[৬]

3.4.1 wbevPb Kwgkb : MVb I KvhcYvjx

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের নির্বাচন পরিচালনা করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বল হয়েছে, ''প্রধানে নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।''[৭]

---

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৫১-৫২।

[৭] তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫, পৃ.৩৮- ৪৯।

সংবিধানে আরও বলা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ-১১৯(১)], ''সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংসদের নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী-

ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

খ) সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

গ) সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং

ঘ) রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

msm‘ wbe©vPb

আইন অনুসরণ করে ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (বিভিন্ন সময় সংশোধিত) সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের দিক নির্দেশনা দেয়।

সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে বল হয়েছে, সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি করে ভোটার তালিকা থাকবে এবং ধর্ম,বর্ণ, জাতি ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করে কোনো বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাবে না। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার অধিকারী হবেন যদি তিনি-

ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;

খ) বয়স আঠারো বৎসরের কম না হয়;

গ) কোনো যোগ্য আদালত কর্তৃক অ-প্রকৃতিস্থ ঘোষিত না হন;এবং

ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন।

১৯৮২ সালের ভোটার তালিকা অধ্যাদেশের ৭নং ধারায় ৮নং উপ-ধারায় নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজন অনুযায়ী ভোটার তালিকা পুনর্বিন্যাস করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ivócwZ wbe©vPb

সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংসদ সদস্যগণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১-এ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে।

¯vbxq miKvi wbe©vPb

সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন নিম্নলিখিত সরকার নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতা রাখে;

ক) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

খ) সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

গ) পৌরসভা নির্বাচন

ঘ) তিনটি পার্বত্য জেলার পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন

অনুচ্ছেদ ১১৮ (৪)-এ বলা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবলমাত্র সংবিধান ও আইনের অধীনে হবেন। অনুচ্ছেদ ১২৬-এ বর্ণনা করা হয়েছে, "নির্বাচন কমিশণের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।"

সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কমিশনের কার্যবিধির আওতায় পড়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি ও পরিচালনা, নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ করা, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করা । নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে না, কিন্তু উপনির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করতে পারে। গেজেট আকারে ফলাফল প্রকাশিত হবার পর নির্বাচন কমিশণ কোনো সংসদীয় নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করতে পারে না।

wbevPb Kwgk‡bi KvVv‡gv

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং এক বা তার অধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়।

নির্বাচনকার্য পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণে একটি সহকারী নির্বাহী বিভাগ হিসেবে এটি এতদিন কাজ করে আসছিল। ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ- এর নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশনেও পরিবর্তন আনা হয়। ২০০৮ সালের ৯ মার্চ 'নির্বাচন কমিশন সবিচালয় অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, "সংবিধানের ১১৮ (৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে উহার জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।" এই অধ্যাদেশবলে গঠিত নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বর্তমানের কমিশনের নিজস্ব সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে এবং এটি সরকারের কোনো মন্ত্রনালয়, বিভাগ বা দপ্তরের প্রশাসনিক অধীনে নয়। তবে নির্বাচন কমিশনের আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলো আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পাদন করবে।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে রয়েছেন একজন সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে খালি আছে) তিনজন যুগ্মসচিব, সাতজন উপসচিব, পঁচিশজন সহকারী ও সিনিয়র সহকারী সচিব, একজন জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং একজন সহকারী জনসংযোগ কর্মকর্তা (বর্তমানে খালি আছে।)[৮]

wbevPb Kwgk‡bi wewfb kvLvi Kvhµg

(K) wbevPb Kwgkb mwPevjq

- সকল জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।
- সংসদীয় নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা।
- গণভোট এবং রাষ্ট্রপ্রতি, সংসদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ইত্যাদি নির্বাচনসমূহ (উপনির্বাচন ও পুনঃনির্বাচনসহ) পরিচালনা করা।

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।

- ভোট গ্রহণের জন্য সারাদেশে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও সরকারি গেজেট আকারে তা প্রকাশ করা।
- নির্বাচন কশিনের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের প্রতীক সংসরক্ষণ ও বরাদ্দ করা।

প্রত্যেক নির্বাচনের আগে সারা দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বেং নির্বাচনী কর্মকর্তা অর্থাৎ রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, সহাকরী প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা।

- ব্যালট পেপার ছাপানো ও সরবরাহ করা।
- ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত সকল মালামাল সংগ্রহ ও রিটার্নিং অফিসারের কাছে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, গণভোট এবং স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল সংগ্রহ ও প্রেরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রত্যেক নির্বাচনের ফলাফল সংকলিত করা এবং সরকারি গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
- স্থানীয় পরিষদে নির্বাচনী আবেদন নিস্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং এ বিষয়ে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।
- গবেষণা, রক্ষণাবেক্ষন এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী তথ্য সংগ্রহ ও সংকলিত করা।
- প্রত্যেক নির্বাচনের ব্যাপারে সামগ্রিক রিপোর্ট তৈরী ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা।
- নির্বাচন কমিশনে বিভিন্ন আইনের অধীন দায়েরকৃত আবেদনসমূহের সংরক্ষণ, এর জন্য নির্ধারিত ফিস আদায়, এসব আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং কমিশণের সিদ্ধান্তের সত্যায়িত কপি সরবরাহ করা।
- নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত বা নির্বাচন কমিশনের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ব্যাপারে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিদের্শসমূহ বাস্তবায়ন করা।
- নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা।
- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মাঠ পর্যায়ের অফিসমূহের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করা।
- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওপর অর্পিত বিষয়গুলো অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান তৈরী।
- আদালতে আদায়যোগ্য ফিস ছাড়া নির্বাচন কমিশনের বিষয়সংক্রান্ত ফিসসমূহ আদায় করা।
- নির্বাচন কমিশনারদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া।
- নির্বাচন পর্যবেক্ষণসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও এসংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা।
- আন্তঃনির্বাচন কমিশন, ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ নির্বাচন কমিশন এসোসিয়েশন ও সার্কভুক্ত দেশসমূহের নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ রাখা।
- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- রাজনৈতিক দল নিবন্ধন এবং এসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা।
- প্রাসঙ্গিক কোনো আইনের অধীনে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(L) gvV chv‡qi Kvhvjq

(১) বিভাগীয় পর্যায় : দেশের আটটি বিভাগীয় সদর দফতরে উপ-নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত আছেন। বিভাগীয় দফতরের কাজ হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সচিবলায় ও এর অধিনস্ত মাঠ পর্যায়ের দফতরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া, সব ধরণের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী, ভোটার নিবন্ধন ও ভোটার তালিকা তৈরি, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচন কমিশন সময় সময় যে রকম নির্দেশ দেয় তার সমন্বয় সাধন করাও বিভাগীয় নির্বাচনী দফতরের কাজ।

(২) জেলা পর্যায় ঃ দেশের ৬৪ জেলায় ৮৩ টি জেলা নির্বাচনী অফিস রয়েছে। এসব অফিসের দায়িত্বে আছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণ। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণ ভোটার নিবন্ধন, ভোটার তালিকা ছাপানো, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনা, পোলিং অফিসারদের ফর্ম, প্যাকেট, ম্যানুয়াল, ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স ও ভোটার তালিকা সরবরাহ করা এবং বিভিন্ন নির্বাচনের জন্য পৃথক পৃথক ব্যয়ের হিসাব রাখা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন।

৩। উপজেলা পর্যায় : মাঠ পর্যায়ের নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্নে উপজেলা নির্বাচন অফিস। দেশের প্রতিটি উপজেলায় একজন করে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা রয়েছেন। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের নির্বাচনী অফিসকে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কাজে সহায়তা করা।

(M) wiUwbs Awdmvi I mnKvix wiUwbs Awdmvi

সকল জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন বা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কোনো বিশেষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে নিয়োগ করেন।

(N) wcmvBwWs Awdmvi I mnvKvix wcmvBwWs Awdmvi

একটি নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সাধারণত পাঁচটি করে বুথ থাকে। এই বুথগুলো এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে প্রতিটি বুথে নির্বাচনের দিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চারশ ভোটার ভোট দিতে পারে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে একজন করে প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার থাকেন যারা বুথগুলোর দায়িত্বে থাকেন। প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের নিয়োগ করা হয় সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে তাদের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, সততা ও সাহসিকতার ভিত্তিতে।

ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে নির্বাচন কমিশনের স্থায়ী অফিস রয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে রয়েছেন একজন করে উপ-নির্বাচন কমিশনার এবং একজন সহকারী নির্বাচন কমিশনার। জেলা পর্যায়ে রয়েছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা।

নির্বাচন কমিশনের অধীনে ১৯৯৪ সালে দুই জন সার্বক্ষনিক গবেষক নিয়ে একটি গবেষণা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে ইলেকটোরাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে যার কাজ হচ্ছে নির্বাচন কর্মকর্তা ও পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মান উন্নয়ন করা। এই ইনিষ্টিটিউট থেকে কখনো কখনো রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সারা দেশে নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ঢাকার ঊর্ধ্বতন নির্বাচনী কর্মকর্তাদের জন্য এক বা দুই দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এসকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেদের এলাকার মাঠ পর্যায়ের

কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। উপনির্বাচনের আগেও এই প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট নির্বাচনী এলাকার সকল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়। ২০০৮ এর ১১ নভেম্বর পর্যন্ত নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ২৮,৫২০৭২ জনকে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ভোটারদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ইনিষ্টিটিউট তথ্যচিত্র, পোষ্টার এবং লিফলেট তৈরী করে। ১৯৯৫ সালের আগে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

নির্বাচন কমিশন হচ্ছে একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কেবলমাত্র সংবিধান এবং সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। কমিশনের প্রধান বা যেকোনে সদস্য যে কোনে কর্মকর্তা আইনানুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো ক্ষমতা পরিচালনা ও প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারে।

কমিশন নির্বাচনের সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করার ক্ষমতা রাখে।

নির্বাচন পরিচালনা করার সময় নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জেলা পর্যায়ে একজন করে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। একটি সংসদীয় এলাকায় রিটার্নিং অফিসারকে সহযোগিতা করেন এক বা একাধিক সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

জেলা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনারকে রিটার্নিং অফিসার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তারাও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন।

রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করে থাকেন। এই ধরনের সকল নিয়োগ অস্থায়ী। নির্বাচনের সকল কাজ শেষ হলে, এই নিয়োগ বাতিল হয়ে যায়।

msm' wbevP‡bi c¯wZ

সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিকালে নির্বাচন কমিশন নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে:

ধাপ-১ প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরি।

ধাপ-২ নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারন।

ধাপ-৩ ভোটার তালিকা তৈরি ।

ধাপ-৪ রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ।

ধাপ-৫ ভোটকেন্দ্র স্থাপন।

ধাপ-৬ প্রিসাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ।

ধাপ-৭ নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষন প্রদান।

ধাপ-৮ ভোটার তালিকা সরবরাহ।

ধাপ-৯ প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটারদের প্রতি আহবান এবং নির্বাচনের কর্মসূচি প্রণয়ন ।

ধাপ-১০ নমিনেশন বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে শুনানি গ্রহণ।

ধাপ-১১ প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ করা।

ধাপ-১২ নির্বাচনের সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিতরণ।

ধাপ-১৩ নির্বাচন পরিচালনা ও ভোট গণনা।

যখন নির্বাচনের জন্য কোনো প্রতিবেদন তৈরি করা হবে তখন নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ভিত্তি, এর কাঠামো, কার্যাবলী এবং এ সচিবালয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখতে হবে।

wbevPb Z‘šÍ KwgwU

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর জেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি নির্বাচন তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোট গ্রহনের আগ পর্যন্ত সংগঠিত নির্বাচনী অনিয়ম তদন্ত করে নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট পেশ করবে। সে রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।[৯]

wbevPb Kwgk‡bi Z_¨mÎ

প্রধানত তিনটি উৎস থেকে নির্বাচনসম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। ভোটার নিবন্ধীকরণ, ভোটারের সংখ্যা, সংসদীয় এলাকার আয়তন ও ভোটারসংখ্যা,নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও প্রাথী সংখ্যা, প্রার্থীর প্রতীক, ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা, রিটার্নিং অফিসারদের নামের তালিকা, কোন ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা হবে, আইন-কানুন সম্পর্কিত তথ্য, ভোটদান পদ্ধতি, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি সাধারণ তথ্যের জন্য প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়। মূল যোগাযোগের ব্যক্তি সেখানে জনসংযোগ কর্মকর্তা। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের একটি চমৎকার ওয়েব সাইট রয়েছে যা নিয়মিত আপডেট করা হয়। সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ে সাধারণ তথ্যের জন্য সাংবাদিকরা কমিশনের এই ওয়েবসাইট এর সাহায্য নিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রধান সংবাদ উৎস রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়। নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ও আয়তন, পুরুষ ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট এলাকার মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা, বুথ, ভোট বাক্স ইত্যাদির সংখ্যা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, অতিরিক্ত পোলিং অফিসারদের নামের তালিকা, প্রার্থীর সংখ্যা, তাদের দলীয় পরিচিতি এবং পোলিং অফিসারদের নামের তালিকা, প্রতীক, নির্বাচনী প্রস্তুতির সর্বশেষ অবস্থা ইত্যাদি তথ্যের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস এটি। সাধারণত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এই অফিসের সার্বক্ষনিক কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেন এবং সমস্ত তথ্য দেয়ার জন্য তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস হচ্ছে ভোটকেন্দ্র (নির্বাচনের দিন) ভোটকেন্দ্রে তথ্য উৎস হিসাবে কাজ করেন প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার,অতিরিক্ত পোলিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট এবং ভোটাররা। একটি ভোটকেন্দ্রে কত ভোটার , কত ভোট দেয়া হয়েছে, এর মধ্যে নারী ও পুরুষের ভোট কত, প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক, কারচুপি হয়েছে কিনা, ভোটার বাক্স ছিনতাই হয়েছে কি না, নির্বাচনী কর্মকতা ও নিরাপত্তা কর্মীদের ভূমিকা, বিভিন্ন প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের আচরণ, প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী আইন কানুন ও আচরণবিধি সঠিকভাবে মানা হয়েছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে ভোটকেন্দ্র।

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-৪৯।

যদি কেউ নির্বাচন সম্পর্কে সাধারণ তথ্য এবং সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটার সংখ্যা সংগ্রহ করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তথ্য সংগ্রহকারীকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তার সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। সচিবালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে সমস্ত সাংবাদিক সম্মেলন করেন তাতে নিয়মিত যোগ দিতে হবে।

পদ্ধতিগত এবং নির্বাচনের দিনের অন্যান্য তথ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এবং রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে আগে থেকেই সংগ্রহ করে তারপর মাঠ পর্যায়ে যেতে হবে সাংবাদিককে। নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাকে মানসিকভাবে তৈরি থাকতে হবে। যিনি ভোটের দিনের তথ্য সংগ্রহ করবেন, তাকে প্রথমেই কোনো না কোনো সংসদীয় এলাকা বাছাই করতে হবে, সেই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা, প্রশাসন এবং যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। সাংবাদিককে জানতে হবে এলাকাটি কত দুরে, সেখানে যাতায়াতের উপায় কী ইত্যাদি। কোনো সংসদীয় এলাকায় ভোটের দিনের তথ্য সংগ্রহ করতে হলে সে এলাকায় দুই বা তিনদিন আগে পৌঁছানোই ভালো।

cavb wbevPb Kwgkbv‡ii mv ÿvZKvi

যদি কোনে প্রতিবেদক একটু ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিবেদন তৈরী করতে চান তবে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে তা করতে পারেন, কারণ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনিই সর্বোচ্চ ব্যক্তি। যেকোনো পর্যায়ে তাঁর সাক্ষাতকার নেয়া যেতে পারে। যদি নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরুর ঠিক আগেই তাঁর সাক্ষাতকার নেয়া যায়, তাহলে আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক অনুভূতির ব্যাপারে পাঠকরা ধারণা পেতে পারেন। নির্বাচনের পরে যদি তার সাক্ষাৎকার নেয়া হয় তাহলে পাঠকরা নির্বাচনের একটি মূল্যায়ন তার কাছ থেকে পেতে পারেন। অন্যান্য নানা বিষয়ে যেমন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিজস্ব ব্যাখ্যা থাকে। (বা থাকতে পারে), তেমনি কোনো খারাপ নির্বাচন হলে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

wbevPbx KgKZv‡‘i ‘wqZ

একজন প্রতিবেদক, যিনি নির্বাচন নিয়ে লেখালেখি করতে চান, তাকে অবশ্যই নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কার কী দায়িত্ব তা জানতে হবে। নির্বাচনী প্রচারকালে এবং ভোটের দিনে প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কার কী দায়িত্ব তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

wiUwbs Awdmvi

- মনোনয়নপত্র গ্রহণ এবং বাছাই।
- ভোটকেন্দ্র স্থাপন।
- প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও অতিরিক্ত পোলিং অফিসারদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেয়া।
- ভোটকেন্দ্রে ভোটার তালিকা ও ব্যালট বাক্সসহ অন্যান্য নির্বাচন সামগ্রী প্রেরণ।
- প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এদের কেউ যদি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে তাঁদের প্রতিস্থাপন বা বদলি করা।
- নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী জনগণকে ভোটের সময় সম্পর্কে অবহিত করা।

- যদি কোনো ভোটকেন্দ্রে ভোট স্থগিত হয়ে যায়, তবে তা তাৎক্ষনিকভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে জানানো।
- নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থগিত ভোটকেন্দ্রসমূহে পুনরায় ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করা।
- নির্বাচনী ফলাফলের টেবুলেশন কোন তারিখে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তা প্রার্থী বা তার এজেন্টকে জানানো। প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত গণনাকৃত ফলাফলের টেবুলেশন করা হয় প্রার্থী বা এজেন্টের উপস্থিতিতে।
- বাতিলকৃত ব্যালট পেপারগুলো পরীক্ষা করা এবং যেসব ব্যালট পেপার বেআইনিভাবে বাতিল করা হয়েছে তা গণনার মধ্যে নেয়া।
- ডাকভোট গণনা
- কোনো প্রার্থীর পক্ষ থেকে সন্তোষজনক আবেদনের ভিত্তিতে পুনরায় ব্যালট পেপার গণনা।
- দুই জন প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী প্রার্থী নির্ধারণ করা।
- সবরকম ব্যবহৃত ব্যালট পেপার (এর মধ্যে টেণ্ডর্ড ব্যালট, অভিযোগকৃত ব্যালটও অন্তর্ভুক্ত) মুড়ি বই তার হিসাব সংরক্ষণ করা এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সেগুলো সিল করে রাখা।
- সাংবাদিকদের ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ঢুকে রিপোর্ট করার লিখিত অনুমতি প্রদান।
- বেসরকারী চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা
- একটি নির্দিষ্ট ফরমে সকল প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী তাঁদের নির্বাচনী ব্যয়ের সম্ভাব্য উৎস রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময় তা জানাতে হবে।
- নির্বাচিত ঘোষনার ১৫ দিনের মধ্যে একজন প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী তাঁদের নির্বাচনী ব্যয়ের সম্ভাব্য উৎস রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময় তা জানাতে হবে।
- নির্বাচিত ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে একজন প্রতিদ্বন্দী বিজয়ী প্রার্থী তাঁর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব রিটার্নিং অফিসারের কাছে একটি নির্দিষ্ট ফরমে জানাবেন।
- সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারকে তাঁর কাজে সহায়তা করবেন।

wcmvBwWs Awdmvi

- গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ৯(২) ধারা অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনা করেন। ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকলে তিনি তা রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন।
- যেসব ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে ফেলা হয়নি বা ভোটকেন্দ্রের আশে পাশে পাওয়া গেছে সেগুলোকে তিনি বাতিল করবেন। (ধারা ২১)
- যদি পরিস্থিতি খারাপ হয় বা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তবে তিনি ভোট গ্রহণ স্থগিত করবেন (ধারা ২৫.১)
- ভোট কেন্দ্রে অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে বহিস্কারের নির্দেশ দিবেন।
- ভোটারদেরকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করা এবং নির্বাচনের সময় শেষ হবার পূর্বেই যারা ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে পারবেন তাঁদের ভোট দেওয়ার সুযোগ দেয়া (ধারা ৩৫)

- নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব পালন শেষ হলে তা রিটার্নিং অফিসারদের জানানো (ধারা ৩১-৩৬)
- ভোট কেন্দ্রে কর্মরত পুলিশ, আনসার এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা এবং তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা।
- ভোট গণনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কেন্দ্রের ফলাফল বিশেষ সংবাদবাহকের মাধ্যমে বা টেলিফোনে বা ওয়ারলেসে রিটার্নিং অফিসারকে জানানো।
- কোনো প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে কোনে এজেন্ট যদি প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে ব্যালট পেপার হিসাবের একটি প্রত্যায়িত কপি চান তবে তিনি তাকে তা প্রদান করবেন।

mnKvix wcmvBwWs Awdmvi

- প্রিসাইডিং অফিসারের অধীনে কাজ করবেন এবং প্রিসাইডিং অফিসারকে কাজে সহযোগিতা করবেন।
- প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে একটি কেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

‡cwjs Awdmvi

- একজন ভোটারের পরিচিত পরীক্ষা করবেন, তাঁর আঙুলে কালি চিহ্ন আছে কি না দেখবেন, ভোটার তালিকা চিহ্নিত করবেন, ভোটারের আঙুলে অমোছনীয় কালি লাগাবেন এবং ভোটারকে একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করবেন।

3.5 wbevPb e¨e¯vi HwZnwmK weeZb

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরই, ১৯৭২ সালের সংবিধানে নির্দেশিত কাঠামো অনুসারে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতার আগে, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয় স্থাপন করা হয়। তাই বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে নিযুক্ত কর্মীরা প্রথম অবস্থায় বেসামরিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক নির্বাচন, গণভোট ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে চলমান অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। প্রায় শূন্য থেকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা সবাই পাকিস্তানের অন্যতম সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন নির্বাচন, ১৯৭১ সালের তদানীন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন পরিচালনার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে। এই কর্মকর্তা ও কর্মীরাই একই বছর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার কাজে এসব অভিজ্ঞতা যথার্থই সহায়ক হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী আইন জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী ও দৃঢ় কাঠামোসম্পন্ন করা হয়। একই সময়ে আরও কতিপয় আইন ও বিধান বলবৎ করা হয়, যেমন নতুন আইনে ভোটারের বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়। সংবিধানের আওতায় এবং 'জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ' কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানে যেভাবে নির্দেশিত রয়েছে, সেভাবেই সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। ১৪টি রাজনৈতিক দল ও নির্দলীয় প্রার্থীরা সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে মোট ২৯২টি আসনের মধ্যে ২৮২টিতে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সফলভাবে অনুষ্ঠিত সেই নির্বাচন বিরোধী দলগুলোর দ্বারা সামান্য হলেও সমালোচিত হয়।

ধারা ৬৫ (২) এ উল্লেখ আছে, আইনের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট আসন থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে একজন করে নির্বাচিত তিন শত সদস্যের সমন্বয়ে সংসদ গঠিত হবে। যদিও সংবিধানে ভোট প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলা হয়নি, বরং বিষয়টি আইনের ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং আইনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন এর কথা বলা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। সে যা-ই হোক, বাংলাদেশের প্রথম সংসদীয় নির্বাচনটি 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' বা সহজ সংখ্যাধিক্যভিত্তিক নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়, যেমনটি বিশ্বজুড়ে কমনওয়েলথভুক্ত অধিকাংশ দেশেই হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের অন্য দুটি দেশ ভারত ও পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই নিয়মটি চালু রয়েছে। পদ্ধতিটি এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশেও প্রচলিত রয়েছে বিবেচনা করেই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও 'ফাস্ট পাস্ট দ্য পোষ্ট' পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়।[১০]

3.6 MYZš

গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা বিভিন্ন রকম। গণতন্ত্র নদীর একটি স্রোতের মত। যার কোন সুনির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। Practice makes a man perfect. পালতোলা নৌকা যেমন জানে না নদীর ঠিকানা তেমনি গণতন্ত্রের কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা দেয়া সম্ভব নয়। বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ পাপান্দ্রু বলেছেন, "সহিংসতা অথবা সন্ত্রাস গণতন্ত্রের ভিত্তি নয়। যুক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, স্বাধীনতা, অপরের অধিকার ও উচ্চাশার প্রতি সম্মানই গণতন্ত্রের ভিত্তি। গণতন্ত্র কোন পতিতা নয় যে তাকে কোন বন্দুকধারী রাস্তা থেকে তুলে নিতে পারবে।[১১] যুগে যুগে গণতন্ত্রের পদধবনি বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। মানুষ ধীরে ধীরে হলেও এর স্বাদ অনুভব করতে পারছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন বলেছেন, "বিশ্বে এখন গণতন্ত্রের Third weve বা তৃতীয় ঢেউ চলছে, যার শুরু আশির দশকের প্রথম দিকে। এ ঢেউ শীর্ষে উঠলো ১৯৮৯ তে, যখন মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের এবং তারই ধারাবাহিকতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলো। ঢেউ এসে বাংলাদেশেও লেগেছিল যার প্রমাণ, আশির দশকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বিরোধী দলগুলোর যৌথ আন্দোলনে জীবন দিয়েছিল অনেকে। অধ্যাপক হান্টিংটন আরো বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে গণতন্ত্রের একটি চতুর্থ ঢেউ এর সূচনা হতে পারে। আশা করা যায় এই চতুর্থ ঢেউ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে।[১২] গণতন্ত্র এক ধরণের ব্যবস্থা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক সমাজব্যবস্থা, সবার আশা-আকাঙ্খা ধারণ করে গণতন্ত্র। সবার জীবনকে স্পর্শ করে। সবার জন্য রচনা করে এক বলিষ্ঠ জীবনবোধ। গণতন্ত্রকেই বলা যায়, যা আইনের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত, প্রশাসনিক কাঠামো যাই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে

---

[১০] হোসেন, সাখাওয়াত, wbe©vPb Kwgk‡b cvP eQi, (2007-2012), পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩।

[১১] Maniruzzaman, Talukdar, *Politics and Security of Bangladesh*, UPL, p.149-153.

[১২] Huntington, Samuel P., *The Third wave : Democratization in the late twentieth century*, University of Oklahama Press, 1991, p.67.

না। গণতন্ত্রের মৌল উপাদান প্রধাণত পাঁচটি ঃ সাম্য, গণসার্বভৌমত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, আইনের শাসন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। গণতন্ত্র হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নিয়ে শাসনব্যবস্থা চালানোর একটি পদ্ধতি। গণতন্ত্র একটি গাড়ীর মত। আপনার একটি গাড়ী আছে, সে গাড়ীর ইঞ্জিন আছে, গিয়ারবক্স আছে, তা হলো আপনার সরকার, আপনার সংসদ। আপনার জ্বালানী আছে, তা হলো সেই ভোট যা আপনাকে সরকার নির্বাচিত করেছে এবং এই জ্বালানী আপনাকে পাঁচ বছর চালাবে। কিন্তু তা ছাড়াও গাড়ীটির ইঞ্জিনে তেল দরকার, লুব্রিকেটিং ওয়েল দরকার। গাড়ী যদি জ্বলানি ভর্তি থাকে কিন্তু লুব্রিক্যান্ট না থাকে তাহালে সে গাড়ী চালিয়ে আপনি বেশিদূর যেতে পারবেন না, মাইল খানিক পরই গাড়ী থেমে যাবে কারণ লুব্রিক্যান্ট ছাড়া গাড়ী অতিরিক্ত গরম হয়ে যাবে। গণতন্ত্রের বিপদটা হলো এই। যদি সহনশীলতা না থাকে, সহনশীলতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তা কাজ করবে না। গণতন্ত্রের আদর্শগত ও কাঠামোগত দিক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছে মতবেদ।

গণতন্ত্র উন্নয়নের ধারক ও বাহক। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে উন্নয়ন ঘটাতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে হলে সমাজে তথা সর্বত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। গণতন্ত্র সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। গণতন্ত্র অর্জনের জন্য নূর হোসেন নিজ শরীরে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লেখা অবস্থায় জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। ডাক্তার মিলন শহীদ হয়েছেন এই গণতন্ত্রের জন্য। গণতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশে কত জনই না প্রাণ দিয়েছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থাসহ সর্বত্র গণতন্ত্রের চর্চা প্রয়োজন। অধিকার আদায়ের জন্য যেমন গণতন্ত্র দরকার তেমনি অধিকার দেয়ার জন্যও দরকার গণতন্ত্র। সমাজে সুস্থ ও সৎ মানসিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্র। আর এই প্রয়োজনীয়তাই বলে দেয় বাংলাদেশের গণতন্ত্র কেন দরকার।

গণতন্ত্রের বহুবিধ অর্থ ও প্রয়োগ রয়েছে, যার ফলে ধারণাটির সর্বসম্মত ও সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র, সামাজিক গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ইত্যাদি বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কেউ কেউ গণতন্ত্রকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন।এসব সীমাবদ্ধতার কারণে গণতন্ত্রের সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই বরং তাত্ত্বিকেরা বিশেষ বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়ে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[১৩]

গণতন্ত্র (*democracy)* ধারণাটির উৎপত্তি ঘটেছে গ্রিক শব্দ *demokratia* থেকে, যার মূল অর্থ হল *demos* (জনগন) ও *kratos* (শাসন)। গ্রিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে হেরোডোটাস (Herodotus) পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দে সর্বপ্রথম জনগণের শাসন বোঝাতে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেন। ইংরেজি ভাষায় গণতন্ত্র শব্দটি প্রবেশ করে ষোড়শ শতকে ফরাসি শব্দ 'democratic' থেকে, যা প্রকৃতপক্ষে গ্রিক ভাষায় উৎপত্তি লাভ করেছিল।[১৪]

---

[১৩] বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡`‡ki mvaviY wbevPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা,২০১৩, পৃ.২৮।

[১৪] Mannan, Md. Abdul, *Elections and Democracy in Bangladesh,* Academic press and Publishers library Dhaka, 2005, p.4.

গ্রিসীয় গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ বা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র, যাতে সকল নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে সরকারি নীতি-নির্ধারণি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু বাস্তবে প্রাচীন গ্রিসীয় নিয়ম অনুসারে জনগণ পদবাচ্যভুক্ত হত না। কাজেই প্রাচীন গ্রিসীয় গণতন্ত্র আধুনিক গণতন্ত্রের মত সর্বজনীন রাজনৈতিক সমতার (universal political equality) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।[১৫]

আধুনিক গণতন্ত্র প্রাচীন গ্রিসীয় গণতন্ত্রের মত প্রত্যক্ষ নয় বরং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যাপক জনসংখ্যা ও বিস্তৃত ভৌগোলিক সীমারেখার কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই সবচেয়ে কার্যকর। আধুনিক অর্থে গণতন্ত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটে সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে, আমেরিকার বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, উপরন্ত Agreement o the people , Declaration of Independence এবং Declaration of the Rights of Man আধুনিক গণতন্ত্রের বিকাশে তিনটি মাইলফলক, যেগুলো জনগণের রাজনৈতিক অধিকারকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাছাড়া শিল্প বিপ্লব, রেনেসা ও সংস্কার আন্দোলন আধুনিক গণতন্ত্রের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত সংজ্ঞা জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার, জনগণের জন্য সরকার, (government of the people, by the people and for the people) গণতন্ত্রের বর্তমান ধারণার ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। আব্রাহাম লিংকন তাঁর সংজ্ঞায় যদিও সরকার ও জনগণের মধ্যকার জটিল সম্পর্ককে সরলীকরণ করেছেন তথাপি জনগণই যে গণতন্ত্রের মূল বিষয় তা এ সংজ্ঞায় গুরুত্বের সাথে ব্যক্ত হয়েছে।[১৬] আধুনিক অর্থে গণতন্ত্রকে মনে করা হয় শাসনের একটা প্রক্রিয়া (a process of the ruling) যার মধ্য দিয়ে জনগণ নিজেদেরকে শাসন করে।

গেটেল (Gettle) বলেছেন, গণতন্ত্র এমন এক ধরণের সরকার যাতে সংখ্যাধিক্য জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার পায় (Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power)।[১৭]

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী R.M. MacIver লিখেছেন, "Democracy is not a form of government, democracy is a way of life..... democracy grows into its beings. "[১৮]

রাজনৈতিক সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয় । এতে মনে করা হয়, সকল ব্যক্তিই রাজনৈতিক দিক দিয়ে সমান। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, আর নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির নির্বাচিত করার ও নির্বাচিত হওয়ার সমান অধিকার থাকবে।

এজন্য গণতন্ত্রে এক ব্যক্তি, এক ভোট (one man, one vote) নীতি অনুসরণ করা হয় এবং সকলের ভোটই সমমূল্যের । এ দিক বিবেচনা করে রবার্ট ডাল (Robert Dahl) গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করছেন এভাবে "প্রত্যেক নাগরিককে তাদের পছন্দ প্রকাশের সমান সুযোগ দিতে হবে যা অন্য নাগরিকদের পছন্দের সমমূল্যের বলে বিবেচিত হবে। (Each citizen must be ensured an equal opportunity

---

[১৫] *Ibid*, p.4-5.

[১৬] Lincoln, Abraham, *Famous Speeches of Abraham Lincoln*, p.147.

[১৭] Quoted in Mohajan, V.D., Recent Political thought, S. Chand & Company Ltd., New Delhi, 1990, p.65.

[১৮] মনিরুজ্জামান, তালুকদার, evsjv‡`‡k MYZ‡šai msKU: GKwU we‡kl Y, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ.১৭।

to express a choice that will be counted as equal in weight to the choice expressed by any other citizen) ।[১৯]

গণতন্ত্র সম্পর্কে বরার্ট ডাল (Dahl) এর ধারণা সম্ভবত গণতন্ত্রের সমকালীন ধারণাগুলোর উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি গণতন্ত্রকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্য (goal) এবং উপায় (means) । তিনি মনে করেন যে, গণতন্ত্র হচ্ছে একটি ব্যবস্থা, যা অর্জন করতে হবে। (a condition to be obtained) এবং উক্ত ব্যবস্থা অর্জনের জন্য প্রক্রিয়া নির্ধারক নীতিতে পৌঁছানো বিশেষ (a principle guiding the procedure for attaining the goal) । তিনি গণতন্ত্রকে একটি লক্ষ্য হিসেবে এবং পলিয়ার্কিকে (polyarchy) উপায় হিসেবে মনে করেন।[২০] রবার্ট ডাল মনে করেন, বাস্তব জগতে খাঁটি গণতান্ত্রিক সরকার নেই বরং কিছু কিছু সরকার গণতান্ত্রিক সরকারের কাছাকাছি যেটাকে তিনি পলিয়ার্কি বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পলিয়ার্কিকে বর্তমানের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের (political democracy) অর্থে ব্যবহার করেছেন।

Joseph Sehumpeter তাঁর *Capitalism. Socialism and Democracy* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে গণতন্ত্রের কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, "গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে জনগণই মূল নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে (the democratic method is that institutional arrangement for arriving to decide by means of a competitive struggle for the people's vote)।[২১]

আধুনিক জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী W.F.Willoughby এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

Representation in government is regarded today as a process whereby individuals within the state have the capacity to express freely their desires on government policy through formed elections, upon discussed and position to thouse in office, Instead of government officials being virtual repesentatives., they are considered responsible representatatives.[২২]

Lyman Tower Sargent তাঁর *Contemporary Politial Ideologies* : Comparative Analysis (1981) গ্রন্থে গণতন্ত্রের মূলনীতি স্বরূপ কয়েকটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। উপাদানগুলো হলো ঃ

- Citizen involvement in political decision making;
- Some degree of equality among citizens;
- Some degree of liberty or freedom granted to or retained by citiziens.
- A system of representation;
- An electoral system majority rule.[২৩]

---

[১৯]Dahl, Robert A., Democracy and Its critics, Yale University Press, 1989, p.109.

[২০] Mannan, Md. Abdul, *Elections and Democracy in Bangladesh*, Academic press and Publishers library Dhaka, 2005, p.7.

[২১] Schumpeter, Joheph, Capitalism, Socialism and Democracy, Union Paper backs, 1987, p.269.

[২২] W.F.Willoughby, *The Government of modern states*, West View Press, New York, p.114

[২৩] Sargent, Lyman Tower, *Contemporary, Political, Ideologies : Comparative analysis*, 1981, p.131

MYZ‡ši ZËmgn

গণতন্ত্রের প্রকৃতি নির্ধারণে একেকজন তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিকগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিগত ভিন্নতার ফলে গণতন্ত্রের তত্ত্বে বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে প্রধান প্রধান তত্ত্ব হচ্ছে। ১। ক্লাসিক্যাল উদারনৈতিক তত্ত্ব ২। এলিটবাদী তত্ত্ব ৩। বহুত্ববাদী তত্ত্ব ৪। মার্কসীয় তত্ত্ব।

KwmK¨vj D‘vi‰bwZK ZË

ক্লাসিক্যাল উদারনৈতিক তত্ত্বকে মেডিসনিয়র ও জনপ্রিয় (Madisonian and populist) তত্ত্ব বলেও অভিহিত করা হয়। এই তত্ত্বের উৎপত্তি ঘটে আধুনিক যুগে যখন মানুষের মর্যাদার গুরুত্ব স্বীকৃতি পায়। এতে মনে করা হয় যে, সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তির কল্যাণে নিয়োজিত (all the social institutions were for the betterment of man as an individual)।[২৪]

ক্লাসিক্যাল উদারনৈতিক তত্ত্বে মানুষের বিকাশই চিন্তার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেয়েছিল। হবস মন্তব্য করেছিলেন যে, জনগণ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। জনলকও মনে করেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল ভিত্তিই হচ্ছে জনগণের সম্মতি। তাঁর চিন্তায় আধুনিক গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের ইঙ্গিত ছিল। অষ্টাদশ শতকে মন্টেস্কু ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং রুশো সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব প্রদান করেন।

জেফারসন ও মেডিসন ক্লাসিক্যাল উদারনৈতিক তত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নির্মাণ করেন। উনিশ শতকে বেন্থাম ও জে. এস. মিল জনগণের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। টমাস হবস, গ্রিনসহ হবহাউস, লিন্ডসে, বার্কার, লাস্কি ম্যকাইভার, উড্রো উইলসন, জি, ডি. এইচ. কোল প্রমুখ চিন্তাবিধ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থক ও প্রবক্তা। বিশেষ করে বিশ শতকে নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তি এবং ভোটাধিকারে বয়সহ্রাস উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করে।

পিটার এইচ. মার্কেল তাঁর Political continuity and change গ্রন্থে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন : ১। সরকার জনগণের সম্মতির ওপর ভিত্তিশীল। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার জনগণের ম্যান্ডেট অর্জন করে। প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ জনগণের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হয়; ২। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আরেকটি নীতি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। এ ব্যবস্থায় ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা, আঞ্চলিকতা, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়। এতে এক ব্যক্তির এক ভোট এবং সকল ভোটই সমমূল্যের নীতি প্রবর্তিত থাকে; ৩। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর অধিকার স্বীকৃত হয়। এতে সংখ্যালঘুর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইনগত ব্যবস্থা থাকে; এবং ৪। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সরকার হয় সাংবিধানিক সরকার অর্থাৎ সরকার আইনের দ্বারা গঠিত; কোনো ব্যক্তির দ্বারা গঠিত সরকার নয়।[২৫]

---

[২৪] Quoted in Mohajan, V.D., Recent Political thought, S. Chand & Company Ltd., New Delhi, 1990, p.605.

[২৫] *Ibid*, p.649.

G¨jUev`x ZË

বিংশ শতকের শুরুতে গণতন্ত্রের এলিটবাদী তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এ তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হচ্ছেন প্যারেটো (Pareto), মসকা (Mosca), মিশেলস (Michels), বার্নহাম (Barnham), সুম্পেটার (Schumpeter), অ্যারন (Aron), সারতরি (Sartori) প্রমুখ। এলিটবাদী তত্ত্ব উদারনৈতিক তত্ত্বের জনগণের সরকারের ধারণা বাতিল করে দেয়। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন যে, প্রতিটি সমাজই অনিবার্যভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত। ১। মুষ্টিমেয় শাসক; ২। সংখ্যাধিক্য শাসিত। কিন্তু কী কী কারণে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি শাসন করে এবং সংখ্যাধিক্য শাসিত হয় - এ ব্যাপারে এলিট তাত্ত্বিকদের মতানৈক্য রয়েছে।

এলিটবাদী প্যারেটো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Mind and Society তে মানবসমাজের ইতিহাসকে এলিট শাসনের ইতিহাস হিসেবে দেখেছেন। তিনি এলিট শাসনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মধ্যে অবশিষ্টের (residue) পার্থক্যের কারণে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি শাসন করে এবং সংখ্যাধিক্য শাসিত হয়।

মসকা তাঁর বিখ্যাত The Ruling Class এবং মিশেলস তাঁর Political Parties গ্রন্থে এলিট তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা উভয়েই মনে করেন যে, সব সমাজই মুষ্টিমেয় শাসক শ্রেণী দ্বারা শাসিত হয় এবং সংখ্যাধিক্য মানুষ শাসিত হয়। সুম্পেটার তাঁর Capitalism socialism and Democracy গ্রন্থে গণতন্ত্রের ধারণা তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন যে, সরকারের ধরণ নির্ধারিত হয় এর প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা বিশেষ করে যে পদ্ধতিতে আইন ও নীতিপ্রণেতা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। রেমন্ড অ্যারণও তাঁর Social Structure and the Ruling Class গ্রন্থে প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছেন। তিনি মনে করেন যে শাসক এলিট নির্বাচন এবং তাদের কাজের ওপর চাপ সৃষ্টি করা ব্যতীত জনগণের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। সারতরি তাঁর Democratic Theory গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, জনগণ তাদের শাসনের অধিকার কেবল নির্বাচনের সময় প্রয়োগ করতে পারে।

eûZev`x ZË

আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিংশ শতকে গণতন্ত্রের বহুত্ববাদী তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে সমর্থন করা তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। তাদের মতে, মার্কিন সরকারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক, যা বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিফলন ঘটায় এবং ক্ষমতা একটি দল বা গোষ্ঠীর হাতে নয় বরং বহু হাতে থাকে। (A democracy reflecting many interest groups, that power is not held by one group but plural by many groups) [26]

বহুত্ববাদ একটি ব্যবস্থা, যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সরকারের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বন্টিত হয়; এতে রাষ্ট্র এবং বহু ধরণের বেসরকারি গ্রুপ ও ব্যক্তির অংশীদারিত্ব থাকে (Pluralism is a system in which political power is fragment among the branches of government, it is moreover shared between stae and a multitude of private group and individuals)[27]

রবার্ট ডাল তাঁর Polyarchy Participation and Opposition এবং A Preface to Democratic Theory গ্রন্থদ্বয়ে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের ধারণা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন যে, সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন, ভোক্তা, রাজনীতিবিদ,

---

২৬ *Ibid*, p.664.

২৭ *Ibid*, p.665.

ভোটার এবং আরও অনেক গ্রুপ ও সংগঠন প্রভাব বিস্তার করে। ডাল মনে করেন, এমনকি গণতন্ত্রে এলিটদের উদ্ভব স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু তিনি পাওয়ার এলিট ও শাসক এলিটদের ধারণা নাকচ করে দিয়েছেন।

gvKmxq ZË

গণতন্ত্রের অন্যান্য তত্ত্বের সাথে মার্কসীয় গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মার্কসীয় তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই তত্ত্ব পুঁজিপতি শ্রেণীতে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিপক্ষে এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে। কার্ল মার্কসের মতে, গণতন্ত্র হচ্ছে,

Not as a system but as a process which essentially comes down to a struggle for democracy. The later is never completed becasuse democracy can always be arrived forward to force back, the purpose of struggle is to go beyond democratic state, to build a society without state power.[28]

মার্কসীয় তত্ত্বের উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। এতে শ্রমিকশ্রেণীর উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব চালানো হয়। এ ধরণের গণতন্ত্র কেবল পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে। সরকারি নীতি নির্ধারণে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয় এবং ব্যাপক সংখ্যাধিক্য সাধারণ মানুষ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

লেনিন বুর্জোয়া গণতন্ত্র মূল্যায়ন করে মন্তব্য করেছেন, "পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে গণতন্ত্র খবুই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটি সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে এবং পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের একটি পর্যায় মাত্র (Democracy is of great importance for the working class and its struggle for freedom against the capitalist. It is only one of the stages in the cause of development from feudalism to capitalism to communism.)[29]

মার্কসের মতানুসারে, সাম্যবাদেই কেবল প্রকৃত গণতন্ত্র অর্জিত হতে পারে। কেননা প্রকৃত গণতন্ত্রে শ্রেণী-শোষণ থাকবে না; শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও থাকবে না। এ অবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠা হবে এবং মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হবে। এটিই মার্কসের মতে প্রকৃত গণতন্ত্র।

3.7 wbevPb I MYZš

বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখনো সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। ফলে গণতন্ত্র বিনির্মাণে এদেশে গণমাধ্যমের কাছে মানুষের প্রত্যাশা রয়েছে অনেক বেশী। প্রত্যাশা রয়েছে যে, গণমাধ্যম মানবাধিকার লংঘনের প্রশ্নে সোচ্চার থাকবে, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত তথ্য উদঘাটন করবে, সর্বোপরি গণতন্ত্র বিকাশে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে। গণতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনগুলোর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে নির্বাচনকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও গণমাধ্যমের কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা থাকে।

গণমাধ্যমের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা ও নির্ভরতা বেড়েছে রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার কারণে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য নির্বাচন কমিশন, সংসদ, রাজনৈতিক দল, সংবিধান ও আইনের

[২৮] *Ibid*, p.669.

[২৯] *Ibid*, p.669.

মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে সফলভাবে কাজ করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানগুলো সৃষ্টিকারী আইন এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধানে গলদ রয়েছে। প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে ব্যক্তি, সংগঠন ও দলের মধ্যে বিশাল সীমাবদ্ধতা রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। দেশে গণতন্ত্র বিকাশের দায়িত্ব চলে গেছে এমন ব্যক্তিদের হাতে যাদের অনেকে নিজেরাই গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নন। কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের সঙ্গে তাদের কেউ কেউ এমনভাবে জড়িত যা গণতন্ত্রের সরাসরি প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করেছে। নির্বাচন কমিশনসহ অনেক প্রতিষ্ঠানে এমন ব্যক্তিরা দায়িত্ব পালন করেছেন, যাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব ও অযোগ্যতার অভিযোগও রয়েছে।[৩০]

এই প্রেক্ষিতে গণমাধ্যমের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা ও আকাঙ্খা বেড়েছে অনেকগুণ। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চর্চার জায়গা সংসদ। সংসদের ব্যর্থতার জন্য আমরা সংবাদপত্রের কাছে এমনকি সংসদের পরিপূরক ভূমিকা আশা করি। সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের । সেখানে অনাস্থা থাকায় আমরা সংবাদপত্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। দুর্নীতি আর অনিয়ম উদঘাটনের দায়িত্ব সংসদীয় কমিটিগুলো আর দুর্নীতি দমন কমিশনের। সেই দায়িত্ব পালনে এই প্রতিষ্ঠানগুলো বহু বছর যাবত ব্যর্থ থাকায় আমরা সংবাদপত্রের ওপর আরো বেশী নির্ভরশীল হয়েছি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টির দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। এই মূল্যবোধ বরং বিনষ্টকরণে তারা কিছু ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। ফলে সংবাদপত্রের ওপর এক্ষেত্রেও আমাদের নির্ভরশীল হতে হয়েছে।

গণমাধ্যম এই প্রত্যাশা অনেক ক্ষেত্রে পূরণ করতে পেরেছে, কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থও হয়েছে। গণমাধ্যমের সাফল্য বা ব্যর্থতার সঙ্গে এর নিজস্ব জবাবদিহতার প্রশ্নও জড়িত। কিন্তু অন্যের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা খবরদারী করলেও নিজের কর্মকান্ডের জবাবদিহিতার ব্যাপারে গণমাধ্যম অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক। বাংলাদেশের মত দেশসমূহে যেখানে সরকার বিরোধী সাংবাদিকতা অধিকতর গ্রহণযোগ্য, সেখানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোই গণমাধ্যমের নৈতিকতা ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে থাকে। অন্যরা সাধারণত বিষয়টি নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখান না। তবে গণতন্ত্র বিনির্মাণে উপযুক্ত ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে আরো সামর্থ্যবান হওয়ার জন্য গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা জরুরী বলে বিশ্বব্যাপী একটি ধারণা রয়েছে।

3.8 MYgva¨g I MYZš

গণতন্ত্র মানেই জনমত, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত। আব্রাহাম লিংকনের চির প্রচলিত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা- "Government of the people by the people and for the people" অর্থাৎ জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার। তাই বলা হয় গণতন্ত্রে জনগণই সব ক্ষমতার উৎস। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

এই ক্ষেত্রে দু'জন মনীষির দুটি উক্তি দেয়া যেতে পারে। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছিলেন, "তুমি যে কথা বল তার সঙ্গে আমি একমত নাও হতে পারি কিন্তু তোমার মত ব্যক্ত করার অধিকার রক্ষা করার জন্য আমি আমার জীবন দিতে পারি"। দার্শনিক Laski বলেছিলেন, If good people do not do

[৩০] ভূঁইয়া, এম সাইফুলণ্ঢাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbevPb I MYZš t †c¶vcU ev¯j¦‡'kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫।

politics, They must be prepared to be rould by bad people." দু'জনের বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী। তেমনি ভাল মানুষের রাজনীতি করাও জরুরী। তা না হলে খারাপ মানুষই কথা বলবে এবং তারাই রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিবে।

স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা বর্ণ বিন্যস্ত সমাজে জনসাধারণের মৌল অধিকারের স্বীকৃতি মেলে না, সেখানে মৌলিক অধিকার শুধুমাত্র কাগজে কলমে স্বীকৃত। বাস্তবিক সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের চালক রাজনৈতিক দল বিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত । সচেতন ও আদর্শ নাগরিকমাত্রই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চান। প্রতিটি রাজনৈতিক দলও এমন প্রতিশ্রুতিই ব্যক্ত করে। এতদসত্ত্বেও বাস্তবতা হলো যে আজও তা সম্ভব হয়নি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পেছনে আজও রয়েছে নানা ধরণের অন্তরায়।[৩১]

সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাব বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। যা গণতন্ত্রের বাঁধাস্বরূপ। শাসকের রক্তচক্ষুকে গ্রাহ্য করে চলতে গিয়ে সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। জাতীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্বের অভাবও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে আজ শক্তিশালী অন্তরায়। আজকের নেতৃত্বের দিক দিয়ে বলতে গেলে কেউই জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়ে ওঠেনি। উগ্র রাজনৈতিক মতাবলম্বিরাও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যহত করে চলছে। সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকারের প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধাবোধই নেই।[৩২]

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার প্রধান উদ্দেশ্য জনমত গঠন করা। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনগণকে তারা সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এজন্যই সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। সংবাদকর্মীর হাতেই জনমত গঠনের দায়িত্ব। সঠিক সত্য তুলে ধরার মাধ্যমে সংবাদপত্র যেমন সঠিক জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, তেমনি অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে ভুলপথে পরিচালনা করতে পারে। সমাজ ও রাজনীতির গবেষণাধর্মী ও সঠিক চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে গণমানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে পারে । সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্য সত্য অসত্যের সঠিক চিত্র তুলে ধরা। বিত্ত-বৈভব বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় নয়, রাষ্ট্র সমাজ ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই অনেকে এই মহান পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিই দিতে পারে নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা। সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে জনগণকে নির্বাচনী প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলে আদর্শবাদী জনসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব । বিত্ত বৈভব বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ লাভের আশায় নয় দেশপ্রেমই হওয়া উচিত-সাংবাদিকতার প্রধান ব্রত।[৩৩]

সঠিক সংবাদ পরিবেশন গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হলেও, সে কাজ এতোটা সহজ নয়। তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই সাংবাদিকতা এক ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। অধিকাংশ দেশেই বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রতিপক্ষ হচ্ছেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ। এর অন্যতম কারণ হলো এসব দেশে প্রনিনিয়তই সরকার পরিচালনায় সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারও এ সমালোচনা এড়াতে এবং নিজেদের গুণকীর্তন ছড়াতে সাংবাদিকদের নানা রকম প্রলোভন দিয়ে আকৃষ্ট করে থাকেন। অনেক সময় প্রলোভনের শিকার না হলে প্রশাসনিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়

---

[৩১] Jahan, Rounaq, *Bangladesh Politics, Problem and Issues*, (Dhaka: University Press, 1980) p.183-185

[৩২] দৈনিক প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

[৩৩] দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি, ২০০৭

সাংবাদিকদের। সরকার বিরোধীতার অপরাধে তাদের ওপর সশস্ত্র আক্রমন চালানো, থানায় নিয়ে যাওয়া, ডিটেনশন দেয়া সংবাদপত্র কার্যালয়ে ও সাংবাদিকদের বাড়ীতে হামলা করা ইত্যাদি বহুবিধ হয়রানির শিকার হতে হয় তাদেরকে।[৩৪]

নির্বাচনের সংকটময় মূহূর্তে দলীয় অবস্থান গ্রহণ না করে সাংবাদিককে পেশাগত অবস্থান নিতে হবে। কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি মৌন সমর্থন থাকলেও অন্যায়, অযোগ্যতা ও অসত্যতার প্রতি তার শক্তিশালী কলম ধরতে হবে। তাকে খেয়াল রাখতে হবে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নয় বরঞ্চ নিরপেক্ষ সত্যকেই তিনি তুলে ধরবেন।[৩৫]

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে মরহুম তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সাহসী অবদানের কথা এদেশবাসী কোনদিন ভুলবে না। ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধের পটভুমি রচনায় এদেশের অনেক সংবাদকর্মী অসামান্য অবদান রেখেছেন।

সাংবাদিকতা যত ঝুঁকিপূণই হোক না কেন, এ পেশার মাহাত্ম উপলব্ধি বা বিবেচনা করে গণমাধ্যমতত্ত্ব এবং কর্মসূচী দিয়ে দেশকে উপহার দিতে হবে সুস্থ নির্বাচন আর উপযুক্ত সরকার।

3.9 MYZš I MYgva¨‡gi ¯vaxbZv

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা আমাদের সংবিধান খুব স্পষ্টভাবেই প্রত্যেক নাগরিককে দিয়েছে। তবে একই সঙ্গে জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমানন, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ-সাপেক্ষে'র কথাও লেখা আছে {৩৯(২) ধারা}।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হলো সেখানে মত প্রকাশের অধিকার থাকবে এবং স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রকাশের অধিকার সুনিশ্চিত। কোন মতামতে কারও ব্যক্তিগত অনুভুতিতে আঘাত লাগতে পারে। তিনি সংক্ষুব্ধ হতে পারেন। কিন্তু কার মনে আঘাত লাগবে বলেই সে সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে বা লিখতে পারবে না, তা আমাদের বা কোনো গনতান্ত্রিক দেশের সংবিধানই বলে না। বাংলাদেশে প্রায় কোনো নেতা বা ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে কটাক্ষ বা সমালোচনা করার দায়ে মানহানির মামলা হয়ে থাকে। তাতে অভিযুক্তের হয়রানির শেষ নেই। দিনের পর দিন আদালতে ঘুরতে হয়। এক পর্যায়ে গিয়ে একটা মীমাংসা হয় বটে, কিন্তু বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষেরই অর্থ ও শ্রমের অপচয় হয়।[৩৬]

পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিষয়টি খুবই সুরক্ষিত । বাকস্বাধীনতা বিষয়টি খুবই সুরক্ষিত । বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সর্বোচ্চ। কিন্তু উপমহাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পক্ষেই অসহিষ্ণুতা অতি বেশী, যা আদালতে মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। ষাটের দশকে মুম্বাইয়ের একজন খ্যাতিমান কলাম লেখিকা ছিলেন প্যাট শার্প। বেঙ্গলি-তে প্রকাশিত তার একটি কলামে তিনি একটি আপত্তিকর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেন। তাঁর সেই মন্তব্য যেকোন বাঙালির গায়ে না লেগে পারে না। তিনি লিখেছিলেন, "[বাঙালিদের] আর মাত্র একজন বীর (?) সুভাষচন্দ্র বসু,

[৩৪] দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৭
[৩৫] দৈনিক প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি, ২০০৮
[৩৬]The Daily Star, 21 September, 2008

একজন দেশদ্রোহী, যিনি জাপানের পক্ষে একজন মীরজাফর ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে শহীদের সম্মান দেয়া হয় প্রতিবছর তাঁর মৃত্যুদিবসে।"

নেতাজির পরিবার এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। শরৎচন্দ্র বসুর ছেলে শিশির বসু কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে প্যাট শার্পের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন। প্যাটের সাজা হয়। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেন। হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ আপিলটি খারিজ করে দিয়ে রায়ে মন্তব্য করেন, "আইনের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রের ভাইপো একজন বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি এবং মামলটি মৃত ব্যক্তির সম্মানহানির জন্য দায়ের করা হলেও তা আইনে অচল নয়। দেশবাসি সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করে কারণ তিনি তাদের একজন অতি প্রিয় নেতা। তাঁকে দেশদ্রোহী বা মীরজাফর আখ্যায়িত করে আপিল আবেদনকারী নিজেকেই অপমানিত করেছেন।"

ওই আপিল মামলার রায়ে যা বলা হয়েছিল তার মর্মার্থ হলো, ভাব ও মতামত প্রকাশেও সংযম দরকার। কিন্তু তাই বলে মত প্রকাশে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতায় রাষ্ট্র বাধা দিতে পারে না।

রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের একটি বিচার বিভাগ। অন্য দুটি হলো নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভা বা সংসদ। একটি ভালো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তা-ই, যেখানে তিনটি বিভাগই সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে এবং থাকবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নির্বাহী বিভাগ, সংসদ ও বিচার বিভাগের বাইরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ রয়েছে। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রেকে সুরক্ষা দিতে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা অস্বীকার করে না কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।[৩৭]

আমাদের দেশে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ বিভিন্ন দিক থেকে আসে। কোনো সংবাদ তা যতই জনস্বার্থের পক্ষে হোক, কারও স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেই সাংবাদিকদের আসামি করা হয়। সংবাদ বা প্রতিবেদন ভুল বা মিথ্যা হলে তা সংশোধনযোগ্য। প্রতিবাদের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু আজকাল সাংবাদিকদের হয়রানি করতে ফৌজদারী মামলা ঠুকে দেয়া হয়। অভিযোগ নির্বাহী কর্মকতাদের দিয়ে তদন্ত না করিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে থাকে।

কথায় কথায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের কারণে মামলা, মানহানির মামলা বা আদালত অবমাননা মামলা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাউকে অসম্মান বা অমর্যাদা করতে পারে না। আদালতের মর্যাদা সমুন্নত রাখা নাগরিকদের কর্তব্য। নির্বাহী ও আইনপ্রনেতাদেরও দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমের ও নাগরিক সমাজের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে না দেয়া। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার যেখানে স্বীকৃত, সেখানে তার অপব্যবহার হতেও পারে। তবু সেই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের কথা স্মরণ করতে পারি, "জনগণের ইচ্ছাই যেখানে সরকারের একমাত্র বৈধ ভিত্তি; আর আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করা।"[৩৮]

---

[৩৭] The Daily Star, 21 December, 2008

[৩৮] The Daily Star, 30 December, 2008

3.10 Dcmsnvi

গণতন্ত্র কোন গন্তব্য স্থান নয়, গণতন্ত্র একটি যাত্রা, একটি পথ। এই বিশ্বের জনগণ চলছে। এই পথ দুর্গম। গণতন্ত্রের পথে নির্বাচনের অবস্থান। গণতন্ত্র অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পূর্বশর্ত হচ্ছে বৈধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হলো নির্বাচন। বাংলাদেশে আজ নির্বাচনের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব না হলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে না। আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগ শেষ বিচারের জনগণের ভোটের কাছে দায়বদ্ধ। এটা নিশ্চিত করতে অবাধ ভোটাধিকারের ব্যবস্থা থাকা জরুরী। এটাও নিশ্চিত করা দরকার যে, নিয়মিতভাবে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের একটি ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করতে পারে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম ভূমিকা রয়েছে। কেননা রাজনৈতিক দলগুলোই তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে। আর সাধারণ জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়ে থাকে। তাই বলা যায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতন্ত্র অর্জন সম্ভব নয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল একটি আর্দশ প্রতিষ্ঠা করা, সেটি হচ্ছে গনতন্ত্র। নিরপেক্ষ নির্বাচন আজ বাঁধার সম্মুখীন। দেশ পুরোপরি স্বাধীন হয়েছে কিন্তু গণতন্ত্র তথা নিরপেক্ষ নির্বাচন পুরোপরি স্বাধীন হতে পারেনি। বাংলাদেশে বিগত সংসদ নির্বাচনসমুহ বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় নানা অভিযোগ, নানা অনিয়ম। নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে এদেশ থেকে কালো টাকার মালিক, অস্ত্রবাজ, সন্ত্রাসীদের দৌরাত্মসহ সকল অন্তরায় অনিয়ম বন্ধ হোক চিরদিনের জন্য। পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের পাশে বাংলাদেশ লাভ করুক একটি স্থায়ী সম্মানজনক গণতান্ত্রিক আসন। কোন দেশেই কেবল সরকারি দলের একক প্রচেষ্টায় ষোল আনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্য বিরোধীদলের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ যতবেশী স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হবে, সেদেশে গণতন্ত্রও ততবেশী প্রতিষ্ঠিত হবে।

Z_¨mÎ I mnvqK MšcwÄ

১. ভূঁইয়া, এম সাইফুল্লাহ ও মোঃ ফয়সাল, “wbevPb I MYZš t †cÿvcU evsjv‡`kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৯।
২. The Daily Bangladesh Observer, 15 June 1996
৩. হোসেন, এম সাখাওয়াত, evsjv‡`‡k wbevPbx ms¯‹vi (1972-2008), প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৯।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৫০।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯,
৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৫১-৫২।
৭. তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫, পৃ.৩৮-৪৯।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-৪৯।
১০. হোসেন, সাখাওয়াত, wbevPb Kwgk‡b cvP eQi, (2007-2012), পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩।
১১. Maniruzzaman, Talukdar, *Politics and Security of Bangladesh,* UPL, p.149-153.
১২. Huntington, Samuel P., *The Third wave : Democratization in the late twentieth century*, University of Oklahama Press, 1991, p.67.
১৩. বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËeavqK miKvi I evsjv‡`‡ki mvaviY wbevPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা,২০১৩, পৃ.২৮।
১৪. Mannan, Md. Abdul, *Elections and Democracy in Bangladesh,* Academic press and Publishers library Dhaka, 2005, p.4.
১৫. *Ibid,* p.4-5.
১৬. Lincoln, Abraham, *Famous Speeches of Abraham Lincoln,* p.147.
১৭. Quoted in Mohajan, V.D., Recent Political thought, S. Chand & Company Ltd., New Delhi, 1990, p.65.
১৮. মনিরুজ্জামান, তালুকদার, evsjv‡`‡k MYZ‡š¿i msKU: GKwU we‡kølY, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ.১৭।
১৯. Dahl, Robert A., Democracy and Its critics, Yale University Press, 1989, p.109.
২০. Mannan, Md. Abdul, *Elections and Democracy in Bangladesh,* Academic press and Publishers library Dhaka, 2005, p.7.
২১. Schumpeter, Joheph, Capitalism, Socialism and Democracy, Union Paper backs, 1987, p.269.
২২. W.F.Willoughby, *The Government of modern states,* West View Press, New York, p.114
২৩. Sargent, Lyman Tower, *Contemporary, Political, Ideologies : Comparative analysis,* 1981, p.131
২৪. Quoted in Mohajan, V.D., Recent Political thought, S. Chand & Company Ltd., New Delhi, 1990, p.605.
২৫. *Ibid,* p.649.
২৬. *Ibid,* p.664.
২৭. *Ibid,* p.665.
২৮. *Ibid,* p.669.
২৯. *Ibid,* p.669.
৩০. ভূঁইয়া, এম সাইফুল্লাহ ও মোঃ ফয়সাল, “wbevPb I MYZš t †cÿvcU evsjv‡`kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫।
৩১. Jahan, Rounaq, *Bangladesh Politics, Problem and Issues,* (Dhaka: University Press, 1980) p.183-185
৩২. দৈনিক প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৬
৩৩. দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি, ২০০৭
৩৪. দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৭
৩৫. দৈনিক প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি, ২০০৮
৩৬. The Daily Star, 21 September, 2008
৩৭. The Daily Star, 21 December, 2008
৩৮. The Daily Star, 30 December, 2008

PZ_ Aa¨vq

cÂg RvZxq msm‘ wbe©vPb-1991 I MYgva¨g

4.1 fwgKv

গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন অনিবার্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের বিকল্প নেই। আর গণমাধ্যমই গণতন্ত্রে ভোটারদের তথ্যের জন্য প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। গণতন্ত্রকে সুসংহত করার ক্ষেত্রেও গণমাধ্যম সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[১] ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ ঘটনা। এই প্রথমবারের মতো একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্বৈরাচারী অবসানের লক্ষ্যে সৃষ্ট তীব্র ও দুর্বার গণআন্দোলনে একটি সরকারের পতন ঘটলে সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিক্রমে একটি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব নির্ধারিত হয় দেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই প্রথমবারের মতো সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ভোটারগণ প্রথমবারের মতো তাঁদের ইচ্ছা ও মতাদর্শ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পান। অর্থাৎ তাঁদের সামনে অনেকগুলো বিকল্প কর্মসূচী ছিল যা পূর্বের অন্যান্য নির্বাচনে ছিল না। নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী , পুলিশ ও আনসার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে প্রকৃত অর্থেই সুযোগ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। সরকারি প্রচার মাধ্যম যথা রেডিও ও টেলিভিশন এবং দেশের অধিকাংশ খবরের কাগজগুলো নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অনন্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। দল মত নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, ছাত্র-শিক্ষক ও জনতা সকলে একযোগে চেষ্টা করেন যাতে নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি নির্বাচিত সরকারের হাতে দেশ পরিচালনার ভার ন্যাস্ত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়নে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করেন এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ওয়াদাবদ্ধ হন। এই প্রথমবারের মতো ৩ জন বিচারকের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত হয় এবং উক্ত কমিশনকে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। নির্বাচন নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এতো তৎপরতা, আয়োজন, কার্যক্রম গ্রহণ, ইতঃপূর্বে এদেশে কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নির্বাচন কি সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে, ছোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি যথাযথ ছিল, ভোটারগণ কি তাদের স্ব স্ব ভোট নির্বিঘ্নে ও ইচ্ছামতো প্রদান করতে পেরেছেন, নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নে গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা কতখানি?, তারপরও নাগরিকদের ভোটাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম প্রহরির ভূমিকা পালন করে। বলা যায়, গণমাধ্যম গণমানুষের হয়ে কাজ করে।

[১] ভূঁইয়া, এম সাইফুলণ্ডাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbe©vPb I MYZš t tc¶vcU evsjv‡‘kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৯।

4.2 wbevP‡bi ‡c ÿ vcU I ZËveavqK miKv‡ii Aax‡b wbevPb

ফ্রাঙ্ক বুকম্যানের (Frank Buckman) একটি মন্তব্য প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য। তিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে সবার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে বটে, কিন্তু সবার লোভ মোটানোর জন্য তা যথেষ্ট নয়।" (There is enough in the world for everyone's needs, but not enough for everyone's greed) ।[২]

এই মূল সত্যটি বিশ্বে জন্ম দিয়েছে রাজনীতির, অর্থনীতির, মানবিক ও সামাজিক শাস্ত্রের, বিজ্ঞানের, দর্শনের। এই তত্ত্বে কথাগুলোর অবতারণা করা হচ্ছে যে, আজকের বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে তা যতটুকু রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি প্রতিকারমূলক, সংস্কারধর্মী, নির্দেশনামূলক, ফরোয়ার্ড লুকিং। ফলে এদেশে নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভব। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ একটি ব্যাপক বিস্তৃত প্রসঙ্গ। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশীদারিত্বের বিষয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্ন এলে বলতে হবে, জনগণের নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নিরপেক্ষ নির্বাচন ও নির্বাচনী আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। ১৯৯১ সালে তৎকালীন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে এবং ১৯৯৬ সালে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও চুলচেরা বিশ্লেষণে নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারদ্বয়ের সকল কর্মকান্ড প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে প্রথম নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সপ্তম সাধারণ নির্বাচনে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর ভূমিকার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন Muhammad Yeahia Akhter তাঁর *Electoral Corruption in Bangladesh* নামক গ্রন্থে। এখানে তিনি পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে সাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বলেন, "পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য আপাত দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও নির্বাচনী আচরণবিধি (Code of Conduct) অনেকাংশে লঙ্ঘিত হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি পোষণে ব্যর্থ হয়, ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।[৩] এ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং NGO-দের কোনো কাজই বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল না। নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হয় এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট। এক্ষেত্রে বক্তব্য হল, The role of the NGOs and the EC was condemned as partisan by a number of the contending parties. যদিও তাঁর এ বক্তব্য সর্বজন স্বীকৃত নয় এবং অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করেন।[৪]

পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ 'সুজন' এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত গোল-টেবিল আলোচনায় বক্তারা বলেন- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারণে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশে

---

[২] আহমদ, এমাজউদ্দীন, MYZ‡š¿ wekvm: evsjv‡`‡k MYZš¿, †gŠwj cKvkbx, XvKv, 2008, c.73|

[৩] Akhter, Muhammad Yeahia, *Electoral Corruption in Bangladesh,* Ashgate Publication, Dhaka, 2001, p.209-210.

[৪] Ali, Raisa, *Representative Democracy and concept of Free and Fair Election,* Deep & Deep Publications, New Delhi, 1996, p.20.

নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত প্যাট্রেসিয়া এ. বিউটেনিস ২০০৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকান্ড মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব সময় নিরপেক্ষ থাকেনি।[৫]

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্ব। সেনাবাহিনী, রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম কিংবা পুলিশ সর্বক্ষেত্রেই দৃশ্যমান ও কার্যকরভাবে নিরপেক্ষ থাকার ওপরই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে। দুঃখজনক হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব সময় নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারেনি।[৬]

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নব্বই দশকে ক্ষমতা হস্তান্তর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ও সফল কৌশল হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরপর চারটি মেয়াদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে সফলভাবে নির্বাচন পরিচালনা ও ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদের পরে ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন পরিচালনায় ব্যর্থতার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জনপ্রিয়তা এবং কার্যকারিতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। সেনাবাহিনী সমর্থনপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথমদিকে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেলেও এই জনপ্রিয়তা তারা ধরে রাখতে পারেনি। এতদসত্ত্বেও অনেকে মনে করেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। কেননা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণেরই দাবির প্রতিফলন। ১৯৯৪র মার্চ থেকে ৩টি প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী করেছিল।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, এ দলগুলো জনগণের প্রতিনিধত্ব করে তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে দলগুলো কত ভাগ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনকে মানদন্ড হিসেবে ধরা হলে বলতে হবে এ তিনটি দল জনগণের প্রায় ৬৮ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। দেশের ভোটার জনগণের ৬৮ শতাংশের দাবিকে 'গণতান্ত্রিক দাবি' হিসেবে গণ্য করাই গণতন্ত্রমনস্কতার পরিচায়ক। ১২ জুনের (১৯৯৬) নির্বাচনকে যদি 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিষয়ে জনগণের একটি 'গণভোট' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে মানতে হবে, জনগণের একটি বিপুল অংশও এ ধরণের নির্বাচনকালীন সরকার পছন্দ করে। গণতন্ত্রে জনগণের চাহিদা পূরণই মূলকথা এবং শেষ কথা।[৭]

4.2.1 ZË¡eavqK miKv‡ii i{c‡iLv

সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা, রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের রূপরেখা নিয়ে তিন জোট (৮ দল, ৭ দল, ৫ দল) ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর এক অভিন্ন যুক্ত ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণায় সংবিধানের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগ এবং তিন জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগের রূপরেখা থাকে। যুক্ত ঘোষণায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলা হয় যে, এরশাদ ও অবৈধ এরশাদ সরকারের অধিনে

---

[৫] দৈনিক যুগান্তর, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৬

[৬] দৈনিক যুগান্তর, ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৬

[৭] খান, মিজানুর রহমান, ms¯'eavb I ZË¡eavqK miKvi ⅡeZK, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

কোন জাতীয় নির্বাচনে আমরা ৮, ৭, ও ৫ দলীয় জোট অংশগ্রহণ করবো না। তা রাষ্ট্রপতি বা সংসদ, যে কোনো নির্বাচনই হোক না কেন। এসব শুধু বর্জনই নয়, প্রতিহত করবো।

ঘোষণায় আরো বলা হয়, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের কাছে অর্ন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং সংসদের কাছে সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

i/c‡iLvi Awfbh³ ‡NvlYvi weeiY wb‡P ‡`qv n‡jv t

হত্যা, ক্যু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তার সরকারের দুঃশাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে :

১. K. সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তথা সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের (ক) ৩ এবং ৫৫ অনুচ্ছেদের ক (১) ধারা ও ৫১ অনুচ্ছেদের ৩ নং ধারা অনুসারে এরশাদ ও তার সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত তিন জোটের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করবেন। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

   L. এই পদ্ধতিতে উক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অর্ন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌমত্ব জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

২. K. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা কোনো দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। তাঁর অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো মন্ত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না।

   L. অর্ন্তবর্তীকালীন এই সরকার শুধু প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করবেন।

   M. ভোটারগণ যেন নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সেই আস্থা পুনঃস্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

   N. গণ-প্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক দলের প্রচার-প্রচারণায় অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট অর্ন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তন্তার করবেন এবং এই সংসদের নিকট সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

৪. K. জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক যে কোনো পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে। নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোনো পন্থায়, কোনো অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।

L. জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে।

M. মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে।[৮]

4.2.2 ZËveavqK miKv‡ii Aax‡b cÂg RvZxq msm` wbe©vPb

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতনের পর তিন জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে মনোনীত করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন হন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি । বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথমেই তিনি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেন । সরকারের প্রধান দায়বদ্ধতা ছিল ৩ মাসের মধ্যে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করে আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।[৯] এ উদ্দেশ্যে সরকার বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কার্যত সরকার ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বরকে সামনে রেখে নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হয় এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১১৯১ সালের ২ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।

4.2.3 wbe©vP‡bi ‡c ÿ vcU c¯Z

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইতিহাস সুদুরপ্রসারী। কার্যত এটা ছিল ৯ বছরের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ফসল। এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেননি বরং তার অগণতান্ত্রিক শাসনামলে কিছু প্রহসনের নির্বাচনের আয়োজন করে। তার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম ১৯৮৫ সালে গণভোটের আয়োজন করা হয়, যাতে বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণ ছিলনা। এরশাদ ক্ষমতা গ্রহনের পর প্রথমেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ওপর বেশী গুরুত্ব দেন কিন্তু সফল হতে পারেনি কারণ বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণ ছিল না। তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এতে ৭ দল এবং ৫ দল অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে । এভাবে সিরিজ নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ ক্ষমতাকে বৈধ করার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে এরশাদ সংসদ নির্বাচনের কথা বলে এবং সে অনুসারে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। তবে বিরোধী দলগুলো এ নির্বাচন প্রত্যাহার করে ।

সুতরাং এরশাদের সামরিক শাসনামলে গৃহীত নির্বাচনী রাজনীতি বৈধতা পায়নি। কারণ এসব নির্বাচনী কর্মকান্ডে বিরোধীদলের অংশগ্রহণ ছিলনা। এসময় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অনুধাবন করতে পেরেছিল যে এরশাদ কর্তৃক গণতান্ত্রিক রাজনীতি ফিরে আসবে না। এরূপ অবস্থায় বিরোধী দলগুলোর

---

[৮] ঠাকুর, আবদুল হান্নান, wbe©vPb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.১১১-১২৯।

[৯] Hasanuzzaman, Al Masud, *Role of opposition in Bangladesh Politics*, UPL, Dhaka, 1998, p. 179.

অসহযোগ এবং গণআন্দোলনে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে পদত্যাগ করেন এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মতক্যের ভিত্তিতে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতনের পর তিন জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে মনোনীত করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ হন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পরই শাহাবুদ্দীন আহমদ সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন এবং সে ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এরপরই জনতার বিজয় উল্লাসে ঢাকাসহ সমগ্র দেশ ছিল উৎসবমুখর। জনতার এ বিজয় উল্লাস যাতে বিশৃঙ্খলায় রূপ না নেয় সে জন্য জোট নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করেন এবং জনগণকে স্বৈরাচারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহবান জানান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আরও ঘোষণা করেন যে, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানই তার সরকারের প্রধান দায়িত্ব এবং এজন্য বিশেষ করে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ক. দেশে অবশ্যই শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হবে আর এজন্য ছাত্রসমাজসহ সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

খ. সময়মত সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যথার্থ নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রয়োজন।

গ. জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ না থাকায় সরকারি দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন যার সদস্যবর্গ হবে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ এবং তারা আগামী নির্বাচন এমনকি এক বছরের মধ্যে কোন উপনির্বাচনেও প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্তে উপরোক্ত তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করার পরই মন্ত্রী পদমর্যাদাসম্পন্ন ১৭ জন প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং নির্দলীয় ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে এক উপদেষ্টা পরিষদ তিনি গঠন করেন। ৯ ডিসেম্বর ৬ জন সদস্য এ পরিষদের সদস্য হন। পরবর্তীতে আরও ১১ জন সদস্যকে তিনি উপদেষ্টা পরিষদে মনোনয়ন দান করেন। তিন দলীয় জোট হতে পেশকৃত তালিকায় যে ৩১ জনের নাম ছিল, তাদের মধ্য হতে তিনি ১৭ জনকে বাছাই করেন।

A¯vqx ivócwZi Dc‡'óv cwil' wb‡bw³ m'm¨‡'i wb‡q MwVZ nq :

bvg	gšYvjq
বিচারপতি এম. এ. খালেক	- আইন, বিচার এবং সংসদীয় বিষয়
জনাব কফিলউদ্দিন মাহমুদ	- অর্থ
জনাব ফখরুদ্দীন আহমেদ	- পররাষ্ট্র
অধ্যাপক রেহমান সোবহান	- পরিকল্পনা
অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ	- জ্বালানি, খনিজ সম্পদ এবং পূর্ত
অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	- শিক্ষা
জনাব আলমগীর এম. এ কবীর	- সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক, যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া
জনাব এ. কে. এম. মুসা	- শিল্প, পাট ও বস্ত্র

জনাব ফজলুর রহমান	- সেচ, পরিবেশ, বন মৎস ও পশু সম্পদ
এ.এ. মাজেদ	- স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা
মেজর (অব) রফিকুল ইসলাম	- জাহাজ, নৌ-চলাচল এবং পর্যটন
অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ	- সংস্কৃতি ও খাদ্য
জনাব এ.বি. এম.জি. কিবরিয়া	- যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ
জনাব ইমাম উদ্দিন আহমেদ	- বাণিজ্য
জনাব বি. কে. দাস	- ত্রাণ ও পুনর্বাসন
জনাব এম. আনিসুজ্জামান	- কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা
চৌধুরি এম. এ. আমিনুল হক	- শ্রম, জনশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ।[১০]

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপরিউক্ত বক্তব্য ও কর্মকান্ড হতে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর । সরকার নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন এবং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচনী তফসিল ও নির্বাচনের তারিখ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তার বিভিন্ন বিবৃতি ও ভাষণে বার বার বলেন, আসন্ন সংসদ নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা বা বিঘ্ন সৃষ্টির যে কোনো অপচেষ্টাকে কঠোরভাবে দমন করা হবে। তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন যে, শান্তিপূর্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে কোন রাজনৈতিক দলের নির্দেশে গুন্ডামি অথবা অসুদপায় অবলম্বন তার সরকার সহ্য করবে না। নির্বাচনী অপরাধের সাথে জড়িত হলে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। সে সাথে তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রার্থীদের দৈনন্দিন নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার নির্দেশ দেন। সরকারি কর্মকর্তাদেরও তাদের কর্তব্য সম্পাদনকালে আইনের শাসন মেনে চলার জন্য অনুরোধ জানান।

4.3 wbevP‡bi c‡e MYgva¨‡gi fwgKv

B‡jKUwbK wgWqv I wbevPb

সাধারণভাবে নির্বাচনের পূর্বে আমাদের দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার সুযোগ দেয়া হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা এ ধরনের নজির দেখেছি। তবে সেক্ষেত্রে রেডিও-টেলিভিশন আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে দলগুলোর নির্বাচনী ওয়াদাসমূহের বিশ্লেষণমূলক কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। রেডিও-টেলিভিশনের সাংবাদিক ও প্রযোজকদের এ ব্যাপারে কিছু পূর্ব-প্রস্তুতি ও পূর্ব-পরিকল্পনাও যা নির্বাচনে একটি ন্যায্য প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে হলে সমতা বিধানের কৃষ্টি গড়ে তোলা প্রয়োজন। বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর কাছেও জনগণের প্রত্যাশা অনেক। চ্যানেলগুলো নির্বাচনী চ্যানেল না হয়ে, সত্যিকারের গণমূখী ভূমিকা রাখবে বলে সকলেই আশা করেন। এই চ্যানেলগুলো নিয়মিত সংবাদ প্রচারের পাশাপাশি অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণমূলক সংবাদ পরিবেশন

[১০] বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡‘‡ki mvaviY wbevPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৯৮-১০৬।

করে ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বেসরকারি রেডিওগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

নির্বাচনের সময় জনগণকে নির্বাচনসংক্রান্ত সব ধরণের তথ্য জানানোর দায়িত্ব ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াগুলো নিয়ে থাকে। বস্তুত তাই নেয়া উচিত। রেডিও ও টেলিভিশনের উচিত নির্বাচনের পূর্বে কিছু কিছু বিষয়ের ওপর ঘন ঘন অনুষ্ঠান প্রচার করা, যেমনঃ ভোটারের অধিকার, ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া, ভোটের গুরুত্ব, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এর প্রয়োগ ইত্যাদি। এছাড়া ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং নিয়মিতভাবে প্রচারের জন্য নির্বাচন কমিশন কিছু কিছু অনুষ্ঠান প্রযোজনা করে। পাশাপাশি প্রিন্ট মিডিয়ারও অনুরূপ ভূমিকা ছিল।

নির্বাচনের সময় ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের উদ্যোগ নেয়। যেমন, প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি বিতর্ক অনুষ্ঠান, জনগণের সাথে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা, সংলাপ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এ ধরণের অনুষ্ঠান নির্বাচনী ওয়াদা ও অন্যান্য মন্তব্য করবার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের আরো বেশি স্বচ্ছ, বাস্তববাদী হতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আশা করা যায়।

বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রচারাভিযানের হালচিত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে তুলে ধরা হয়। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংবাদদাতা ও অন্যান্য কর্মীরা রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্পর্শে থেকে তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট করেন। এছাড়া, নিজেদের উদ্যোগে নিজেদেরই নির্বাচনী সংবাদ স্টুডিওতে পাঠানোর জন্য ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলো দলগুলোর প্রতিও আহবান জানিয়ে থাকে।

রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণাকালে রাজনৈতিক দল দেশের বিভিন্ন স্থানের ভোটারদের কাছে একই সময়ে একই বার্তা নিয়ে হাজির হয়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এ সুবিধাকে পুঁজি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রেডিও-টেলিভিশনের সম্প্রচার সময় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বিক্রিও করে। সেক্ষেত্রে আগ্রহী দলগুলো অর্থের বিনিময়ে তাদের নির্বাচনী-বার্তা রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেয়।[১১]

‡fvU KviPvc I wgwWqv K¨ eÜ Kivi Rb¨ GB wbe©vP‡b wKQ wbqg %Zvi Kivi mcwik Kiv nq| hv ^‘wbK cwÎKv¸‡jv‡Z Qvcv nq| mcwik¸‡jv wQj wbgi¡c t

১. একজন ভোটার ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পর প্রথম পোলিং অফিসার ভোটার লিস্টে ভোটারের ছাপানো নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, বয়স ইত্যাদি উক্ত ভোটারের বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে ব্যালট পেপার প্রদান করবেন। এটাই প্রচলিত নিয়ম ;

২. এবারের সংযোজিত নিয়ম অনুযায়ী ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে প্রতিটি ভোটারকে যে কোনো একজন পোলিং এজেন্ট দিয়ে অবশ্যই সনাক্ত করে নিতে হবে;

৩. এই নিয়মটি ইতোপূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি ভোটারের ক্ষেত্রে লিখিতভাবে প্রতিপালিত হয়নি বিধায় ভোটে কারচুপি বন্ধ করা যায় নি। এই বাধ্যতামূলক সনাক্তকরণ পদ্ধতিটি নতুন সংযোজন ;

[১১] তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫, পৃ.২৩৮-২৪০।

৪. এ প্রক্রিয়ার জন্য ভোটকেন্দ্রে ভোট চালু হবার পূর্বে প্রতিটি প্রতীকের জন্য দুটি কাগজের শীর্ষে সনাক্তপত্র কথাটি লিখতে হবে। তার নিচে প্রতীকের নাম, কেন্দ্রের নাম, ভোট গ্রহণের তারিখ লেখা হবে। এর নিচে প্রিজাইডিং অফিসার সই করে সীলমোহর করবেন;

৫. উপর্যুক্ত দুটি সনাক্তপত্রের একটি সংশ্লিষ্ট প্রতীকের পক্ষের পোলিং এজেন্টকে এবং অপরটি পোলিং অফিসারকে প্রদান করা হবে;

৬. যতজন পোলিং অফিসার থাকবে সনাক্তপত্রের সংখ্যাও অনুরূপ বৃদ্ধি পাবে;

৭. উপরের ১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পোলিং অফিসার ভোটারের পরিচয় মিলিয়ে দেখার পর পোলিং এজেন্টদের জিজ্ঞাসা করবেন তাদের মধ্যে কে উক্ত ভোটারের সনাক্তকারী এবং তদনুযায়ী উক্ত পোলিং এজেন্টের প্রতীকের সনাক্তপত্রে ভোটারের ক্রমিক নম্বরটি লিখবেন। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট পোলিং এজেন্টও তার সনাক্তপত্রে উক্ত ভোটারের ক্রমিক নম্বরটি লিখবেন;

৮. প্রতিটি ক্রমিক নম্বর অঙ্কে এবং কথায় লিখতে হবে;

৯. ভোটগ্রহণ শেষে প্রতিটি প্রতীকের সনাক্তপত্রে কজন ভোটারকে সনাক্ত করা হয়েছে তার সমষ্টি অঙ্কে এবং কথায় লিখতে হবে। অতঃপর পোলিং অফিসার এবং পোলিং এজেন্ট একে অপরের সনাক্তপত্রে সই করবেন;

অতঃপর পোলিং অফিসারগণ তাদের সনাক্তপত্র প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট পেশ করবেন এবং পোলিং এজেন্টগণ তাদের নিজ নিজ সনাক্তপত্র নিজ হেফাজতে রাখবেন;

১০. যদি কোনো ভোটারকে কোনো এজেন্ট সনাক্ত করতে না পারেন তাহালে ঐ ভোটারকে কেন্দ্রের ভেতরে কিংবা এমন একজন ব্যক্তিকে সংগ্রহ করতে হবে যিনি ঐ ভোটারকে চেনেন এবং একই সঙ্গে তিনি নিজেও কোনো না কোনো এজেন্টের পরিচিত। এই সনাক্তকারী ব্যক্তিকে 'সনাক্ত মাধ্যম' বলা যেতে পারে।

এরূপ ক্ষেত্রে সনাক্তপত্রে উক্ত সনাক্ত মাধ্যমের পরিচয় লিখে তার সই গ্রহণ করতে হবে এবং ভোটার লিস্টে উল্লেখিত তার ক্রমিক নম্বরটিও লিখে নিতে হবে;

১১. বর্তমান পদ্ধতিতে পোলিং এজেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে। শহরের প্রতিটি মহল্লা থেকে এবং গ্রামের প্রতিটি এলাকা থেকে কয়েকজন করে পোলিং এজেন্ট সনাক্ত মাধ্যম কেন্দ্রে উপস্থিত রাখা প্রয়োজন হতে পারে;

১২. K. যদি কোনো ভোটারকে কোনো পোলিং এজন্টে কিংবা কোনো 'সনাক্ত মাধ্যম' দিয়ে সনাক্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ভোটকেন্দ্রে অপেক্ষা করতে পারেন এবং ভোটগ্রহণ শেষে যদি দেখা যায় তার প্রদত্ত নাম ও পরিচয়ের ক্রমিক নম্বরটিতে তখনো টিক মার্ক দেয়া হয়নি অর্থাৎ উক্ত নামে কেউ ভোট দেয়নি তা হলে ঐ ব্যক্তিকে প্রকৃত ভোটার হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে;

L. আর যদি দেখা যায় উক্ত ভোটারের প্রদত্ত নাম পরিচয় নিয়ে আর একজন ভোটার এসে পড়েছেন এবং তাকে সনাক্ত করাও হয়েছে, তাহলে অপেক্ষমাণ প্রথম ভোটারকে ভোটচোর বলে ধরে নেয়া হবে। সেক্ষেত্রে তাকে সরাসরি জেলহাজতে পাঠাতে হবে এবং ভোটচুরির শাস্তির বিধান করতে হবে;

১৩. K. এই প্রক্রিয়া মতে ভোট চলাকালীন সময়ে যদি কোনো ভোটার ভোট দিতে এসে দেখতে পান তার ভোট ইতোপূর্বে প্রদান করা হয়ে গেছে অর্থাৎ তার ভোট চুরি হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে তিনি ভোটার লিস্টে তার নামের ক্রমিক নম্বরটি যার সনাক্তপত্রে লিখে রাখা হয়েছে অর্থাৎ উক্ত ভোটারকে যিনি সনাক্ত করেছে তাকে দায়ী করতে পারবেন এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে অনুরোধ জানাবেন। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ফরিয়াদি ভোটারকে অবশ্যই একজন পোলিং এজেন্ট দিয়ে সনাক্তকৃত হতে হবে;

L. এরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সহজে চেনার জন্য প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ফরিয়াদি ভোটারের বিশদ পরিচয় আইডেন্টিফাইং মার্ক ইত্যাদি লিখে রাখবেন এবং সংশ্লিষ্ট সনাক্তকারী 'সনাক্ত মাধ্যম'কে দায়ী করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারের নিকট সুপারিশ করবেন;

১৪. রিটার্নিং অফিসারের নিকট বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এই ধরণের যতগুলো অভিযোগ আসবে তা সরকারের নির্ধারিত আইন মোতাবেক তিনি বিচার করবেন এবং বিচারালয়ে পাঠাবেন;

১৫. উপর্যুক্ত অপরাধের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান থাকা বাঞ্ছনীয়। একটি ভোটের মূল্য লক্ষ টাকার চেয়ে অধিক বিধায় এবং এরূপ ভোটচুরি গণতন্ত্র প্রবর্তনের প্রতিবন্ধকতা বিধায় এক লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড প্রদানের বিধান থাকা উচিত।

‡fv‡Ui djvdj †NvlYvi KviPwc (wgwWqv K¨) eÜ Kivi Rb¨ K‡qKwU wbqg ˆZwi Kivi mcwik Kiv nq hv ˆ'wbK cwÎKv¸‡jv‡Z Qvcv nq| mcwik¸‡jv wbgi¡c t

১. কেন্দ্রে ভোট-গণনার শেষে ফলাফলপত্রে যে প্রতীকে যতটি ভোট গণনা করা হয়েছে, তা প্রতীকের বিপরীতে অঙ্কে ও কথায় লিপিবদ্ধ করতে হবে;

২. উক্ত ফলাফলপত্রে প্রতিটি পোলিং এজেন্টের সই নেয়া হবে এবং সর্বনিম্নে প্রিজাইডিং অফিসারের সই এবং সীলমোহর থাকবে;

৩. প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ফলাফলপত্রের একটি কপি করে প্রতিটি পোলিং এজেন্টকে প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেবেন;

৪. এই প্রক্রিয়ায় একজন প্রার্থী তার এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রে তার পোলিং এজেন্টগণ সংগৃহীত ফলাফলসমূহ একত্রে যোগ করে দেখতে পাবেন কার প্রতীকে কত ভোট পড়েছে এবং একইভাবে অন্যান্য প্রতীকের ফলাফল সম্পর্কেও জ্ঞাত হওয়া যাবে;

৫. এরূপক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলে যদি কোনো কারচুপি পরিলক্ষিত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী তার নিকট রক্ষিত ফলাফল দিয়ে অভিযোগ করতে পারবেন এবং শুদ্ধ ফলাফল দাবি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোনো প্রার্থী সন্দেহ প্রকাশ করলে প্রিজাইডিং অফিসার প্রদত্ত সই-সীলযুক্ত ফলাফল পত্রটিই হবে বিষয় নিস্পত্তির একমাত্র গ্রহণীয় দলিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নানা কর্মসূচি হাতে নেয়। সর্বশেষ ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছিল এরশাদ-এর সামরিক শাসনের সময় ১৯৮৩ সালে। বিভিন্নভাবে এ ভোটার তালিকাও সঠিক ছিল না। এ সময় সাধারণ জনগণের দাবি ছিল নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ফলে ১৯৯০ সালে নতুনভাবে ভোটার রেজিস্ট্রেশন করা হয়। ১৯৯০ সালে রেজিষ্ট্রিকৃত মোট ভোটার ছিল, ১,৪৩,৭৮,৫৪২ জন। নির্বাচনে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ছিল সাধারণ জনগণের দাবি। যা নির্বাচনের পূর্বে দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে বহুবার ছাপা হয় এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সচেতনতামূলক প্রতিবেদন প্রচার করে।[১২]

mvivY 4.1 : wbevPb Kwgkb KZK wbevPbx ce c¯wZ

aiY	msL¨v
আসন	৩০০
প্রতিদ্বন্দ্বী দল	৭৫
মোট প্রার্থী	২,৭৮৭
মোট ভোটার	৬,২০,৮১,৭৩৯
পুরুষ ভোটার	৩,৩০,৪০,৭৫৭
নারী ভোটার	২,৯০,৪১,০৩৬
ভোট কেন্দ্র	২৪,১৫৪
নির্বাচনী বুথ	১,১২,২৭৭
রিটানিং অফিসার	৬৭
সহকারী রিটানিং অফিসার	৪৭১
প্রিজাইডিং অফিসার	২৪,১৫৪
সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার	১,১২,২২৭
পোলিং অফিসার	২,২৪,৫৫৪

উৎস : নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

wbevPbx AvPiYwewa

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশন অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করে। যে আচরণবিধির গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ তখনকার সময় প্রিন্ট মিডিয়ায় ছাপানো হয়। ৬৭ টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে মত বিনিময়ের পর কমিশন ১৬ দফাভিত্তিক এ আচরণবিধি তৈরি করে। এই আচরণবিধি অনুসরণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় এবং এর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে। অপরদিকে নির্বাচন কমিশন মনে করে যে, সব দল যদি পুরোপুরি নিষ্ঠার সঙ্গে এই নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

১. নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি বিধান অবশ্যই মেনে চলতে হবে;
২. স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পূর্বশর্ত। কিন্তু কেবল আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টা একটি সুশৃঙ্খল নির্বাচনের

[১২] প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩-১১৭। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

জন্য যথেষ্ট নয়। তাই সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে এই ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৩. কেবল নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

৪. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও প্রার্থীকে নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করতে হবে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৫. নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুস্থ নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যেন ভোটাররা নির্ভয়ে ও অবাধে নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

৬. এমন কিছু করা যাবে না, যাতে অযথা উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ ব্যহত হয়। নির্বাচনী প্রচারণা যাতে উত্তপ্ত বাক্যযুদ্ধে পরিণত না হয়, সেজন্য সকল রাজনৈতিক দলকে বাক-সংযম ও পরমতসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে।

৭. নির্বাচনী প্রচারাভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীর সমালোচনা করা স্বাভাবিক, তবে অশালীন ও উস্কানিমূলক বক্তব্য-বিবৃতি, শ্লেষ, বিদ্রুপ, কটাক্ষ ইত্যাদি পরিহার করা উচিত।

৮. সকল রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। দলীয় শক্তি প্রদর্শন ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য কোনো দল কোনো রকম সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেবে না। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে সকল রাজনৈতিক দল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা করবে। নির্বাচনী প্রচারণাকালে অথবা ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্র কিংবা ভোটকেন্দ্রের আশে-পাশে যদি কোন ব্যক্তি অস্ত্রসহ পুলিশের নিকট ধরা পড়ে তবে তাকে ছাড়ানোর জন্য কোনো রাজনৈতিক দল কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করবে না।

৯. রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ থাকবে। প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড করা যাবে না।

১০. যে কোন ধরনের নির্বাচনী অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য নিকটস্থ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের সহয়তা গ্রহণ করতে হবে ।

১১. অর্থ বা প্রলোভনের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা এবং নিজের ও পরিবারের জন্য ছাড়া অন্য ভোটারদের জন্য কোনো রকম যানবাহন ভাড়া বা ব্যবহার করা নির্বাচনী অপরাধ; এসম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

১২. পেশীশক্তির সাহায্যে ভোটকেন্দ্র দখল বা ভোটকেন্দ্রে কোন রকম অবৈধ তৎপরতার মাধ্যমে ভোট সংগ্রহের সমঝোতা গড়ে তোলা হলে অবৈধভাবে সংগৃহীত ভোট কোনো কাজে আসবে না, নির্বাচন কমিশন এই সকল কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করে দেবে।

১৩. নির্বাচনী প্রচারণা ও ভোট সংগ্রহের স্বার্থে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী তার নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবে না।

১৪. অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গুজব ও চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ ও শান্তি - শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা যাবে না।

১৫. ভোটকেন্দ্রের আশে পাশে বা নিষিদ্ধ চৌহদ্দির মদ্যে কোনো দলের নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না এবং ভোটকেন্দ্রের মধ্যে কোনো প্রকার প্রচারমূলক তৎপরতা চালানো যাবে না।

১৬. ভোটারকেন্দ্রের নির্বাচন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়া কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। রাজনৈতিক দলসমুহকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাদের দলীয় কর্মিগণ যেন ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা না করেন। কেবল পোলিং এজেন্টগণ নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত থেকে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

১৭. তদুপরি এই নির্বাচন অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার উদ্দেশ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার **৩১** জানুয়ারি **১৯৯১** তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

ক. নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারী সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারির ওপর পূর্ন নিয়ন্ত্রন এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করে নির্বাচন কমিশনকে প্রাধাণ্য দেয়া হয়েছে।

খ. ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে নিজ নিজ এলাকার শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হযেছে। এতে ব্যর্থ হলে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে ভেঙে দেয়া হবে।

গ. পরিবহন ও উন্নয়ন খাত উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে জেলা প্রশাসকদের দায়িত্ব দিয়ে তাদের নিরপেক্ষ করা হয়েছে।[১৩]

4.4 wbevPbKvjxb MYgva¨‡gi fwgKv

ivR‰bwZK ‘j t

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন সময়ে গণমাধ্যম নির্বাচন ইস্যুতে বেশ তৎপর থাকে। ভোটারদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে ও নির্বাচনী বিধি যথাযথভাবে পালন করতে বিভিন্ন নিউজ প্রচার ও ছাপিয়ে সহায়তা করে।

রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কার্যালয়, জেলা-উপজেলা বা তার নিম্ন পর্যায়ের কার্যালয়গুলো নির্বাচনের সময় গুরুত্বপূর্ন তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করে। প্রচারাভিযানকালে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় এবং সংবাদ সম্মেলন করা হয়। ওই সব সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ সম্মেলন থেকে সাংবাদিকরা রিপোর্ট করে রাজনৈতিক দল, তাদের নেতা এবং প্রার্থীদের ঠিকমত বুঝতে সাধারণ ভোটারদের সচেতন করেন।

ivóvqZ MYgva¨‡gi fwgKv t ‡iwWI †Uwjwfkb gwbUwis

রাষ্ট্রায়ত্ব গণমাধ্যম সব সময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কথা বলে এ সমালোচনা আছেই এবং তা যথার্থও। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের বিশ্বসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। তা সত্ত্বেও আমাদের মতো দেশে যেখানে নিরক্ষরতার হার বেশি সেখানে সংবাদপত্রের চেয়ে রেডিও-টিভি অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছতে পারে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গঠনে বড় একটি ভূমিকা রাখতে পারে। সুতারাং আমদের উচিত রেডিও-টিভিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। সে কারণেই

[১৩] বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡`‡ki mvaviY wbevPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৯৮-৯৯।

নির্বাচনের সময় রেডিও-টিভির ভূমিকার ওপর কড়া নজর রাখা উচিত। বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রচারণা কতখানি গুরুত্ব সহকারে, কতখানি সময় ধরে রেডিও-টিভিতে জায়গা পাচ্ছে এই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে পত্রিকায় রিপোর্ট করাটা জরুরি।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এইচ,এম, এরশাদের নয় বছরের শাসনামলে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে তার সবগুলোতে জাতীয় প্রচার মাধ্যম রেডিও টেলিভিশনের সব রকম প্রচার সুবিধা ভোগ করেছে কেবল ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি। বিরোধী দল বা প্রার্থীর এ দুই জাতীয় গণমাধ্যমে প্রবেশাধিকারের ঘটনা ছিল বিরল। অথচ এ দুটো মাধ্যম দিয়ে খুব সহজে জনগণের কাছে পৌঁছান সম্ভব, কারন দেশের অধিকাংশ লোক সংবাদপত্র, পোস্টার বা দেয়াল লিখন পড়তে পারে না। এরশাদের আমলে একমাত্র সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিরোধীদল তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারত। এরশাদের আমলে এদেশের মানুষ 'মিডিয়া ক্যু'- এর সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হয়, যার মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফলকে বিকৃত করা সম্ভব হয়েছিল।

এবারের নির্বাচনে বিভিন্ন দল সংবাদপত্রের সাথে সাথে ইলেকট্রনিক মাধ্যম দুটোতেও বিশেষ করে টেলিভিশনে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এটি নিঃস্বন্দেহে একটি অনন্য ঘটনা। রাজনৈতিক দল ও তাদের প্রার্থীদের বড় সুবিধা ছিল এবারের নির্বাচন পরিচালিত হয়েছে একটি নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে। আর সে কারণেই বাংলাদেশ টেলিভিশন তাদের সব রকম খবরাখবর প্রচার করার চেষ্টা করেছে।

তবে সঙ্গত কারণেই সব রাজনৈতিক দল রেডিও টেলিভিশনে সমান সময় পায় নি। সংবাদপত্রের বেলায় সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এ দু'টো রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ দিন সংবাদপত্রগুলো দুই নেত্রীর একই আকারের ছবি এবং ঐ দুটো দলের খবর একই আকারের শিরোনামে ছাপার চেষ্টা করেছে। অনেক সংবাদপত্রসেবীকে বলতে শোনা গেছে যে, তারা পেশাগতভাবে এরকম করতে বাধ্য। টেলিভিশনে সংবাদ প্রচারের সময় একই রকম ঘটনা ঘটে এবং অনেক নাগরিকের কাছে তা বিরক্তকর মনে হয়েছে। যাহোক, এবার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো টেলিভিশনের মাধ্যমে তাদের ইশতেহার ও বক্তব্য জনগণের সামনে হাজির করতে পেরেছে।

নির্বাচনে টেলিভিশনের বিশেষ গুরুত্ব ও ভূমিকার কারণে সমন্বয় পরিষদ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি, সময় বন্টন, ভোটারদেরকে তাদের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য গৃহীত অনুষ্ঠানমালা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করেছে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৭৬টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মাত্র ১৮টি দল টেলিভিশনের মাধ্যমে জনগনের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার সুযোগ পায়। বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রত্যেককে ভাষণের সুযোগ দেয়া সম্ভব ছিল না। যখন ক্ষমতায় ছিল তখন জাতীয় পার্টি টেলিভিশন পুরোপুরি দখল করে রেখেছিল। সেখানে অন্য কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। এবারের নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে টেলিভিশনের পর্দা থেকে পুরোপুরি দূরে রাখা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন জাতীয় পার্টিকে নির্বাচন করার সুযোগ দিলেও টেলিভিশনে তাদের সুযোগ দেয়নি। বস্তুতঃ গ্রেফতার ও জনরোষ এড়াবার জন্য জাতীয় পার্টির অনেক নেতা পলাতক থেকে নির্বাচন করেছেন।[১৪]

স্বাধীন অবস্থানে থেকে কর্তৃপক্ষ নানারকম অনুষ্ঠানসূচী তৈরী করতে পেরেছিলেন, আর সে কারণে বিগত নির্বাচনগুলোতে যেসব অনুষ্ঠান ছিল না (বিশেষ নাটক, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি) এবার

[১৪] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের ওপর একটি পর্যবেক্ষনমূলক বিশেণ্ডষণ,ঢাকা, ২০১০।

টেলিভিশনের পর্দায় সেগুলো দেখা গেছে। নির্বাচন–সংশ্লিষ্ট বিশেষ অনুষ্ঠান ভোটারদেরকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

সারণি ৪.২ এ ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা মার্চ পর্যন্ত নির্বাচনের ওপর অনুষ্ঠানমালার জন্য সময় বন্টন দেখানো হয়েছে। এ সময় বেছে নেয়ার কারণ ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে রাজনৈতিক দলগুলো টেলিভিশনের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য জনসমক্ষে তুলে ধরার সুযোগ পায়।

mviwY 4.2 G 9 †deæqvwi †_‡K 1jv gvP chšÍ †gvU m¤úPvi N›Uvi AbôvbwfwËK mgq e›Ub

অনুষ্ঠানসূচি	স্থায়িত্ব			মোট সম্প্রচার ঘন্টার শতকরা ভাগ
	ঘন্টা	মিনিট	সেকেন্ডে	
মোট সম্প্রচার ঘন্টা	১৮২	১১	০৮	১০০%
নির্বাচনের ওপর অনুষ্ঠানমালা	১৯	৪৯	৩৩	১০.৮৮%
নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা	১৪	০১	৪০	০৭.৭০%
নিয়মিত অনুষ্ঠানমালা	১১৯	৫৮	৫৪	৬৫.৮৬%
সংবাদ	২৮	২১	০১	১৫.৫৬%

mviwY 4.3 wbevP‡bi Ici Abôvbgvjvi mgq e›Ub

অনুষ্ঠানসূচী	স্থায়িত্ব			নির্বাচনের ওপর অনুষ্ঠানমালার জন্য বন্টিত সময়ের শতকরা ভাগ
	ঘন্টা	মিনিট	সেকেন্ড	
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের ভাষণ	০৯	৫৫	৪৫	৫০.০৮%
নির্বাচনের ওপর প্রমাণ্য চিত্র	০২	৫৭	৩০	১৪.৯২%
নির্বাচনের ওপর নাটিকা	০১	২১	০০	০৬.৮১%
নির্বাচনবিধি, আইন, আকর্ষণীয় শ্লোগান, নির্বাচন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ঘোষণা	০১	৩৭	৫৩	০৮.২৩%
নির্বাচনের ওপর শ্লোগান, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি	০২	১২	১০	১১.১১%
নির্বাচনের ওপর আলোচনা–সংলাপ	০১	৪৫	১৫	০৮.৮৫%

mviwY 4.2 Ges 4.3 G wbevP‡bi Ici mgq e›U‡bi GKwU cwi®‹vi wPÎ cvIqv hvq|

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো টিভিতে ভাষণ দেয়ার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ৪৫ মিনিট। একমাত্র আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ৫ মিনিট বক্তৃতা দেন। অন্যান্য সব রাজনৈতিক দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। সবচেয়ে কম সময় নেয় ন্যাপ (মোজাফফর)-মাত্র ১৫ মিনিট।

মোট প্রচার সময়ের ১০.৮৮% ভাগ (মোট ১৯ ঘন্টা ৪৯ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড) সময় নির্বাচনের ওপর অনুষ্ঠানমালাকে দেয়া হয়। সংবাদ প্রচার এবং নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা টিভির নিয়ম মাফিক কাজ বলে ঐ সময়কে নির্বাচনের অনুষ্ঠানমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ এবার কিছু পর্যবেক্ষক দলকে (দেশি ও বিদেশী) টিভিতে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলেন তাদের বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে। সমন্বয় পরিষদ টেলিভিশনে তার কর্ম-

কৌশল ও ভোট কেন্দ্রে কিভাবে কারচুপি নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব তা ব্যাখ্যা করার সুযোগ পায়। ৩রা ফেব্রুয়ারিতে প্রচারিত 'সংলাপ' অনুষ্ঠানে চারজন আলোচকের মধ্যে ছিলেন সমন্বয় পরিষদের পরিচালক।

যাহোক, সমন্বয় পরিষদের মূল্যায়ন হলো বাংলাদেশ টেলিভিশন স্বাধীনভাবে নির্বাচনের ওপর নানা ধরণের অনুষ্ঠান তৈরী করেছে ও সম্প্রচার করেছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

†fvU‡K›‘ Ges Ab¨vb¨ Av‡qvRb

ভোটকেন্দ্র ও অন্যান্য আয়োজনের ক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্র কোথায় নির্মিত হলো এবং ভোটকেন্দ্রে কী সব ঘটনা ঘটে তা দেখা অত্যন্ত জরুরি । কেননা নির্বাচনের সময় খবরের কাগজে ভোটকেন্দ্র এবং অন্যান্য আয়োজন সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়। রিপোর্টের আলোকে ভোটকেন্দ্রে যে সব অনিয়ম ঘটে তার কিছু উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) ভোটারদের দুর্বল অংশকে শক্তিশালী অংশের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া।

খ) প্রভাবশালীদের এলাকায় দুর্বলদের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপন ।

গ) নির্ধারিত দূরত্বের বাইরে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ।

ঘ) ভোটকেন্দ্রে যেতে প্রাকৃতিক বাঁধা।

ঙ) ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন।

চ) সড়ক থেকে অনেক দূরে ঘিঞ্জি বা অযোগ্য ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন।

ছ) একই ভবনে অনেকগুলো ভোটকেন্দ্র স্থাপন

জ) শেষ মুহূর্তে ভোটকেন্দ্রের পরিবর্তন

ঝ) কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের কাছে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

নির্বাচন ব্যয় এবং নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘন বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত যে, নির্বাচনের সময় বিপুল অংকের কালো টাকার ব্যবহার ঘটে। নির্বাচনের দিন ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য মাস্তান ভাড়া, ভোটার বা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ব্যাপকভাবে ঘুষ দেয়ার জন্য সাধারণত প্রার্থীরা এই টাকা ব্যবহার করেন।

wbevPbx-cPvi Yv

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা বাংলার মানুষ নির্বাচনী-প্রচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। মুখরিত হয়ে ওঠে ঢাকা শহর। এর প্রধান সড়কগুলো ছাড়াও অলিতে গলিতে তৈরি করা হয় অগণিত নির্বাচনী ক্যাম্প, রাস্তার মোড়ে মোড়ে তৈরি হয় নানা রঙয়ের গেট, প্রার্থীদের প্রতিকৃতি-ব্যানার, প্রচার-মিছিল, দেয়ালে দেয়ালে চিকা, পোস্টার আরো কত কী।

বড় বড় শহরগুলোতে অসংখ্য ছাউনি গড়ে উঠে। এতে শহরগুলো আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে খোলা জায়গা যায় কমে কিন্তু এই ছাউনিগুলোর গুরুত্ব অনেক। নির্বাচনী স্রোতের সঙ্গে এরা এসেছে- এগুলোকে বলা হচ্ছে নির্বাচনী ক্যাম্প। সারা শহরে এখন রঙ-বেরঙের নির্বাচনী-ক্যাম্প। রাস্তার দুপাশে বাঁশ আর চাটাই দিয়ে তৈরি করা হয় এই ক্যাম্পগুলো। সারা শরীর মোড়ানো থাকে নানা রঙয়ের পোস্টারে। কতগুলোর

মাথায় ঝুলানো রয়েছে ব্যানার। ব্যানার বা পোস্টারের বেশিরভাগ স্থান দখল করে আছে নৌকা বা ধানের শীষের পোস্টার। এদের সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা করছে দাঁড়িপাল্লা।[১৫]

ক্যাম্পগুলোর চেহারা কমবেশি প্রায় একই রকম। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মীদের উপস্থিতি কম থাকে। রাত ৮/৯ টার দিকে প্রচন্ড ভিড়। তুমুল আলোচনা চলে নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে। সারাদেশে তখন নির্বাচনের জোরালো বাতাস। অফিস-আদালতে. হোটেল-রেস্তোরায়, শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জের সর্বত্র চায়ের আসর থেকে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার বিষয় নির্বাচন।

দেশের বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি জাতীয় পার্টি আর জামায়াত কর্মীরা নৌকা, ধানের শীষ, লাঙল, ও দাঁড়িপাল্লায় ভোটের জন্য মিছিলে নেমে পড়ে। গ্রামে-গঞ্জে প্রতিটি এলাকায় নির্বাচনী-প্রচারণা সরগরম।

পৌষের হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করেই দেয়ালে দেয়ালে ভোট প্রার্থনায় রাতের বেলা চিকা মারা শুরু হয়। নির্বাচনী সভা-সমাবেশ চলে পুরোদমে। বাড়ে সব কিছুর গতি। পুরুষ-মহিলা, যুবক-বৃদ্ধ, কৃষক-মজুর সব পেশার মানুষই এবার তাদের বৈধ ভোটাধিকার প্রয়োগের আশায় তৈরি। ভোটারদের আগ্রহ, বিশ্বাস, আর আস্থা দেখে মনে হয়েছে এবারকার নির্বাচনী লড়াই চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরপুর।

একটির গায়ে লেগে আছে আরেকটি নির্বাচনী ক্যাম্প। অথচ এরা চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। মজার ব্যাপার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও, এরা পাশাপাশি বাসিন্দা। এদের কেউ বাজাচ্ছে ক্যাসেটে নেতা-নেত্রীর ভাষণ, কেউ বা বাজাচ্ছে রবীন্দ্র সংগীত, কেউ দেশাত্মবোধক গান, বাজাচ্ছে আধুনিক বা পপ। কেউ খেলছে ক্যারাম আর কেউ বা করছে হৈ চৈ।

সারাদেশে বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের তোরণ। কোথাও নৌকা, কোথাও ধানের শীষ, দাঁড়িপাল্লা, লাঙল ইত্যাদি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনী-প্রচারণা, নির্বাচনী বাতাস-এর উত্তাপ-উত্তেজনা অজো পাড়াগাঁয়ের শিশু ছেলে-মেয়ে থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধের মুখে দেখা গেছে শ্লোগান, দেখা গেছে নির্বাচনী আনন্দ।

শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়েছে বাংলার আকাশ বাতাস। জনমনে বিপুল উৎসাহ। হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে নির্বাচনী হাওয়া জমজমাট। এমন কি নদী বা পুকুরঘাটে, গায়ের বধূদের মুখে তখন রসালো খবর, কে কোন দল করছে, কোন দল বিজয়ী হবে, কাকে ভোট দেবে, কোন নেতা বা কোন কর্মী কি কি বলছে ইত্যাদি। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সারা বাংলায় শ্লোগান আর শ্লোগান। বিভিন্ন দলের কিছু শ্লোগান নিম্নে দেয়া হলো :

মা-বোনদের বলে যাই, নৌকায় ভোট চাই ; মা-বোনদের বলে যাই ধানের শীষে ভোট চাই; গর্ব মোদের আলাদা, ফেনীর মেয়ে খালেদা; ভয় করি না বুলেট বোমা, আমরা সবাই মুজিবসেনা; জিয়া তুমি আছো মিশে সারা বাংলার ধানের শীষে; সত্য আসছে বাতিল কাঁপছে; প্রতিবাদ প্রতিরোধ জাসদ, বাসদ, আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই; বাংলার মাটি বিএনপি'র ঘাঁটি; No East No West BNP is the best; টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া সবাই বলে খালেদা জিয়া, পেট ভরে ভাত খাবো, ধানের শীষে ভোট দেবো, গণতন্ত্রের শপথ নিন; ধানের শীষে ভোট দিন, এক মুজিবের রক্ত থেকে লক্ষ

[১৫] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

মুজিব জন্ম নেবে, বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয়, আমিই মুজিব, জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, নৌকায় দিলে ভোট ভবিষ্যতে হবে সুখ; লা-ইলাহা ইল্লালাহ্ নৌকার মালিক তুই আল্লাহ; লা-ইলা ইল্লালাহ ধানের শীষে বিসমিল্লাহ; ইত্যাদি শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত ছিলো বাংলার সকল জনপদ।

তবে ভোটের দিনের চিত্রটা ছিল ভিন্ন । আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেদিন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে এবং মনে হচ্ছিল যে , সব কিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। সাধারণভাবে এসব বাহিনীর সদস্যরা নিজেদের দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করেছে বলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়।[১৬]

wbevPbx cPviYv eÜ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ উপলক্ষে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ দিবাগত রাত ১২.০১ মিনিট থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ বুধবার মধ্যরাত পর্যন্ত সকল প্রকার জনসভা, মিছিল ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ৭৮(১) ধারার বিধান অনুসারে উপর্যুক্ত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোন প্রকার জনসভা আহবান, অনুষ্ঠানে কিংবা কোনো শোভাযাত্রা বা মিছিলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী ব্যক্তি ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-এর ৭৮(২) ধারার বিধান অনুসারে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ সাত এবং নূন্যতম দু'বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন।[১৭]

4.5 wbevPb cieZx mg‡q MYgva¨‡gi fwgKv

অসাধারণ এক প্রেক্ষাপটে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ অনুষ্ঠিত হয় দেশের পঞ্চম সংসদ নির্বাচন। সরকারি দলবিহীন জাতীয় নির্বাচন এটিই প্রথম। সারাদেশে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করা হয়। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১। মুন্সীগঞ্জ ৩ ও কুষ্টিয়া ২ আসনে দু জন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী এই দুটি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয় যথাক্রমে ১৪মার্চ ও ২৮ মার্চ ১৯৯১।[১৮]

স্বৈরাচারবিরোধী তীব্র আন্দোলনের ধারায় জোটের ঘোষিত যুক্ত ঘোষণা, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগ এবং যুক্ত ঘোষণা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হয় এই জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সারাদেশে ২৯৮টি আসনে ৭৬ দলের ২,৭৭৪ জন প্রার্থী প্রতিযোগিতা করেন। নির্বাচন কমিশন ৯০টি দলকে প্রতীক বরাদ্দ করেন। নির্বাচনে ৩, ৮৩৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এর মধ্যে ৫৬ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হয়। বৈধ মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা ছিলো ৩,৭৮২। তবে নানা কারণে ১,০৩৯ জন প্রার্থিতা-পদ প্রত্যাহার করে নেন। এছাড়া অনেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নানা কারণে সরে দাঁড়ান। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে উক্ত খবরগুলো ছাড়াও দৈনিক পত্রিকায় নির্বাচনে প্রার্থীতা সম্পর্কিত আরো অনেক খবর ছাপা হয়।

---

[১৬] তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫, পৃ.৩০-৩১।

[১৭] The Bangladesh Observer, 25 February, 1991

[১৮] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

wbevPb Kwgkb mwPevjq †_‡K cvß msev‡` Rvbv hvq `jMZfv‡e cv_x‡`i msL¨v wbgi¡ct

mviwY : 4.4

`jmgn	cv_x msL¨v
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২৯৮
জাতীয় পার্টি	২৭০
আওয়ামী লীগ	২৬২
জাকের পার্টি	২৪৯
জামায়াতে ইসলাম	২২০
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	১৬১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু)	৬৭
বাকশাল	৬৭
ফ্রীডম পার্টি	৬৪
মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২
ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯
বাংলাদেশ জনতা দল	৫০
সি. পি. বি.	৪৭
খেলাফত আন্দোলন	৪৩
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	৩১
ন্যাপ (মোজাফফর)	৩১
ন্যাপ (ভাসানী)	৩০
ইউ. সি. এল.	২৬
এন. ডি. পি.	২০
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১৭
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬
জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	১৫
ইসলামী ফ্রন্ট	১৩
বাসদ (খালেকুজ্জামান)	১৩
জাতীয় জনতা পার্টি ও ঐক্যজোট	১১
স্বতন্ত্র প্রার্থী ও অন্যান্য দল	৫৯৭
মোট =	২,৭৭৪ জন

উৎস : নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয়, যা দৈনিক পত্রিকাগুলোতে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৮টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিলো ৬,১৮,৫৪,৩৫০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩,২৮,৪৬,৮৯২ এবং মহিলা ভোটার ২,৯০,৭,৪৫৮ জন। সারাদেশে

ভোটকেন্দ্র ছিলো ২৩,৯৬২টি, এর মধ্যে ভোট কক্ষ ছিলো ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬১৬টি। ভোটগ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য ৩১ জন সচিব ও অতিরিক্ত সচিবকে বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করার জন্য প্রায় চার লক্ষ কর্মী নিয়োগ করা হয়। ৩ লক্ষ ৮৩ হাজারের বেশি সেনা ও নৌবাহিনী, বি. জি. বি, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়। এই নির্বাচনে সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।[১৯]

‡fvUvi‡‘i fxwZ c‘kb

নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে যত অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয় তার মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে ভোটারকে আতঙ্কিত করা। এ বিষয়ে প্রিন্ট মিডিয়ায় কিছু নিউজ ছাপা হয়। যেমন :

বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে ভোট না দিলে তবে ভোটারদের ব্যবসা বা পেশার ক্ষতি করার হুমকি দেয়া হয়। এলাকা বিশেষে নির্বাচনের দিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে না দেয়ার খবর পাওয়া যায়। তাছাড়া অতীতের অনেক নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক ভোটারকে জোর করে ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়ারও উদাহরণ আছে। যা তখনকার পত্র-পত্রিকায় নিউজ হয়।[২০]

cÂg RvZxq msm‘ wbe©vP‡b RbM‡Yi AskMnY

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথম থেকেই সকল প্রকার সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বন করে। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ছিলেন এ নির্বাচনের প্রধান ব্যক্তি। ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে যাবার ক্ষেত্রে জাতির জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। রাষ্ট্রপতি বলেন, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।[২১] কেননা এ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতি ফিরে পাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং দেশপ্রেম। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ১৯৯১ সালের ২৭ ফ্রেব্রুয়ারি। নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর হতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সাথে তারা নিজ দল ও জোটের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে।[২২]

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময় সীমার মধ্যে বিভিন্ন দল ও জোট তাদের প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ৩০০ টি আসনের জন্য ৪২৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ৭৫টি রাজনৈতিক দলের মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৭৮৭ জন। মোট ৩৮৩৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেয়। বাছাইয়ে ৫৬টি বাতিল হয়, এবং বাতিলের বিরুদ্ধে ৩২টি আপীলের মধ্যে ৩১ টি গৃহীত হয়। রাজনৈতিক জোটভুক্তি, সমঝোতাসহ বিভিন্ন কারণে ১,০৩৯ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন এবং এরপরও মৌখিক ঘোষণায় বেশ কিছু প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাড়ান যদিও ভোটপত্রে তাদের নাম রয়ে যায়।[২৩]

---

[১৯] দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ মার্চ, ১৯৯১, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

[২০] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

[২১] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯১

[২২] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

[২৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ মার্চ, ১৯৯১

শুধু ৪০ টি দলের প্রার্থী ও তাদের প্রতীক দেখানো হয়েছে। ১ থেকে ৫ জন পর্যন্ত যাদের প্রার্থী ছিল তাদের দল উল্লেখ করা হয়নি। একমাত্র বিএনপি ৩০০ টি আসনের মনোনয়ন দান করেন। আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৬৪টি এবং ৩৬ টি আসনে আট দলীয় জোটের শরীক দলগুলোকে ছেড়ে দিয়ে তাদের নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান জানান। জাতীয় পার্টি ২৭০ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জামায়াতে ইসলামী ২২১টি আসনে এবং জাকের পার্টি ২৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৬ টি রাজনৈতিক দল ১জন করে প্রার্থী মনোয়ন দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।[২৪] এ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের অপর একটি বিশেষ দিক হল এতে পুরুষ প্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সর্বমোট ৩৭ জন মহিলা এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। (বাংলাদেশ অবজারভার, ফেব্রুয়ারি ১৯, ১৯৯১)।[২৫] অধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি যদি গণতন্ত্রের মজবুত ভিত্তির সহায়ক হত তাহলে বাংলাদেশই সর্বাগ্রে থাকত। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক দল কোনভাবেই সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহায়ক নয়। তবে জাতীয় পর্যায়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেও এ সকল সামর্থবিহীন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব যে বিলীন হয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।[২৬]

পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ৩০০ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্যসহ ৩৩০ জন সদস্য নিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে । সংসদের মেয়াদকাল ছিল ৫ বছর। মোট সংসদ সদস্য ছিলেন ৩৩০ জন। কেননা ৩০ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল অর্থাৎ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এই নির্বাচনের খুটিনাটি যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবগত করা হয়, যা তারা মিডিয়ায় প্রকাশ করেন।[২৭]

GKbR‡i RvZxq msm‘ wbewPb †‘Lv‡bv n‡jvt

mviwY 4.5 : cÂg RvZxq msm‘ wbewPb - 1991

ক. মনোয়নপত্র দাখিল	১৩ জানুয়ারি ১৯৯১
খ. মনোয়নপত্র বাছাই	১৪ জানুয়ারি ১৯৯১
গ. মনোয়নপত্র ফেরত	২১ জানুয়ারি ১৯৯১
ঘ. নির্বাচনের তারিখ	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোয়নপত্র দাখিল করা হয় ১৩ জানুয়ারি ১৯৯১ সালে, বাছাই করা হয় ১৪ জানুয়ারি ১৯৯১ এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

সারণি ৪.৬ এ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ভোটার বিষয়ক তথ্য দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় মোট ভোটার ৬, ২০, ৮১,৭৯৩ জন। পুরুষ ভোটার ছিল ৩, ৩০, ৪০, ৭৫৭ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ২, ৯০, ৪১, ০৩৬ জন।

[২৪] The Bangladesh Observer, 5 March, 1991

[২৫] The Bangladesh Observer, 19, February, 1991

[২৬]The Bangladesh Observer, 9 March, 1991

[২৭] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ মার্চ, ১৯৯১

mviwY 4.6 : cÂg RvZxq msm‘ wbevP‡b †fvU welqK Z_¨

ক. মোট ভোটার	৬, ২০, ৮১,৭৯৩ জন
পুরুষ ভোটার	৩, ৩০, ৪০, ৭৫৭ জন
মহিলা ভোটার	২, ৯০, ৪১, ০৩৬ জন
খ. মোট দেয় ভোট	৩, ৪৪,৭৭, ৮০৩ জন (৫৫.৪৫%)
গ. মোট বৈধ ভোট	৩, ৪১, ০৩, ৭৭৭ (৫৪.৯৩%)
ঘ. পোলিং সেন্টার	২৪১৫৪

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব ঃ পুরুষ বনাম মহিলা সাংসদ

আলোচ্য অংশে পঞ্চম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (নারী ও পুরুষ) বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

mviwY 4.7 : cÂg RvZxq msm‡‘ cwZbwaZ

সাধারণ তথ্য	সর্বমোট আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সাংসদ	
		পুরুষ	মহিলা
মোট আসন	৩৩০	৩০০	৩০
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৩০		৩০
সাধারণ আসন	৩০০	৩০০	

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স নিয়ে সংসদ সদস্যদের জন্ম তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদ কোন সময়সীমায় জন্ম নেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সাংসদদের বয়সও বিবেচনায় আনা হয়েছিল। কেননা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে ব্যক্তির পরিপক্কতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা নির্ভর করে তার বয়সের ওপর।

Rb¨ ZwiL mxgvt পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুরুষ সাংসদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯০১ থেকে ১৯৭০। অপরদিকে মহিলা সাংসদের বয়সসীমা ছিল ১৯৩১ থেকে ১৯৬০। এতে দেখা যায় পঞ্চম সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক সাংসদ ৩১.৭৪% এর জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯২১-১৯৩০ এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক পুরুষ সাংসদের জন্ম হয়েছিল ১৯০১ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে মাত্র ১.০২%।

mviwY 4.8 : cÂg RvZxq msm‡‘ ciæl I bvix mvsm‘‡‘i eqmmxgv

Rb¨ ZwiL	ciæl %	gwnjv %
১৯০১-১৯১০	১.০২%	
১৯১১-১৯২০	২.০২%	
১৯২১-১৯৩০	৩১.৭৪%	
১৯৩১-১৯৪০	৩৫.১৫%	৩৪.২৯%
১৯৪১-১৯৫০	১৮.৭৭%	৪৮.৫৭%
১৯৫১-১৯৬০	৮.১৯%	১৭.১৪%
১৯৬১-১৯৭০	২.৭৩%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

১৯৩১-১৯৪০ কিন্তু মহিলা সাংসদের ক্ষেত্রে তা ১৯৪১-১৯৫০, পুরুষদের বেলায় ১৯০১-১৯১০ এর জন্মগ্রহণকারী প্রতিনিধিও ছিল কিন্তু মহিলা সাংসদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

mviwY 4.9 : cÂg RvZxq msm‡‘ ciæl I gwnjv mvsm‘‡‘i wbevPbKvjxb eqm

wbevPbKvjxb eqm	ciæl %	gwnjv %
২১-৩০	১.২৫%	
৩১-৪০	৫.২৫%	১৭.১৪%
৪১-৫০	১৫.৪৬%	৪৮.৫৭%
৫১-৬০	৩৫.৩৯%	৩৪.২৯%
৬১-৭০	৩৭.৭৬%	
৭১-৮০	৩.২৮%	
৮১-৯০	১.৬১%	
মোট	১০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

উপরোক্ত সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন বয়সসীমা ছিল ২১-৯০ বছর বয়স পর্যন্ত, যার মধ্যে সর্বাধিক সাংসদদের বয়স ৩৭.৭৬% ছিল ৬১-৭০ বছরের মধ্যে, যার পরেই ছিল ৫১-৬০ বছর (৩৫.৩৯%), ৪১-৫০ বছরের মধ্যে (১৫.৪৬%) অপরদিকে ৭১-৮০ বছর বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বাধিক ৪৮.৫৭% নারী সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়সসীমা ৪১-৫০ বছরের মধ্যে। লক্ষণীয় যে ৮১-৯০ বয়সসীমার পুরুষ সাংসদ ছিলেন কিন্তু নারী সাংসদদের ক্ষেত্রে তা নেই।

mviwY 4.10 : cÂg RvZxq msm‡‘ ciæl I gwnjv mvsm‘‡‘i Ges gwnjv mvsm‘‡‘i ivRbxwZi ce AwfÁZv t

ivRbxwZ‡Z †hvM‘vb	ciæl %	gwnjv %
স্বতন্ত্র	০.৭৬%	
কৃষক রাজনীতি	০.৭৬%	
শ্রমিক রাজনীতি	৮.৪০%	
সরাসরি মূল দল	৩৮.১৭%	৬৮.৫৭%
ছাত্র রাজনীতি	৫১.৯১%	৩১.৪৩%
মোট	১০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায়, পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে শতকরা ৩৮.১৭% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছে। ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল ৫১.৯১%। শ্রমিক রাজনীতি থেকে এসেছে ৮.৪০%, অন্যদিকে নারী সাংসদদের মধ্যে ৬৮.৫৭% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতি শুরু করেছেন। ছাত্ররাজনীতি থেকে এসেছেন ৩১.৪৩%।

mviwY 4.11 :cÂg RvZxq msm‡‘ mvsm‘‡‘i ivRbxwZ ïiæi eqm

ivRbxwZ‡Z †hvM‘vb	ciæl %	gwnjv %
১৫ এর নীচে	৬.০৬%	৫.৭১%
১৫-২৪	২৭.৮৮%	৩৭.১৪%
২৫-৩৪	৩২.১২%	২৮.৫৭%
৩৫-৪৪	১৬.৯৭%	১৭.১৪%
৪৫-৫৪	১০.৯১%	১১.৪৩%
৫৫-৬৪	৪.৫৫%	
৬৫-৭৪	১.৫২%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩২.১২%) এর রাজনীতি শুরু করার বয়সসীমা হচ্ছে ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে (১-২) বছর (২৭.৮৮%)

অপরদিকে ৬.১৬% পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৫ বছরের নীচে। ১৬.৯৭% এবং ১০.৯১% রাজনীতি শুরু করেছেন যথাক্রমে ৩৫-৪৪ এবং ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ৫৫ বছরের পরে রাজনীতি শুরু করেছেন ৬.০৭%। অপরদিকে দেখা যায় যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের রাজনীতিতে যোগদানে বয়সসীমা একটু বেশী। অধিকাংশ মহিলা সাংসদ (৩৭.১৪%) রাজনীতি শুরু করেছিলেন ১-২ বছরের মধ্যে। এর পর ২-৩ বছর বয়সসীমার মধ্যে ২৮.৫৭% মহিলা সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছিলেন।

cÂg RvZxq mvsm‘‡‘i ivRbxwZ ïiæi mb

পঞ্চম জাতীয় সংসদে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ (২৬.৫৬%) পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-৭০ সনের মধ্যে। ২৩.৪৪% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৮১-১৯৯০ সালে। ২২.৯২% রাজনীতিতে যোগদান করেছেন ১৯৫১-৬০ সালের মধ্যে।

mviwY 4.12 : cÂg RvZxq msm‡‘ ciæl I gwnjv mvsm‘‡‘i ivRbxwZ‡Z †hvM‘v‡bi mb

ivRbxwZ‡Z †hvM‘vb mb mxgv	ciæl%	gwnjv%
১৯৪১-১৯৫০	৩.১৩%	
১৯৫১-১৯৬০	৭.৮১%	১৪.২৯%
১৯৬১-১৯৭০	২৬.৫৬%	৩৪.২৯%
১৯৭১-১৯৮০	২২.৯২%	৩১.৪৩%
১৯৮১-১৯৯০	২৩.৪৪%	৮.৫৭%
১৯৯১	১৬.১৫%	১১.৪৩%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায়, নারী সাংসদদের বেলায় সর্বাধিক (৩৪.২৯%) রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৬১-৭০ সালে, ৩১.৪৩% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৭১-১৯৮০ সালের মধ্যে এবং ১৪.২৯% রাজনীতি শুরু করেছেন ১৯৫১-১৯৬০ সালের মধ্যে।

cÂg RvZxq msm‘ wbewP‡bi KZw‘b c‡e ivRbxwZ‡Z †hvM‘vb

সারণি ৪.১৩ : এ তুলনামূলক বিশ্লেষণে পুরুষ সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা সর্বোচ্চ সংখ্যক ২০.৭২% নির্বাচনের ১ বছর পূর্বে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, তারপরেই ১৮.৪২% যোগ দিয়েছে ১-১৫ বছর পূর্বে। ২১-২৫ বছর পূর্বেই রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে ১৫.৩২%।

mviwY 4.13 : cÂg RvZxq msm‡‘ ciæl I gwnjv wbewP‡bi KZw‘b c‡e ivRbxwZ‡Z †hvM‘vb K‡i‡Q

নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে	পুরুষ %	মহিলা %
০-১	২০.৭২%	১৪.২৯%
২-৫	৭.১৮%	
৬-১০	১১.৬৯%	৫.৭১%
১১-১৫	১৮.৮২%	২৮.৫৭%
১৬-২০	৪.৫০%	২.৮৬%
২১-২৫	১৫.৩২%	২০.০০%
২৬-৩০	১১.২৪%	১৪.২৯%
৩১-৩৫	৪.২১%	১১.৪৩%
৩৬-৪০	২.১২%	২.৮৬
৪১-৪৫	১.২০%	

মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে হাতেখড়ি, নির্বাচনের কতদিন পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছে, উপরোক্ত সারণিতে লক্ষণীয় যে, মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বাধিক ২৮.৫৭% নির্বাচনের ১১-১৫ পূর্বে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। এতে বোঝা যায় সুবিধাবাদী রাজনীতির জন্যই মহিলা সাংসদদের সংসদে নেয়া হয়েছে।

cÂg RvZxq msm‡‘ mvsm‘‡‘ i wkÿvMZ †hvM¨Zv I wkÿv mgwßKvj

সারণি ৪.১৪ এ পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

mviwY 4.14 : cÂg RvZxq msm‘‡‘ ciæl I gwnjv mvsm‘‡‘ i wkÿvMZ †hvM¨Zv

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা %
অন্যান্য	১.৬৪%	
আইন	১৯.০২%	
আইএ	১১.৮০%	২০.০০%
নন ম্যাট্রিক	৪.৯২%	
ইঞ্জিনিয়ার	০.৬৬%	
ব্যারিষ্টার	১.৩১%	
ম্যাট্রিক	৫.২৫%	৫.৭১%
এমবিবি এস	১.৬৪%	
মাদ্রাসা	১.৩১%	
মাস্টার্স	২০.০০%	৩৭.১৪%
স্নাতক	২৯.১৮%	৩৭.১৪%
পিএইচডি	১.৯৭%	
সিএ	১.৩১%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের বেলায় দেখা যায়, সর্বোচ্চ ২৯.১৮% স্নাতক ডিগ্রিধারী। তারপর মার্ষ্টাস ডিগ্রীধারী ২০.০০% তারপরেই রয়েছে আইন ১৯.২০%। এখানে পিএইচডি ডিগ্রীধারী সাংসদদের সংখ্যা ১.৯৭%, এদের মধ্যে অন্যান্য বিবিধ শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৭.১৪% মহিলা সাংসদ স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রীধারী। তারপরেই রয়েছে আইএ ২০%।

cÂg RvZxq msm‡‘ i gwnjv mvsm‘‡‘ i mvgwRK cwiwPwZ

প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচিতি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক পরিচিতি বিদ্যমান থাকে। সারণি ৪.১৫ এ পঞ্চম জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরা হলো। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসদ ছিলেন রাজনীতিক (৫২.৭৮%), দ্বিতীয়

সর্বাধিক মহিলা সাংসদ ছিলেন শিক্ষাবিদ (১৯.৪৪%), এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ৮.৩৩% মহিলা ছিলেন গৃহিণী।[২৮]

mviwY 4.15 cÂg msm‡' ciæl I gwnjv mvsm‡'i mvgwRK cwiwPwZ

সামাজিক পরিচিতি	পুরুষ %	মহিলা%
আইনজীবি	২০.৩৩%	
ইঞ্জিনিয়ার	০.৬৬%	
ব্যবসায়ী	২২.১৩%	২.৭৮%
রাজনীতিক	২৫.৬৬%	৫২.৭৮%
সমাজসেবী	৪.৪৩%	১৬.৬৭%
শিক্ষাবিদ	৮.০৮%	১৯.৪৪%
শিল্পপতি	১০.১১%	
ডাক্তার	১.৬৪%	
অন্যান্য	৬.৯৭%	
গৃহিনী		৮.৩৩%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন শেষ হলেও সাংবাদিকগণ ভোট গণনা, ভোট জালিয়াতি, আনন্দ মিছিল ইত্যাদির ওপর রিপোর্ট করেন।

যারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন তারা কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। আরও পরে তারা তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কমনওয়েলথ গ্রুপ যে সুলিখিত রিপোর্ট প্রকাশ করে তা বিশ্লেষণমূলক রিপোর্টের জন্য সহায়ক হয়। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী পরাজিত হন, তারাও সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। তাও সাংবাদিকরা তাদের নিজ নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[২৯]

নির্বাচনের সময় শেষ হওয়ার পরে ভোট গণনা শুরু হলে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গুরুত্ব বেড়ে যায়। সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও-টেলিভিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সব সময় প্রশ্ন দেখা দিলেও, নির্বাচনের ফলাফল দ্রুত পাবার জন্য জনগণকে ওই মাধ্যম দুটোর ওপর বরাবরই নির্ভর করতে দেখা গেছে। যদিও পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে বেসরকারি রেডিও-টিভি চ্যানেলগুলোর ওপর জনগণের নির্ভরশীলতা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। জনগনের এই নির্ভরশীলতার কথ মাথায় রেখে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ঘন্টায় ঘন্টায় বিশেষ বুলেটিন প্রচার করে। পাশাপাশি রেডিও-টেলিভিশনের উচিত নির্বাচনী সন্ত্রাস, অনিয়ম ও যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরা, উচিত সকল প্রার্থীই যাতে যথাযথ ট্রিটমেন্ট পান তা নিশ্চিত করা। নির্বাচনী বুলেটিনকে আরো আকর্ষনীয় করে তুলতে বিজয়ী, নিকটতম প্রার্থী বা অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত প্রার্থীর পরিচিতি বুলেটিনে তুলে ধরা যেতে পারে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বুলেটিনে পর্যাপ্ত দৃশ্যচিত্রও থাকা উচিত। ভোট

[২৮] ভূঁইয়া, এম সাইফুলণ্ডাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbe©vPb I MYZš¿ t †c¶vcU ev¯—e‡'kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৯৭।

[২৯] The Bangladesh Observer, 19 March, 1991

গণনা চলাকালীন রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সাক্ষাতকার সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত (বা তথাকথিত স্বায়ত্বশাসিত) রেডিও-টেলিভিশনে কর্মরত সাংবাদিকদের সরকারি নীতির বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ অত্যন্ত কম, বেসরকারি রেডিও-টেলিভিশনের সাংবাদিকদের ওপরও আছে নানামুখী চাপ। কিন্তু যেসব সাংবাদিক এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন, তারা চেষ্টা করলে তা করতে পারেন। তারা নির্বাচনী খবরাখবরের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেন। সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুসারে নির্বাচনের বিভিন্ন খবরাখবরের ট্রিটমেন্ট সংবাদ মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত-এ নীতিতে অটল থাকাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

wbevP‡bi djvdj

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে দেশের সকল জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্র পত্রিকা বিভিন্ন আঙ্গিকে খবর ছাপায় আবার এ ফলাফল নিয়ে অনেক পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছিল। নির্বাচনের পূর্বে এক জরিপে বলা হয়েছিল আওয়ামী লীগ জয়ী হবে, বিএনপি দ্বিতীয় অবস্থান পাবে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী এক জরিপকার্য চালান, জরিপে বলা হয় আওয়ামী লীগ ১৭৮ আসন পেয়ে জয়ী হবে এবং বিএনপি পাবে ৬৭ আসন।

নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী সর্বমোট ৭৫টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৬৪ টি দল কোনো আসন লাভ করতে সক্ষম হয়নি। বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত রাজনীতিক নির্বাচনে জয়যুক্ত হতে পারেনি। আওয়ামী লীগের সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান , মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন প্রমুখ নেতা নির্বাচনে হেরে যান। বিএনপি হতে সাইফুর রহমান যিনি জিয়ার কেবিনেট অর্থমন্ত্রী ছিলেন তিনিও জয়ী হতে পারেন নি। এ ছাড়া জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিজানুর রহমান চৌধুরি এবং এরশাদের শাসনামলে জাতীয় পার্টির সদস্য আবুল হাসানাত, জামায়াত ইসলামীর আমীর আব্বাস আলী খান, জনতা পাটির সভাপতি ওবায়দুর রহমান এবং মোজাফফর আহমেদ ন্যাপের সভাপতি তাঁরা সবাই পরাজয় বরণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জাতীয় সংসদের ৩০ টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য পরোক্ষ নির্বাচন বিএনপিকে অতিরিক্ত ২৮টি আসন প্রদান করে এবং জামায়াতে ইসলামী লাভ করে বাকী ২টি আসন । ফলে বিএনপির সর্বমোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৯ টি এবং জামায়াতে ইসলামীর হয় মোট ২০টি।

mviwY 4.16: 1991 mv‡ji msm‘ wbevP‡bi djvdj

‘j	‡gvU Avmb	cvß Avmb msL¨v	cvß Avmb msL¨v (kZKiv)	cvß †fvUvi msL¨v	cvß †fvUvi msL¨v (kZKiv)
বিএনপি	৩০০	১৪০	৪৬.৬৭	১,০৫,০৭,৫৪৯	৩০.৮১
আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	২৯.৩৩	১,০২,৫৯,৮৬৬	৩০,০৮
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৬৭	৪০,৬৩,৫৩৭	১১.৯২
জামায়াতে ইসলামী	২২২	২৮	৬.০০	৪১,৩৬,৬৬১	১২.১৩
বাকশাল	৬৮	৫	১.৬৭	৬,১৬,০১৪	১.৯১
সিপিবি	৪৯	৫	১.৬৭	৪,০৭,৫১৫	১.১৯
জেএসডি(সিরাজ)	৩১	১	০.৩৩	৮৪.২৭৬	০.২৫
ইসলামী ঐক্যজোট	৩৯	১	০.৩৩	২,৬৯,৪৩৪	০.৭৯
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	১	০৩৩	৬৩,৪৩৪	০.১৯
এনডিপি	২০	১	০.৩৩	১,২১,৯১৮	০.৩৬

গণতন্ত্রী দল	১৬	১	০.৩৩	১,৫২,৫৯২	০.৪৫
ন্যাপ	৩১	১	০.৩৩	২,৫৯,৯৭৮	০.৭৬
জাকের পার্টি	২৫১	০	০০	৪,১৭,৭৩৭	১.২২
জেএসডি (রব)	১৩১	০	০০	১,৬৯,৪৫১	০.৭৯
জেএসডি (ইনু)	৬৮	০	০০	১,৭১,০১১	০.৫০
ফ্রিডম পার্টি	৬৫	০	০০	৯০,৭৮১	০.২৭
এম.এল (কাদির)	৬২	০	০০	৩২,৬৯৩	০.১০
বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	০	০০	১,২০,৭২৯	০.৩৫
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৩	০	০০	৯৩,০৪৯	০.২৭
অন্যান্য দল	৪২৯	৩	১.০	৪,৬৮,১৮৩	১.৩৭
স্বতন্ত্র	৪২৪	০	০০	১৪,৯৭,৩৬৯	৪.৩৯
‡gvU	2,787	300	100	3,41,03,777	100

Source : Complited from A.S.M. Shamsul Arefeen, Bangladesh Nirbachan 1970-2001 (Election in Bangladesh 1970-2001) Bangladesh Research and Publications, Dhaka, 2003, *PP 40-41*.

mviwY 4.17 : 1991 mv‡ji msm‘ wbevP‡b cv_x‡‘i Ae¯vb

‘j	1g	2q	3q	4_	5g	6ô Ges Gi wb‡P	‡gvU
বিএনপি	১৪০	৫৭	৫১	৩৮	৭	৭	৩০০
আওয়ামী লীগ	৮৮	১৫১	৯১	৪	২	-	২৬৪
জাতীয় পার্টি	৩৫	২৮	৬২	৬৯	৪৩	৩৫	২৭২
জামায়াতে ইসলামী	১৮	৩১	৯৩	৪৮	১৯	১৩	২২২
বাকশাল	৫	৭	২	১	-	-	১৫
সিপিবি	৫	৩	১	-	-	-	৯
গণতন্ত্রী পার্টি	১	১	১	১	-	-	৪
ন্যাপ	১	৫	-	১	১	-	৮
ইসলামী ঐক্যজোট	১	১	৭	১০	১৫	২৫	৫৯
স্বতন্ত্র	৩	৭	৩৩	৪৫	৬৪	১৫২	৪২৪
অন্যান্য দল	৩	৯	৩১	৮২	১৪৫	৪৫৯	৭২৯
‡gvU	300	300	300	300	296	691	2,787

Source : Complited from A.S.M. Shamsul Arefeen, Bangladesh Nirbachan 1970-2001 (Election in Bangladesh 1970-2001) Bangladesh Research and Publications, Dhaka, 2003, *PP 40-41*.

১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, এ নির্বাচনে কোনো স্বতন্ত্র বা নির্দলীয় প্রার্থী জয় লাভ করতে পারেনি; সকল আসনেই দলীয় প্রার্থীরা জয় লাভ করে। ৯৩.৫৫% আসনে ৮৪.৯৪% ভোট পড়ে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী এ চারটি দলে। মূলত এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল প্রধান দু'দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে এবং এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল খুবই হাড্ডাহাড্ডি। বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের এমন কোনো প্রার্থী ছিল না যিনি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে জয়ী হয়েছেন। এজন্য এ নির্বাচন ছিল পুরোপুরি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। সুতরাং ১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের প্রকৃতি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থার এক মডেল।

4.6 wbevPb m¤ú‡K ivR‰bwZK ‘j, wewfb ch‡eÿK I cwZôv‡bi cwZwµqv

১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ, মুক্ত এবং নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ন নির্বাচন। জাতীয় এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকরা এ নির্বাচনকে উন্নয়নশীল দেশের

একটি মডেল হিসেবে উল্লেখ করেন। দেশের একটি জাতীয় দৈনিক *The Daily Bangladesh Observer*- এ নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ The much waited election to the jatiya Sangsad for transition to democracy was held through the country on Wednesday in an unprecedented peace baring some stray incidents at some place of the country . Polls observers and the voters in general said that the wednesday's election was the most peaceful, free and fair in the 20 year history of independent, Bangladesh... Since morning the voter large in numbers queued before the polling centers to exercise their right of franchise. Happness was marked among the voters in all these centers to as they were able to exercise their right to vote in a free and fair atmosphere . The voters moved freely around the polling centers with no sign of panic or fear. Member of the law enforcing agencies including Army, BDR, Police and Ansars stood I guard around the polling stations to prevent any untoward incident. Discipline was high among the voters in the centers.[30]

দেশের আরেকটি জনপ্রিয় দৈনিক, দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, "The Election held all over the country in an unprecedented pcsceful environment."[31] অনেক বিদেশী দৈনিক বাংলাদেশের নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়েছে। ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক দল, জাপানি পর্যবেক্ষক দল এবং সার্ক পর্যবেক্ষক দল নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে যান এবং নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হিসেবে মন্তব্য করেন। নির্বাচনে শেখ হাসিনা তাঁর ভোট প্রয়োগের পর তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, কেন্দ্রে ভোট প্রদানের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে।

নির্বাচনের পরিবেশ সম্পর্কে খালেদা জিয়াও অনুরূপ মন্তব্য করেন। ফলাফলের পর খালেদা জিয়াকে বিজয়ী দলের নেতা ঘোষণা করা হয় এবং খালেদা জিয়া ভোটারদের ধন্যবাদ জানান। কিন্তু শেখ হাসিনা নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের আহবান করেন। তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রে ভোটাররা তাদের ভোট স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি। অগণতান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করে ভোট প্রদানে বাধা দেয়া হয়েছে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল যখন শেখ হাসিনা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে অভিযোগ আনেন তখন তার দলের অনেকেই জনগণের রায় গ্রহণ করে এবং নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। প্রায় সব রাজনৈতিক দল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনের ফলাফলের রায় সাবলীলভাবে মেনে নেয়। শেখ হাসিনার অভিযোগ সত্ত্বেও নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

evsjv‡'‡k wbevPb ch‡eÿY

নির্বাচন পর্যবেক্ষন বাংলাদেশে এখন আর নতুন কোনো ধারণা নয়। আশির দশকের প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। সার্কভূক্ত দেশগুলোও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ দেখায়। ইউরোপ, জাপান, এবং কানাডার বিভিন্ন দলকে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি দৃশ্যপটে দেখা যেতে থাকে। দেশের বাইরের বা আন্তর্জাতিক

---

৩০ The Bangladesh Observer, February 28, 1991

৩১ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

পর্যবেক্ষকদের পাশাপাশি বাংলাদেশের কিছু কিছু পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকে।

cÂg RvZxq msm' wbevPb ch‡eÿY

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর দেশী-বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রধান দুটি সমন্বয়ক সংস্থা ছিল বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ) এবং বাংলাদেশ মুক্ত নির্বাচন আন্দোলন (বামনা)। বাংলাদেশ মুক্ত নির্বাচন আন্দোলন উন্নয়ন এনজিওগুলোর সমন্বয়ক সংস্থা এসোসিয়েশন ফর ডেভেলপলমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ (এডাব)-এর সক্রিয় সমর্থন লাভ করে। এছাড়া আরও কিছু ক্ষুদ্র দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। যেমন, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা এবং গণতান্ত্রিক উদ্যোগ। স্থানীয় কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন পর্যবেক্ষন করে এবং গণমাধ্যমে তাদের কাজকর্মের খবর ছাপা হয়।

বেশ কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও **১৯৯১** এর সাধারণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। এর মধ্যে এনডিআই, কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দল, ব্রিটিশ এবং জাপানী দল অন্যতম। এছাড়া বিদেশী দূতাবাসগুলোর কয়েকটি দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ নেয়। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সংখ্যা ছিল সব মিলে শ'খানেক। মূল পর্যবেক্ষনকারী দলগুলো এবং এনডিআই স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য কিছু প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন চলাকালে বিদেশী পর্যবেক্ষকরা সরকারি আতিথেয়তা এবং সহযোগিতা পেয়েছেন। সহকারী বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সব ধরণের সহযোগিতার নির্দেশ দেয়। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র দেয়া হয় এবং তাঁদের গাড়িতে স্টিকার লাগানো হয়। অন্যদিকে হাজার হাজার স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের সরকারি অনুমতি ছাড়াই নির্বাচন পর্যবেক্ষন করতে হয়। সরকারি মতে, নির্বাচনী আইনে পর্যবেক্ষণের কোনো বিধান নেই।

নির্বাচন কমিশন বিদেশী মিশন এবং কিছু ছোট ছোট সংগঠনকে পর্যবেক্ষণের অনুমতি দিয়ে পরিচিতিমূলক ২২টি কার্ড দিয়েছিল। বামাসপ, বামনা এবং ছোট ছোট কয়েকটি দল নিয়ে গঠিত জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির ৪৫০ জন পর্যবেক্ষককে কোনো কার্ড দেয়া হয়নি। তাদের বলা হয়েছিল, অফিসিয়াল অনুমতি ছাড়াই তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদকে ৫টি কার্ড দিতে চায় কিন্তু সমন্বয় পরিষদ তা নিতে অস্বীকৃতি জানায় । **১৯৯১** সালে সাধারণ নির্বাচনে সমন্বয়পরিষদ ৪,০০০ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে কোন সময় তারা হাজার হাজার পর্যবেক্ষক মাঠে নামাতে পারে। এমন প্রতিষ্ঠানকে মাত্র পাঁচটি কার্ড দেয়া ছিল অযৌক্তিক।

১৯৯১ সালে বামাসপ একটি স্বাধীন মতামত জরিপ পরিচালনা করে। এই মতামত জরিপের ফলাফল অনুসারে পর্যবেক্ষকদের দ্বারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অধিকতর কার্যকর ও ফলদায়ক । উত্তরদাতাদের অধিকাংশেরই মত ছিল নির্বাচন পর্যবেক্ষণের আইনগত স্বীকৃতি থাকা দরকার। অনেক দেশেই নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের আইনগত স্বীকৃতি আছে। এক্ষেত্রে ফিলিপাইনের নামফ্রেল উল্লেখযোগ্য।

4.7 1991 mv‡j i wbevPb I evsjv‡'‡ki MYZšvqY

একটি ব্যতিক্রমী পরিবেশে পঞ্চম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদের স্বৈরশাসনের সময় নির্বাচন প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল । প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদকে অন্তরীন করে জাতির সামনে একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় নির্দলীয় সরকারের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান।

পঞ্চম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। তিনজন বিচারপতি নিয়ে একটি নতুন নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পান। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়ের নির্ধারিত তারিখ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। নজিরবিহীন নির্বাচনী কারচুপির জন্য অভিযুক্ত জাতীয় পার্টিকেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৫টি আসনে নির্বাচিত হন।

১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট গৃহীত বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিযাত্রা শুরু হয়। ইতোপূর্বে অবশ্য ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এর পর দেশের সরকার পদ্ধতি কী হবে এ ব্যাপারে নানাবিধ গুঞ্জন উত্থিত হতে থাকে।

১৯৯০ সালের ১০ নভেম্বর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন আট দলীয়, সাত দলীয় এবং পাঁচ দলীয় জোটের পক্ষ হতে যৌথভাবে ভবিষ্যৎ সরকারের যে রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছিল তাতে সুস্পষ্টভাবে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু নির্বাচিত বিএনপি সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর লক্ষ্য করা যায় যে, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তনের বিষয়ে কিছুটা গড়িমসি করতে থাকে। এপ্রিল মাসের (১৯৯১) প্রথম সপ্তাহেও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করে যে, সরকার রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি বহাল রাখতে চাচ্ছে। কিন্তু তখনও বিএনপির পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় ১৪ এপ্রিল (১৯৯১) আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী সংক্রান্ত একটি বিল সংসদ সচিবালয়ে জমা দেন। বেসরকারি সদস্যদের বিল সংক্রান্ত যে কমিটি গঠিত হয় তার মাধ্যমে বিলটি সংসদে উথাপন করা হবে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। এ সংশোধনী এমনভাবে করা হয়, যাতে প্রায় বিতর্ক এড়িয়ে শুধু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি থেকে সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করা যায়। আর বিলটি পাস করানোর জন্য প্রয়োজন ২২১টি ভোট, যা বিরোধী দলগুলোর হাতে ছিল না। কাজেই এজন্যই তাদের বিএনপির মুখাপেক্ষী হতে হয়। কিন্তু বিএনপিতে বেগম খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্তই এক অর্থে চূড়ান্ত, দলের নির্বাহী কমিটি যে কোন জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব নেত্রীর ওপর ন্যাস্ত করেছিলেন। এদিকে বেগম জিয়া তাঁর দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে দেশে সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করেন।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের এই নির্বাচন ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ১৯৭৯ সালে জেনারেল (অব.) জিয়াউর রহমানের আমলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেনারেল (অব.) এরশাদের আমলে ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের নির্বাচন ছিল জালিয়াতি, কারচুপি ও ভোট ডাকাতির নির্বাচন। ১৯৮৮ সালের

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আ.স.ম আব্দুর রবের জাসদ এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কয়েকটি উপদল ছাড়া মুলত কোনো দলই অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের সব কটি রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এই সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউই প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতেন না এবং তাদের কার্যকলাপ কোনোভাবেই রাজনীতি ও নির্বাচনকে প্রভাবিত করেনি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ ও তাঁর সরকার নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ভাষ্যকর ও সাংবাদিকের মতে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এরূপ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নজির বিরল। বিদেশি সাংবাদিক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সাম্প্রতিকতম সময়ে এরূপ অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সচরাচর দেখা যায় না।

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবেন ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সন্ত্রাসবিহীন নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য। বাংলাদেশে এমন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অতীতে হয়েছে বলে কেউ দাবি করতে পারবে না। বিচারপতি শাহাবুদ্দীন এক ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের সময় যেমন তিনি অতি উৎসাহ দেখাননি, তেমনি এই পদে দীর্ঘদিন থাকতেও তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। এজন্য তিনি বারবার জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধন করে তাঁর পূর্বতন পদে (প্রধান বিচারপতির পদে) ফিরে যাওয়ার অনুকুল পরিবেশ তৈরির জন্য সমগ্র জাতির প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। ক্ষমতার প্রতি এই নিরাসক্ততা ও নির্লোভ তাঁকে আরো মহীয়ান করে তুলেছে। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ সমগ্র জাতিকে মুগ্ধ করেছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ তাঁকে স্মরণ রাখবেন চিরকাল অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে।

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন তাঁর কার্যকালে দু'ভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংবিধান অনুযায়ী তিনি ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। কেননা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দ্বাদশ সংশোধনী আইন কার্যকর হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সাল থেকে। এর ফলে ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। দায়িত্ব ন্যস্ত হয় নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ এবং তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে অবদান রেখে গেছেন বাংলাদেশের জনগণ তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে।[৩২]

4.9 Dcmsnvi

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এরশাদের নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসন ক্ষমতা পালাবদলের মাধ্যম হিসেবে সকল প্রকার নির্বাচন ছিল অগণতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হয়েছিল ধ্বংস। কিন্তু ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল গণতান্ত্রিক এবং এর মাধ্যমে জনগণ এরশাদের অগণতান্ত্রিক শাসনামলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সুতরাং পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ব্যবস্থায় জনগণের আত্মবিশ্বাস জড়িত ছিল এবং দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছিল এরশাদ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্যই। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন জনগণের সেই আশা এবং প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম

[৩২] তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫, পৃ.১১৫-১১৭।

হয়েছিল। এই প্রথমবারের মতো একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্বৈরাচারী অবসানের লক্ষ্যে সৃষ্ট তীব্র ও দুর্বার গণআন্দোলনে একটি সরকারের পতন ঘটলে সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিক্রমে একটি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব নির্ধারিত হয় দেশে একটি সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই প্রথমবারের মতো সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ভোটারগণ প্রথমবারের মতো তাঁদের ইচ্ছা ও মতাদর্শ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পান। অর্থাৎ তাঁদের সামনে অনেকগুলো বিকল্প কর্মসূচী ছিল যা পূর্বের অন্যান্য নির্বাচনে ছিল না। নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী , পুলিশ ও আনসার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে প্রকৃত অর্থেই সুযোগ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। সরকারি প্রচার মাধ্যম যথা রেডিও ও টেলিভিশন এবং দেশের অধিকাংশ খবরের কাগজগুলো নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অনন্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার পর **১৯৯১** সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম বাংলাদেশের জনগণ মুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবং নিজ নিজ ইচ্ছামত প্রার্থী নির্বাচন করে। এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ এবং নির্বাচনে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহন ছিল অর্থপূর্ণ সুতরাং পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক এবং দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এ নির্বাচনের ভূমিকা ছিল সূদুরপ্রসারী।

Z_¨mÎ I mnvqK MšcwÄ

১. ভূঁইয়া, এম সাইফুল্লাহ ও মোঃ ফয়সাল, “wbevPb I MYZš t †c ÿ vcU evsjv‡‘kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৯।
২. আহমদ, এমাজউদ্দীন, MYZ‡š wekvm: evsjv‡‘‡k MYZš, †gŠwj cKvkbx, XvKv, 2008, c.73|
৩. Akhter, Muhammad Yeahia, *Electoral Corruption in Bangladesh,* Ashgate Publication, Dhaka, 2001, p.209-210.
৪. Ali, Raisa, *Representative Democracy and concept of Free and Fair Election,* Deep & Deep Publications, New Delhi, 1996, p.20.
৫. দৈনিক যুগান্তর, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৬
৬. দৈনিক যুগান্তর, ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৬
৭. খান, মিজানুর রহমান, mswebvb I ZËvevqK miKvi weZK, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।
৮. ঠাকুর, আবদুল হান্নান, wbevPb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.১১১-১২৯।
৯. Hasanuzzaman, Al Masud, *Role of opposition in Bangladesh Politics,* UPL, Dhaka, 1998, p. 179.
১০. বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËvevqK miKvi I evsjv‡‘‡ki mvaviY wbevPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৯৮-১০৬।
১১. তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫, পৃ.২৩৮-২৪০।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩-১১৭। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৩. বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËvevqK miKvi I evsjv‡‘‡ki mvaviY wbevPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৯৮-৯৯।
১৪. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের ওপর একটি পর্যবেক্ষনমূলক বিশ্লেষণ, ঢাকা, ২০১০।
১৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
১৬. তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫, পৃ.৩০-৩১।
১৭. The Bangladesh Observer, 25 February, 1991
১৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
১৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ মার্চ, ১৯৯১, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২০. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
২১. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯১
২২. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
২৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ মার্চ, ১৯৯১
২৪. The Bangladesh Observer, 5 March, 1991
২৫. The Bangladesh Observer, 19, February, 1991
২৬. The Bangladesh Observer, 9 March, 1991
২৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ মার্চ, ১৯৯১
২৮. ভূঁইয়া, এম সাইফুল্লাহ ও মোঃ ফয়সাল, “wbevPb I MYZš t †c ÿ vcU evsjv‡‘kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪, অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৯৭।
২৯. The Bangladesh Observer, 19 March, 1991
৩০. The Bangladesh Observer, February 28, 1991
৩১. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
৩২. তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫, পৃ.১১৫-১১৭।

cÂg Aa¨vq

beg RvZxq msm‘ wbevPb-2008 I MYgva¨g

5.1 fwgKv

বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, আলোচিত এবং সমালোচিত। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর পরই ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নিজে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ এবং দশজন উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একই বছরের ২৭ নভেম্বর তফসিল ঘোষণা করে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন। কিন্তু পরবর্তীতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ১১ জানুয়ারি জর"রি অবস্থা জারির পর উক্ত নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। ইতোমধ্যে নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং প্রথমে ৯ জন উপদেষ্টা ও পরবর্তীতে আরও ১ জন পদত্যাগ করেন। ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ফখর"উদ্দিন আহমদকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। অবশেষে ফখর"দ্দিন আহমদের অধীনেই ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও মহাজোট বিপুল আসন লাভ করে এবং সরকার গঠন করে।

5.2 wbevP‡bi ‡c¶vcU I Iqvb B‡j‡fb cm½

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলের শেষ দিকে বিচারপতি কে.এম. হাসানকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং বিচারপতিদের বয়স বৃদ্ধি করার বিষয়টি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী দলই অভিযোগ উথাপন করে যে, বিচারপতি কে. এম. হাসান অতীতে বিএনপির রাজনীতিতে সরাসরি সংশিণ্টষ্ট ছিলেন এবং তাকে পরবর্তীতে প্রধান উপদেষ্টা করার পরিকল্পনা থেকেই বিচারপতিগণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বিচারপতি মোঃ আব্দুল আজিজের নিয়োগ নিয়েও আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলসমূহের জোরালো আপত্তি ছিল।[১]

ভোটার তালিকা প্রণয়নকে কেন্দ্র করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুল আজিজের কর্মকান্ড এবং কিছু কিছু উক্তি ও আচরণ বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এমনকি বুদ্ধিজীবি থেকে শুর" করে সাধারণ মানুষকেও বিক্ষুব্ধ করে তোলে । আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের প্রচন্ড আন্দোলনের ফলে প্রধান বিচারপতি কে. এম. হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এর পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। বেগম খালেদা জিয়া ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ড় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে বিদায় গ্রহণ করে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ২৯

[১] Malek, Dr. S. A.*Post one Eleven perspectives : stream of Thoughts*, News and views publications, Dhaka, 2009, p.26.

আক্টোবর শপথ গ্রহণ করেন।[২] ৩১ অক্টোবর তিনি ১০ জন উপদেষ্টার নাম ঘোষণা করেন এবং তাঁরা ঐ দিনই শপথ গ্রহণ করেন। এই উপদেষ্টাগণ হলেন-১ বিচারপতি ফজলুল হক; ২. ড.আকবর আলী খান ; ৩. লে. জে (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরি; ৪. সি. এম. সফি সামি; ৫. এম. আজিজুল হক; ৬. ধীরাজ কুমার নাথ; ৭. সুলতানা কামাল; ৮. মাহবুবুল আলম; ৯. সুফিয়া রহমান; ১০. ইয়াসমিন মুর্শেদ।[৩] প্রথম থেকেই প্রধান উপদেষ্টার সাথে অন্যান্য উপদেষ্টার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এর ফলে ২০০৬ সালের ১১ ডিসেম্বর নানা কারণে ক্ষুব্ধ ৪ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন । এরা হলেন-১. ড আকবর আলী খান, ২. সি.এম. সফি সামি. ৩. সুলতানা কামাল এবং লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরি । এই ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি পদত্যাগ করায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জনমনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৪]

সারাদেশে সেনা মোতায়েন করে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক করার চিন্তাও রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ এর মাথায় এসেছিল । তিনি ২০০৬ সালের ১২ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেনা মোতায়েনের নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে পরদিনই তিনি সে আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। ৯ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা আকস্মিকভাবে সারা দেশে সেনা মোতায়েনের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু এবারেও সবাইকে অবাক করে সেনাবাহিনী পুরোপুরি মাঠে নামার আগেই তাদেরকে বিশ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনী মোতায়েনের আদেশ এবং তা প্রত্যাহার কোনো বিষয়েই তিনি উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করেননি। ফলে উপদেষ্টাগণ দারুনভাবে মর্মাহত হন এবং ৪ জন উপদেষ্টা ১১ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট এ সময় নির্বাচন কমিশনার এম. এ. আজিজের পদত্যাগসহ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, ত্রুটিমুক্ত নতুন ভোটার তালিকাসহ বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবি সামনে রেখে রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। পরে তারা মহাজোট গঠন করে। কর্নেল অলি আহমেদ, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরি, ড. কামাল হোসেন, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রমুখ নেতাও দলবলসহ এই মহাজোটে যোগ দেন। এই মহাজোটের হরতাল, অবরোধ ও চাপের মুখে ২২ ডিসেম্বর , ২০০৬ প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম.এ. আজিজ ছুটিতে যান। ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার হন বিচারপতি মাহফুজুর রহমান। প্রথমবার তারিখ পেছানোর পর দ্বিতীয় দফা তফসীল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ভোটের তারিখ নির্ধারন করা হয় ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও মহাজোট এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। নির্বাচন কমিশন জাতীয় পার্টির নেতা এইচ.এম. এরশাদকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করলে মহাজোট ৩ জানুয়ারি নির্বাচন বর্জন করে এবং রাজপথের আন্দোলনে নেমে পড়ে।

মহাজোটের পক্ষে শেখ হাসিনা নির্বাচন বর্জন ঘোষণার পাশাপাশি ৭ ও ৮ জানুয়ারি অবরোধ ঘোষণা করে। ৩ জানুয়ারি হাওয়া ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূইয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, নির্দিষ্ট সময়েই নির্বাচন হতে হবে, বিকল্প কিছুই নেই। প্রধান নির্বাচন

[২] দৈনিক সংবাদ, ২৯ অক্টোবর, ২০০৬

[৩] দৈনিক সংবাদ, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬

[৪] দৈনিক প্রথম আলো, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৬

কমিশনার এবং প্রধান উপদেষ্টাও ২২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত প্রদান করেন। ৪ জানুয়ারি ঢাকার একটি পাঁচ তারা হোটেলে অনুষ্ঠিত মহাজোটের এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান ও মহাজোটের প্রধান শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা ও প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইয়াজউদ্দিন আহমেদ সরে না দাড়ালে বঙ্গভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচি দেয়া হবে।
৪ জানুয়ারি ব্রিটিশ হাইকমিশনার সরকারের বৈধতার জন্য নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। ঐদিন গাজীপুরে খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে দেশকে সাংবিধানিক সংকট থেকে রক্ষা করার জন্য নির্বাচন করতে হবে। ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শেখ হাসিনা বলেন যে, প্রহসনের নির্বাচন হবে দেখে মহাজোট নির্বাচন বর্জন বা প্রত্যাহার করেছে।[৫] এরপর ৬ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন হবে। ঐদিন এফবিসিসিআই দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার দাবি জানায়। সারাদেশে, বিশেষ করে ঢাকায় গণগ্রেপ্তার বৃদ্ধি পায়। দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থার মধ্যে দিয়েই ৭ জানুয়ারি মহাজোটের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ঢাকা প্রবেশের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। মূলত রাজধানী ঢাকা শহর সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি।[৬]
যখন মহাজোট নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হয় তখন দেশের মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং টিভি নিউজে বিশ্ববাসী এ সকল দৃশ্য অবলোকন করে। তারপর জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস বার্নস টেলিফোনে প্রধান উপদেষ্টাকে বলেন যে, সব দল যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, তা না হলে এটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। একথা প্রচারিত হলে আন্দোলনমুখী নেতা-কর্মী ও দেশের জনগণ আরও বেশী নির্বাচন বিরোধী হয়ে উঠে। ৯ জানুয়ারি বিদেশী কয়েকজন কূটনীতিক একতরফাভাবে নির্বাচন এড়াতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তারের অনুমতি দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনীকে। ৪ দলীয় জোট এবং মহাজোটের দুই নেত্রীর বক্তৃতা, বিবৃতি ও অপরাপর বক্তব্য সমগ্র দেশবাসিকে উদ্বেগে আকুল করে তোলে। দেশবাসী একটি গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠে । সারাদেশে বিরাজ করে থমথমে এবং শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। এরূপ অবস্থার মধ্যে জনগণের দাবি, বিরোধী মহাজোটের আন্দোলনের চাপ এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ১১ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টা ড.ইয়াজউদ্দিন আহমেদ সকাল ১০ টা থেকেই বঙ্গভবনে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বৈঠক শুরু করেন। সারাদিনব্যাপী এই মিটিং চলাকালীন বেলা ৩ টার সময় বঙ্গভবনে প্রবেশ করেন সশস্ত্র বাহিনীর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান। তাঁদের সাথে ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক। তারা ড.ইয়াজউদ্দিনের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এর পরের কথোপকথন শোনা যাক একজন লেখক তথা রাজনৈতিক বিশেণ্ডষকের লেখনি থেকে।[৭]

---

[৫] দৈনিক সংবাদ, ৯ জানুয়ারি, ২০০৭

[৬] দৈনিক প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি, ২০০৭

[৭] বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡`‡ki mvaviY wbe©vPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৬৩-৬৮।

> প্রথমে সেনাবাহিনী প্রধান দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নির্বাচন অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ড.ইয়াজউদ্দিন প্রথমে বিষয়টি গুরুত্ব দিতে চান নি। তাঁর বক্তব্য ছিল এমন যে, সবই তো ঠিক চলছে নির্বাচন হলে অসুবিধাটা কোথায়।

এমন পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধান টেলিফোনে নবম পদাতিক ডিভিশনের তৎকালীন জিওসিকে কিছু জরুরী নির্দেশনা দেন। এক পর্যায়ে ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নমনীয় হন। এ বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমি ভিতরে গিয়ে উনার সাথে একটু কথা বলে আসি । উপস্থিত সেনা কর্মকর্তারা এতে সাড়া দেননি। তাদের বক্তব্য রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই। এক পর্যায়ে সেনা কর্মকর্তাদের প্রস্তাবে অনেকটা বাধ্য হয়ে রাজি হন রাষ্ট্রপতি। তখন সই করার জন্য তাঁর হাতে ইস্তফার কাগজ তুলে দেন সেনা কর্মকর্তারা। একজন বললেন "কলম লাগবে স্যার"? -"না, আমার কাছে কলম আছে"একথা বলতেই ড.ইয়াজউদ্দিন পকেট থেকে কলম বের করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, দুই পদ থেকে ইস্তফা কিনা। জবাব আসে, শুধু প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে। তিনি কাগজে সই করেন। সর্বশেষ তাঁর হাতে দেয়া হয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য ভাষণের খসড়া।

বিকেল চারটার দিকে বঙ্গভবন থেকে বের হন তিন বাহিনীর প্রধান ও সেনাবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার। প্রায় ঐ সময়ে বঙ্গবভনে প্রবেশ করেন নবম পদাতিক ডিভিশনের কর্মকর্তা ও একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা । তারা যাওয়ার পর পাল্টে যায় বঙ্গভবনের চেনা পরিবেশ। তাদের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ টেলিভিশণের ক্যামেরাম্যানরা গিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ধারণ করেন। ততক্ষণে সারা দেশে বিষয়টি রটে যায়। স্বস্তি ফিরে আসে সাধারণ জনগণের মনে। অন্যদিকে নীতি নির্ধারকরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের খোঁজে। রাত ১১ টার দিকে দুই উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা যান নোবেল বিজয়ী ড. মোহাম্মদ ইউনুসের বাসায়। তিনি দায়িত্ব নিতে অপারগতা জানান। তারপর রাত ১২ টার দিকে তারা হাজির হন ড.ফখরুদ্দিন আহমদের বাসায়। তিনি সম্মত হন। আর এভাবে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি পটপরিবর্তনের ঘটনা ওয়ান/ইলেভেন (১/১১) নামে পরিচিতি লাভ করে সর্বমহলে।[৮]

5.3 beMwVZ ZËveavqK miKvi : beg msm' wbevPb-2008

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে প্রফেসর ড.ইয়াজউদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাড়ান। রাষ্ট্রপতি রাতে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ বাতিল ঘোষণা করেন। ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় সংবিধানের ৫৮ (গ) ধারা মোতাবেক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. ফখরুদ্দিন আহমদ শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারসমূহের বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা, আওয়ামী লীগ প্রধান তথা মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনাসহ অনেক রাজনৈতিক নেতা। তবে বিএনপি, জামায়াত, জোটের কোনো নেতা এই অনুষ্ঠানে যান নি। প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্থগিত করেন। ১৩ জানুয়ারি রাত ৮ টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে ৫ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন।

[৮] সাপ্তাহিক কাগজ, ১১ জানুয়ারি, ২০০৯

প্রধান উপদেষ্টা আরও উপদেষ্টা নিয়োগ করেন এবং তাদের মধ্যে ২ জন ১৬ জানুয়ারি শপথ গ্রহণ করেন।

mviwY 5.1 : W. dLi"wÏ‡bi ZËveavqK miKv‡ii Dc‡'óvMY

µ.	bvg	gš¿Yvjq
১	ড.ফখর"দ্দিন আহমদ	প্রধান উপদেষ্টা
২.	ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ভূমি ও তথ্য মন্ত্রণালয়
৩.	ড.এ.এম. মির্জা আজিজুল ইসলাম	অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
৪	মেজর জে. (অব.)এম. আব্দুল মতিন (বিপি)	যোগাযোগ মন্ত্রনালয়
৫	তপন চৌধুরি	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৬.	গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরি	শিল্প মন্ত্রনালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭	ড.আইয়ুব কাদরী	শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮.	মেজর জে. ডা. এ. এম. এস. মতিউর রহমান	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রনালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯.	আনোয়ার"ল ইকবাল	স্থানীয় সরকার, পলণ্টী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১০	ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১১	ড. চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম	কৃষি মন্ত্রনালয়

উৎস: দৈনিক সংবাদ ১৪ ও ১৭ জানুয়ারি, ২০০৭

বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আঃ আজিজকে ২১ জানুয়ারি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।[৯] ২৯ জানুয়ারি যাবতীয় নির্বাচন কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। কেননা ৪ দলীয় জোট সরকারের শাসনামলে এবং ড.ইয়াজউদ্দিন আহমেদের প্রধান উপদেষ্টা থাকাকালীন সময়ে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে অনেকের মনে ঘৃণা ও অনাস্থার সৃষ্টি হয়। ৪ ফেব্র"য়ারি ড.ফখর"দ্দিন আহমদের সরকার ১৬ জন সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও নেতাকে গ্রেপ্তার করে। ২৮ ফেব্র"য়ারি ৫০ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়। ৭ মার্চ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে গ্রেপ্তার এবং ৯মার্চ হাওয়া ভবনে তলণ্টাশী চালায়। ৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বির"দ্ধে চাঁদাবাজি মামলা এবং ২৩ এপ্রিল হুলিয়া জারি করে। ১৬ জুলাই শেখ হাসিনকে ভোরবেলা তাঁর সুধাসদনের বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ২ সেপ্টেম্বর বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শুর" করে। ১ নভেম্বর প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে আংশিক আলাদা করা হয়। ২৫ নভেম্বর সমগ্র প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা হয়। এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হয়। ২০০৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর পুরাকীর্তি

[৯] দৈনিক প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি, ২০০৭

চুরির ঘটনায় মন্ত্রী হিসেবে নৈতিক দায় স্বীকার করে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী পদত্যাগ করেন। ২০০৮ সালের ৮ জানুয়ারি ৪ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন এবং ঐদিন রাতেই আবার নতুন করে ৫ জন উপদেষ্টাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন । এঁরা হলেন সাবেক সচিব এ.এম. এম শওকত আলী, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ.এফ. হাসান আরিফ, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালক মেজর জে. (অব.) গোলাম কাদের, গণস্বাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরি এবং অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিলণ্ডুর রহমান। ৯ জানুয়ারি এই ৫ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন।

10 Rvbqwi cavb Dc‡'óv W. dLi"wÏb Avng' Dc‡'óv‡'i 'ßi e›Ub K‡ib

mviwY 5.2 t beMwVZ Dc‡'óv cwil' wbgi¦c t

µ.	bvg	gšYvjq
১	ড.ফখর˚দ্দিন আহমদ	প্রধান উপদেষ্টা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রনালয় এবং প্রধান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২.	ড.এ.এম. মির্জা আজিজুল ইসলাম	অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৩	মেজর জে. (অব.) এম. আব্দুল মতিন (বিপি)	স্বরাষ্ট্র, নৌ পরিবহন, ভূমি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪	ড.ইফতেখার আহমেদ চৌধুরি	পররাষ্ট্র, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়
৫	মোঃ আনোয়ার˚ল ইকবাল	স্থানীয় সরকার, পলণ্ডী উন্নয়ন ও সমবায় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬	ড.চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম	কৃষি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৭.	ড.এ.এম. এম শওকত আলী	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়
৮.	এ. এফ. হাসান আরিফ	আইন, বিচার ও সংসদ এবং ধর্ম মন্ত্রনালয়
৯	মেজর জেনারেল (অব) গোলাম কাদের	যোগাযোগ ও গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়
১০	রাশেদা কে চৌধুরি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১১	ড. হোসেন জিলণ্ডুর রহমান	শিক্ষা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

উৎসঃ দৈনিক সংবাদ ১১ জানুয়ারি, ২০০৮

mviwY 5.3 t GQvov I ZËveavqK miKvi 5 we‡kl mnKvix wb‡qvM †'b| Giv n‡jb-

µ.	bvg	msiwkó gšYvjq
১.	রাজা দেবাশীষ রায়	পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
২.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম.এ. মালেক	ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়
৩.	অধ্যাপক ম.তামিম	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগ মন্ত্রনালয়
৪.	মাহবুব জামিল	বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন শিল্প এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৫.	মানিক লাল সমাদ্দার	মৎস ও পশুসম্পদ, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

উৎসঃ দৈনিক সংবাদ ১১ জানুয়ারি, ২০০৮

২০০৮ সালের ১২ জানুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টা ড.ফখর"উদ্দিন আহমদ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকারের সংলাপের ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ঢাকার বাইরে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে।

জর"রি অবস্থার সময় যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ পরিচালনা করে তার মূল কাজগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে দেশকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনা । নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নিয়ে ২০০৭-এর ফেব্র"য়ারি মাসে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে ড. এটিএম শামসুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সংস্কারের পর তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অন্য যে দুই জন নিয়োগ পান তারা হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেন এবং মোহাম্মদ ছহুল হোসেন । নতুন নির্বাচন কমিশন অনতিবিলম্বে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কাজ শুর" করে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইনের সংস্কার এবং ছবিসহ জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের ঘোষণা দেয়। ছবিসহ জাতীয় পরিচয়পত্রই ভোটের সময় পরিচয়পত্র হিসেবে কাজ করবে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্বাচন কমিশন শেষ পর্যন্ড় ২০০৮ সালের ৯ জুলাই ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করে (যদিও নির্বাচন কমিশন ২২ জুলাই ভোটার তালিকা প্রণয়নের সমাপ্তি অনুষ্ঠান করে)। খসড়া ভোটার তালিকা অনুসারে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশে ভোটারের সংখ্যা ৮, ১১, ৩০, ৯৭৩ যা ২০০৭ এর ২২ জানুয়ারি যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল তার থেকে ১, ১৯, ৫১, ৫২৬ জন ভোটার কম।

নির্বাচন কমিশন ২০০৮ সালের ২৫ জানুয়ারি নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করে। এই রোডম্যাপ অনুসারে নির্বাচন হওয়ার কথা অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে। ২০০৮ এর ১২ মে প্রধান উপদেষ্টা ড.ফখর"দ্দিন আহমদ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এ বছর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত রোডম্যাপের সাথে প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণার বাস্ড়বায়ন হয় ডিসেম্বরে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।[১০]

5.4 wbevP‡bi ce-c¯wZ

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কাজ করেন। কেননা ওয়ান/ইলেভেন পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন ঐকমত্য ছিল না। সেজন্য নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপে বসে। ২৪ ফেব্র"য়ারি বিকল্পধারা, ওয়ার্কার্স পার্টি ও সাম্যবাদী দলের সাথে নির্বাচন কমিশন সংলাপে বসে। দলগুলো ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই নির্বাচন দাবি করে। ২৬ ফেব্র"য়ারি নিবার্চন কমিশনের সাথে সংলাপ হয় জাসদ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির। দলগুলো জামায়াতে ইসলামী এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিবন্ধন না দেয়ার জন্য এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার প্রস্ড়াব করে। ২৭ ফেব্র"য়ারি জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ও জাসদ (রব) এর সাথে নির্বাচন কমিশন সংলাপে বসে। ২৮ ফেব্র"য়ারি কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, ইসলামী ঐক্যজোট ও এলডিপির সাথে নির্বাচন

[১০] দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি, ২০০৭

কমিশন সংলাপে বসে। সব দলই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতাকারীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার দাবি জানায়।[১১]

১৮ মার্চ প্রধান উপদেষ্টা লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের সাথে বাংলাদেশ-গ্রেট ব্রিটেন দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থসংশিণ্টষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১ এপ্রিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য জাতিসংঘে সহায়তা চান। ৩ এপ্রিল ওয়ার ক্রাইমস কমিটি ১৫৯৭ জন যুদ্ধাপরাধীর তালিকা প্রকাশ করে। ৫ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা দেশের সকল জেলা প্রশাসকদের সাথে বৈঠক করে তাদেরকে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন। ১০ এপ্রিল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার করা একটি রিট মামলা হাইকোর্ট খারিজ করে দেন। বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির মনোনীত অস্থায়ী মহাসচিব মেজর (অব) হাফিজউদ্দিন আহমদকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানিয়ে নির্বাচন কমিশন যে চিঠি প্রেরণ করেছিল তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বেগম খালেদা জিয়া এই রিট আবেদন করেন।

১৩ এপ্রিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সাথে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় দফা সংলাপ হয়। এই সংলাপে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর মুক্তিসহ ৫টি লিখিত দাবি পেশ করেন। ১৫ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন বিএনপির হাফিজ ও দেলোয়ার দুই পক্ষকেই চিঠি দেয়। এতে দেলোয়ারপন্থিরা ক্ষুব্ধ হয়।

২৫ এপ্রিল বিএনপি'র সংস্কারপন্থী নেতা সাইফুর রহমান বলেন, বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে না গেলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। ২৮-৩০ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৩৩ আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করেন। ১২ মে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড.ফখর"দ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং ঘোষণা করেন, ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২০ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটে সিটি কর্পোরেশন এবং ৯টি পৌরসভার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২০০৮ সালের ৪ আগষ্ট। ২৯ শে জুন বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট নির্বাচনে যাওয়ার জন্য সরকারের নিকট ৫ দফা শর্ত প্রদান করে। ২৭ জুলাই বাংলাদেশ হাইকোর্ট একটি গুর"ত্বপূর্ন রায় ঘোষণা করে। এই রায়ে ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস পালন এবং সরকারি ছুটি বাতিল ঘোষণার যে আদেশ ২০০২ সালে তদানীন্ড়ন জোট সরকার প্রধান করেছিল তা অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট।

৪ আগষ্ট ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন মেয়রসহ ১৩টি মেয়র পদের ১২টিতেই আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়যুক্ত হয়। শুধু বগুড়ায় দুপচাচিয়ায় পৌরসভার মেয়রপদে বিএনপি তথা ৪ দলীয় জোট জয়যুক্ত হয়। ২৭ আগষ্ট রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কার্যক্রম শুর" হয়। ৩১ আগষ্ট হাইকোর্ট নির্বাচনী আচরণ বিধিমালার ০৮ বিধির ৩নং বিধি অবৈধ ঘোষণা করে বলে যে, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক দল অংশ নিতে পারবে।

[১১] দৈনিক সমকাল, ২১ এপ্রিল, ২০০৮

5.5 wbevP‡bi c‡e MYgva¨‡gi fwgKv

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণমাধ্যমের দায়-দায়িত্ব আরও বেড়ে গিয়েছিল। কারণ এই নির্বাচন নানা দিক থেকেই অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে অষ্টম সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই বছর অতিক্রান্ড় হলেও দেশে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। একই সাথে জর“রি আইন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার চালু রয়েছে দীর্ঘদিন থেকেই। তাছাড়া বর্তমান সরকার দুর্নীতিপরায়ন বেশকিছু প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ব্যবসায়ী এবং পেশাজীবিকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, যাদের অনেকেই গত সংসদে নির্বাচিত সদস্য ছিলেন । এছাড়া বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইন সংশোধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলসমূহের সংস্কার সাধনে ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ড় স্থাপন করেছে, যা বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলো করতে পারেনি।[১২]

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সংস্কারকর্মে এতটাই জড়িয়ে পরেছিলেন, আপাতঃ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তারা বুঝি তাদের মূল দায়িত্ব গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করার কথা ভুলেই গিয়েছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ফিচার, মতামত, টকশো, আলোচনা, সাক্ষাতকারসহ প্রভৃতি আধেয় উপস্থাপনের মাধ্যমে নির্বাচনের দিকে সরকারের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছে। এভাবে নবম সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্র তৈরি ও বর্তমান পর্যায় পর্যন্ড় পৌছার ক্ষেত্রে দেশের অধিকাংশ গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য। তবে এটাও সত্য দু একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যমের ভাগ্যে ইতোমধ্যে বর্তমান সরকারের মিডিয়া পার্টনার খেতাব জুটে গেছে। অপরদিকে নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমসমূহের জন্য আচরণবিধি তৈরি করেছে। যা বিগত কমিশনগুলো করেনি। আবার বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দল বিদেশী পদ্ধতি অনুসরণেই হোক আর নিজেদের শুভবুদ্ধির জন্যই হোক প্রার্থী নির্বাচনের সনাতন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে কেন্দ্রের পরিবর্তে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ভোটে প্রার্থী বাছাই করেছেন বলে দাবী করেছে। এভাবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বহুমাত্রিকতা অনেক বেশী। সেজন্য এই নির্বাচনী কাভারেজ ব্যবস্থাপনাও বিগত নির্বাচনগুলো থেকে একটু ব্যাপক।

‡fvUvi wbeÜxKiY

নবম সংসদ নির্বাচনে ব্যবহার করার জন্য সর্বশেষ যে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়, এটি স্বাধীন বাংলাদেশের অষ্টম ভোটার তালিকা। এর আগে ১৯৭৩, ১৯৭৬, ১৯৮৩, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০ ও ২০০৬ সালে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক ও আলোচনার জন্ম দেয় ২০০৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা। সে তালিকা অনুসারে দেশের মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৯৩, ০৮২, ৪৯৯ । ২০০১ এর পহেলা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম সংসদ নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটার তালিকার তুলনায় এ সংখ্যা ছিল ২৪.১ শতাংশ বেশী। শুর“তে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভোটার তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিলেও পরে আদালতের রায়ের ভিত্তিতে পুরনো ভোটার তালিকা হাল নাগাদ করে তার খসড়া প্রকাশ করে। কিন্তু হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা ভোটার নিবন্ধীকরণ নিয়ে বিভিন্ন মহলের অসন্ড়োষ নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ

[১২] তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫,পৃ.২৩৮-২৪০।

হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট অনিয়মের অভিযোগ এনে খসড়া ভোটার তালিকা প্রত্যাখান করে। বিবিএস রিপোর্ট অনুসারে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও বয়স, গ্রুপ বিবেচনা করলে, কোনো অবস্থাতেই মোট ভোটারের সংখ্যা ৮ কোটি ২ লাখের বেশী হওয়ার কথা নয়।

২০০৬ এর ভোটার তালিকার মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে ওয়াশিংটন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইন্সটিটিউট (এনডিআই)। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯০ থেকে বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষন করে আসছে। ২০০৬ সালের অক্টোবরে করা এনডিআই এর 'সেকেন্ড সার্ভে অন দ্য ইনটেগ্রিটি অব দ্য ভোটার লিষ্ট'-এ হালনাগাদ করা ভোটার তালিকায় তিনটি বড় ত্রুটি চিহ্নিত করা হয় ঃ (১) অতিরিক্ত নাম (৬ শতাংশ)-ভোটার তালিকায় ওঠা নামগুলোর প্রতি ১৬ টির মধ্যে একটি ছিল ভুল। ওই নামগুলো থাকার কথা নয়; (২) ডুপিণ্ডকেট নাম (অনিচ্ছাকৃতভাবে, ৭ শতাংশ)-প্রতি ১৪টি নামের মধ্যে একটি নাম দুই বা ততোধিকবার তালিকায় এসেছে। যাদের নাম দুই বা ততোধিকবার তালিকায় স্থান পেয়েছে, তাদের মধ্যে ২৪ বা এর অধিক বয়সী ভোটারও আছেন, অথচ হাল নাগাদের সময় এ বয়স গ্রুপের নাম দুই বা ততোধিকবার তালিকায় স্থান পাবার কথা নয়; (৩) বাদ পড়া নাম (২.৫ শতাংশ)-প্রতি চলিণ্ডশ জন ভোটারের মধ্যে একজন ভোটার তালিকায় স্থান পায়নি (এর মধ্যে কিছু ভোটার বিদেশে থাকার কারণে বাদ পড়েছেন)। ভোটার তালিকায় অতিরিক্ত হিসাবে এবং দুই বা ততোধিকবার এসেছেন এমন ভোটারের মোট সংখ্যা মোট ভোটারের প্রায় ১৩ শতাংশ (এক কোটি বাইশ লাখ)।

এনডিআই জরিপ থেকে দেখা গেছে, ভোটার তালিকায় অতিরিক্ত নাম এসেছে মূলত কয়েকটি কারণে। কারণগুলো হলো ভোটারদের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে আবাসস্থল পরিবর্তন ; ত্রুটিযুক্ত নিবন্ধনকরণ; মৃত্যু; প্রাপ্ত তথ্য যাচাই না করা বা যাচাই করার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকা; এবং বয়স কম থাকা। তালিকায় একজনের নাম একাধিকবার এসেছে আবাসস্থল পরিবর্তনের কারণে (এ ধরণের ক্ষেত্রে একজন তার বর্তমান ঠিকানায় সঠিক নিয়মেই নিবন্ধিত হয়েছেন; আবার তার নাম পুরনো ঠিকানায়ও নিবন্ধীত হয়ে আছে), অন্যদিকে যাদের নাম ভোটার তালিকায় স্থান পায়নি তারা হয় ভোটার নিবন্ধনের কাজ চলাকালে বাসায় উপস্থিত ছিলেন না বা তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার করা হয়নি বা তারা নিজেরাই ইচ্ছে করে ভোটার হননি।

এনডিআই ভোটার তালিকার ওপর জরিপটি চালিয়েছিল এর নির্বাচনপূর্ব মূল্যায়ন মিশনের অংশ হিসেবে। প্রতিষ্ঠানটি জরিপের সময় ২২ হাজারের বেশী নাম চেক করেছে এবং ৩৭ টি গ্রাম বা মহলণ্ডার প্রায় ১১ হাজার ব্যক্তির সাক্ষাতকার নেয়।

খসড়া ভোটার তালিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তি উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন শেষ পর্যন্ড় তালিকা সংশোধনের উদ্যোগ নেয় (৫ ডিসেম্বর ২০০৬)

বাংলাদেশের ভোটার তালিকা নিয়ে এই প্রথম প্রশ্ন উঠেছিল এমন নয় । ১৯৯০ সালের ভোটার তালিকায় ভোটার হবার অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম ওঠার এবং কারো কারো নাম তালিকায় একাধিকবার ওঠার অভিযোগ উঠেছিল। ঐ ভোটার তালিকা সম্পর্কে কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক গ্রুপ ১৯৯১ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষন রিপোর্টে উলেণ্ডখ করেছিল; "১১ কোটি ৩০ লাখ লোকের বাংলাদেশে ৬ কোটি ২৩

লাখ ভোটার অস্বাভাবিক রকম বেশী; বিশেষ করে যখন দেশটির জনসংখ্যার অপ্রাপ্তবয়স্ক গ্রুপের কথা এবং বাদ পড়ার যোগ্য ভোটারদের সংখ্যা বিবেচনায় নেয়া হয়।"

২০০৮ সালে তৈরি নতুন ভোটার তালিকা অনুসারে ভোটার সংখ্যা ৮,১১,৩০,৯৭৩ অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি সংসদীয় এলাকায় রেজিষ্ট্রিকৃত ভোটারের সংখ্যা ২,৭০,৪৩৬। এ ভোটার তালিকা দিয়েই নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে রেজিষ্ট্রিকৃত ভোটারের সংখ্যাই ছিল৭,৫০,০০,৬৫৬ এবং প্রতি সংসদীয় এলাকায় তখন গড় ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৫০,০০২। অতীতে অনেক ক্ষেত্রে এক সংসদীয় এলাকার সাথে আরেক সংসদীয় এলাকার ভোটার সংখ্যার তারতম্য ছিল অনেক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক এলাকার তুলনায় আরেক এলাকায় ভোটারের সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ। ২০০৮ সালে সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে নতুন সংসদ এলাকা চূড়ান্ড় হবার পর যে কোন দুই এলাকার মধ্যে এ তারতম্য যৌক্তিকভাবে কমানো হয়েছে। নতুন সীমানা অনুসারে অধিকাংশ সংসদীয় এলাকায় রেজিষ্ট্রিকৃত ভোটারের সংখ্যা ২,৫০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ এর মধ্যে । এরপরও সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ নিয়ে অভিযোগ অনেক। এ সীমানা পুনঃনির্ধারণ নিয়ে তিন হাজারের অধিক মামলা হয়েছিল আদালতে।

২০০৮ সালে যখন নবম সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তখন রাজনৈতিক পরিবেশ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে একেবারে আলাদা। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট নভেম্বরের মাঝামাঝি এসে নির্বাচনে যাবার জন্য তৈরি। তারা তাদের মনোনয়নও চূড়ান্ড় করে ফেলে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোটের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রস্ড়ুতি নিয়ে বিস্ড়র রিপোর্ট করা হয়।

অন্যদিকে বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট তখনও (২০ নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ড়) পরিস্কার করতে পারেনি নির্বাচনে যাবে কি না। তারা সরকারের কাছে নির্বাচন পেছানোর দাবি জানাচ্ছে বারবার। সরকার সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে ১৮ ডিসেম্বরই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে ২০ নভেম্বর। এরকম পরিস্থিতিতে বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থীরা কী করছেন, নির্বাচনে গেলে তাদের প্রস্তুতি কী রকম, তা নিয়ে অনেক রিপোর্ট হয়েছে।[১৩]

wbevPbx cwiPvjbvi AvBbx KvVv‡gv

জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি জটিল প্রক্রিয়া। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (১২ নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ড় সংশোধিত) এবং এর অধীনে প্রণীত নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এবং সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এই প্রক্রিয়ায় একটি উলেণ্টখযোগ্য সংযোজন। যা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার করা হয়।

wbevPb cwiPvjbv wewagvjv 2008

স্বাধীনতার পর জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয় যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালে এই বিধিমালা রহিত করে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়। এই বিধিমালা নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা ও এই সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় ও সহায়ক ফরম সরবরাহ করে। এই বিধিমালার

[১৩] Election working Group (2007) *Bangladesh Ninth parliamentary Election, preliminary election observation report,* 03 January, 2009.

উলেণ্টখযোগ্য আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জামানত, মনোনয়ন বাতিলের বির ুদ্ধে আবেদন প্রক্রিয়া, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা, প্রতীক, ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরণের ভোট প্রক্রিয়া, ফলাফল গণনার প্রক্রিয়া ও ফলাফল একত্রীকরণ, নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিলের ফরম, হলফনামা, নির্বাচনী পিটিশন দাখিল ও এর সময় ইত্যাদি প্রক্রিয়া।

msm' wbevP‡b ivR‰bwZK 'j I cv_xi AvPiY wewagvjv-2008

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১ খ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনুসরণের জন্য একটি আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচন নামে প্রণয়ন করা হয়। এই বিধিমালায় নির্বাচনী প্রচারণায় নিষিদ্ধ কাজের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নির্বাচন সংশিণ্টষ্ট সকলের সচেতনতার জন্য প্রচার করা হয়।

GB AvPiY wewagvjv Abhvqx D‡jL‡hvM¨ wewa-wb‡la n‡"Q t

- ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের আগে (এক্ষেত্রে ৮ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখের আগে) কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা শুর ু করা যাবে না।
- কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ থেকে সংশিণ্টষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা এর অঙ্গীকার করা যাবে না, বা সংশিণ্টষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না।
- সরকারি ডাকবাংলো, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউস বা কোনো সরকারি কার্যালয়ে কোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন কোনো সড়কে জনসভা করা যাবে না।
- দালান, দেয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুটি বা অন্য কোনো দন্ডায়মান বস্ড়ুতে এবং কোনো সরকারি স্থাপনা ও কোনো ধরণের যানবাহনে পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাবে না।
- নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোষ্টার দেশি কাগজে সাদা-কালো রঙ্গের হতে হবে এবং তার আয়তন ২৩″×১৮″ এর বেশি হতে পারবে না। পোস্টারে প্রতীক ও প্রার্থী এবং মনোনয়নকারী দলের প্রধানের ছবি ছাড়া অন্য কারও ছবি বা প্রতীক ছাপাতে পারবে না। প্রার্থীর ছবি সাধারণ ভঙ্গিমার হতে হবে।
- দেয়াল বা যেকোন স্থাপনায় লেখা বা আঁকার মাধ্যমে কোনো প্রচারণা চালানো যাবে না।
- নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় কোনোভাবেই তিন মিটারের বেশি হতে পারবে না।
- কোনো প্রার্থীর পক্ষে ট্রাক, বাস, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোনো যানবাহনে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল করা যাবে না। নির্বাচনী প্রচারে কোনো আকাশযান ব্যবহার করা যাবে না।
- মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো শো-ডাউন করা যাবে না।

- কোনো গেট বা তোরণ নির্মাণ করা যাবে না।
- বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো আলোকসজ্জা করা যাবে না।
- প্রচারণামূলক কোনো শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।
- কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না।
- নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোনোভাবেই অতিক্রম করা যাবে না। উলেণ্টখ্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ **১৯৭২** (**১২** নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ড় সংশোধিত) অনুযায়ী এই ব্যয়সীমা একটি আসনে ভোটার প্রতি পাঁচ টাকা ধরে একজন প্রার্থীর জন্য সর্বোচ্চ **১৫** লাখ টাকা।

নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্গন করলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড যা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় শাস্ড়ি। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে শাস্ড়ি অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড।[১৪]

wbevPb cwµqvi Rb¨ c‡hvR¨ ¸i"ZcY AvBb Ges Zvi Aax‡b ¸i"ZcY aviv¸‡jv wbgi/c t

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, **১৯৭২** (**১২** নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ড় সংশোধিত) জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন। এতে সাতটি অধ্যায় ৯৫টি ধারার অধীনে যেসব বিষয় অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের গঠন (অধ্যায় ২) নির্বাচন সংক্রান্ড় বিষয় যেমন নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারদের নিয়োগ ও তাদের কাজ ও ক্ষমতা, সংসদ সদস্য প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা, মনোনয়নপত্র বাছাই করার প্রক্রিয়া, ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া, ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা (অধ্যায় ৩), নির্বাচনী ব্যয়, নির্বাচনী প্রচারণা এবং নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল (অধ্যায় ৩ ক), নির্বাচনের সময় প্রশাসন এবং আচরণ (অধ্যায় ৩ খ), নির্বাচনী বিরোধ (অধ্যায় ৫), নির্বাচন সংক্রান্ড় অপরাধ, দন্ড এবং পদ্ধতি (অধ্যায় ৬), কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন (অধ্যায় ৬ ক), এবং অন্যান্য বিষয় (অধ্যায় ৭) উলেণ্টখযোগ্য।

2008 mv‡j MYcwZwbwaZ Aa¨v‡'k 1972 ms‡kvab K‡i †hme cwieZb Kiv nq Zvi g‡a¨ D‡jL‡hvM¨ n‡"Q t

১. রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা এবং বৈদেশিক ও অঙ্গ সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। যেসব দল স্বাধীনতার পর থেকে কোনো সংসদ নির্বাচনেই আসন লাভ করেনি এবং মোট ভোটের ৫ শতাংশের কম ভোট পেয়েছে তারা নিবন্ধনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। প্রতিটি দলের নিজস্ব সংবিধান থাকা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি দলের বিভিন্ন কমিটিতে নির্বাচিত সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক;
২. প্রতিটি দলের সংবিধানে ২০১২ সালের মধ্যে সব কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক;
৩। বিল ও ঋণ খেলাপী এবং দেশি বা আন্ড়র্জাতিক আদালত কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা;

---

[১৪] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের ওপর একটি পর্যবেক্ষনমূলক বিশেণ্টষণ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯-১০।

৪। না ভোটের সুযোগ রাখা এবং কোনো আসনে ৫০ শতাংশের বেশি না ভোট পড়লে আবার নির্বাচনের ব্যবস্থা

৫। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তাদের অবসর গ্রহণের পর কমপক্ষে তিন বছর নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়া।

৬। একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ তিনটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ;

৭। নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে অবশ্যই ভোটার হওয়া এবং মনোনয়নপত্রের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে হলফনামার মাধ্যমে আট ধরণের তথ্য প্রদান। এই আট ধরণের তথ্যের মধ্যে রয়েছে ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা, ২। বর্তমান প্রার্থীর বির"দ্ধে র"জুকৃত ফৌজদারী অপরাধের তালিকা, ৩। অতীতের ফৌজদারী মামলার তালিকা ও ফলাফল, ৪। প্রার্থীর পেশা, ৫। প্রার্থীর আয়ের উৎসসমূহ ৬। অতীতে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে জনগনের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্র"তি পূরণে তার ভূমিকা ৭। প্রার্থী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার বর্ণনা এবং ৮। ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা যা তিনি ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে এবং এমন কোনো কোম্পানী যার তিনি সভাপতি বা নির্বাহী পরিচালক বা পরিচালক হিসেবে নিয়েছেন;

৮। যে কোন প্রার্থীর নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের শাস্ড়ি স্বরূপ নির্বাচন কমিশনের প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা; এবং

৯। মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি আসন থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই বাধ্যতামূলক মনোনয়ন দান।

cwZôvbK I ivR‰bwZK ms¯vi

১১ জানুয়ারি পরবর্তী সরকার দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রভাব থেকে মুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নির্বাচনের লক্ষ্যে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব উদ্যোগের মধ্যে বিচার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশণ ও সরকারি কর্ম কমিশনের সংস্কার ও পুনর্গঠন, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ অনুমোদন, এবং সর্বোপরি দুর্নীতিকে শাস্ড়িযোগ্য অপরাধের পর্যায়ভূক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং এদের একটি জবাবদিহিতা কাঠামোর আওতায় আনার জন্য নির্বাচন সংক্রান্ড় আইন (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২) সংশোধন করে এবং সংশোধিত আইনের আলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে। যা নির্বাচনী বছরে বিভিন্নভাবে প্রিন্ট মিডিয়ায় ছাপা হয়।

wbevPbx e¨‡qi m‡ev"P mxgv cbtwbaviY

তত্ত্বাবধায়ক সরকার কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন করার সদিচ্ছা প্রকাশ করে। এজন্য ঋণ ও বিল খেলাপিদের নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করে, এবং নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা পাঁচ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে একটি বাস্ড়বসম্মত সীমা নির্ধারণ করার প্রস্ড়াব উত্থাপিত হয়। প্রথমে এই সীমা ২০ লাখ টাকা প্রস্ড়াব করা হয়, যা পরবর্তীতে সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকায় নির্ধারিত হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ২০০৭ সালের স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৪০টি

সংসদীয় আসনে মনোনয়ন-প্রত্যাশীদের প্রচারণার ধরণ ও তার জন্য ব্যয়িত অর্থের একটি হিসাব সংগ্রহ করে । এই গবেষণায় দেখা যায় মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ড় ৩৮টি আসনে মোট ১২২ জন প্রার্থী নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগে থেকেই প্রচারণা চালিয়েছেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে সবচেয়ে বেশি (৫০%) প্রার্থী প্রচারণা করেন, আর তার পরেই ছিল আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা (৩৪.৪%)। দেখা যায় অধিকাংশ প্রার্থী মূলত তফসিল ঘোষণার তিন মাস আগে থেকেই প্রচারণা শুর— করেন। এই ১২২ জন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণা বাবদ ৩ জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ড় মোট ব্যয় করেন ১৮ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৫০ টাকা। এই হিসেবে প্রত্যেক প্রার্থী গড়ে ১৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বেশি ব্যয় করেন। উলেণ্ঢখযোগ্য ব্যয়ের খাত ছিল র‍্যালি বা মিছিল, জনসভা আয়োজন, নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা, কর্মীদের জন্য ব্যয় ও পরিবহন ব্যয়। এসব আসনে আওয়ামী লীগের ৪২ জনের মধ্যে ১৫ জন এবং বিএনপির ৬১ জনের মধ্যে ৩১ জন প্রার্থী ৩ জানুয়ারী ২০০৭ পর্যন্ড় নির্বাচনী প্রচারণায় পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি ব্যয় করেন বলে দেখা যায়। গবেষণায় আরও দেখা যায় এই ১২২ জন প্রার্থীর মধ্যে একমাত্র ওয়ার্কার্স পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য সব দলের প্রার্থীরাই নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্গন করেন।[১৫]

me ‘‡ji Rb¨ mgvb †¶Î ˆZwi

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এবারই প্রথম সরকার ও নির্বাচন কমিশন সবগুলো রাজনৈতিক দলের সাথে কয়েকটি ধাপে সংলাপের আয়োজন করে। এসব সংলাপের মাধ্যমে সংশিণ্ঢষ্ট আইন সংশোধন, আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশগহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এছাড়াও নির্বাচনের আগে সময়-স্বল্পতার কারণে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) ২০০৮ দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী দলের নিবন্ধনের জন্য অন্যতম গুর—ত্বপূর্ণ দলিল দলীয় সংবিধান সাময়িকভাবে সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া যাবে বলে শর্ত সহজ করা হয়। তবে একই সাথে এও বলা হয় যে, নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনের পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে পরিবর্তিত সংবিধান কাউন্সিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চূড়ান্ড় করে নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে।

FY I wej †Ljvwc cv_©‡`i mweav c`vb

নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন দলের দাবির প্রেক্ষিতে ঋণ ও বিল খেলাপিদের জন্য তিনবার শর্ত সহজ করা হয়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর প্রথম সংশোধনীতে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার কমপক্ষে ছয় মাস আগে ঋন পরিশোধের সুযোগ করে দেয়া হয়।[১৬]

---

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৩।

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

wbevPbx Bk‡Znvi

নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুর"র পূর্বেই প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা শুর" করে যা দেশের প্রায় সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোতে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। প্রধান প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল নিম্নরূপ:

evsjv‡`k Avlqvgx jxM Gi wbevPbx Bk‡Znvi

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নতুন ভোটারদের আকৃষ্ট করতে ভিশন ২০২১ নামে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী ঘোষণা করে। নির্বাচনী ইশতেহারকে 'দিন বদলের সনদ' আখ্যায়িত করে ২৩ দফা অঙ্গীকার ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে পারলে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমিয়ে জনজীবনে আস্থা ও স্বস্ড়ি ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে;

২. দুর্নীতির বির"দ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসন, দারিদ্র্য বিমোচন, সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেবে;

৩. ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করে;

৪. স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণ, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫. পরিবেশ ও পানিসম্পদ রক্ষায় সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে;

৬. শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে;

৭. শিক্ষা ও বিজ্ঞান খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া এবং নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো হবে। ২০১৩ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্নাতক স্ড়র পর্যন্ড় অবনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে। শিক্ষকদের জন্য কর্ম কমিশণ গঠন করা হবে;

৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন করা হবে;

৯. প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু-কিশোরের কল্যাণ, যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শ্রমনীতি সংশোধন করা হবে;

১০. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন। পাতাল রেল, সার্কুলার রেল, সড়ক ও বৃত্তাকার নৌপথ, আকাশপথ, অ্যালিভেটেড রাস্ড়া, ফ্লাইওভার নির্মাণ ও রাস্ড়াঘাটের উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা শহরে পরিবহন সমস্যার সমাধানে ঝুলন্ড় সেতু নির্মাণ করা হবে। গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের আধুনিকায়ন এবং দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশের জন্য তা উন্মুক্ত করা হবে। বাংলাদেশকে এশীয় হাইওয়ে ও এশীয় রেলপথের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। সমমর্যাদার ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে সব রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়, এই নীতির ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হবে;

১১. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হবে;

১২. জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হবে;

১৩. বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় মানবাধিকার, আইনের শাসন ও মৌলিক নাগরিক অধিকার সুপ্রিতিষ্ঠিত করা। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর ও জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার পুনর্বিবেচনা করা হবে। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচারসহ সব গ্রেনেড ও বোমা হামলার বিচার করা হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা এবং জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস কঠোর হাতে দমনের অঙ্গীকার করে;

১৪. নাগরিকের মর্যাদা নিশ্চিত করতে একটি সার্বিক কর্মসংস্থান নীতিমালা গ্রহণ করা হবে;

১৫. বিশ্ব মন্দা মোকাবেলায় টাস্কফোর্স গঠন করা এবং তথ্য ও বিশেণ্ডষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে;

১৬. ২০১২ সাল অর্থাৎ আগামী চার বছরের মধ্যে দেশকে পুনরায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে;

১৭. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন, দুর্নীতির বির"দ্ধে যুদ্ধ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করা হবে। রাজনীতি ও দলীয়করণমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা হবে;

১৮. ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হবে ২০ হাজার মেগাওয়াট। তিন বছর মেয়াদী ক্র্যাশ প্রোগ্রাম বাস্ড়বায়ন করে ২০১৩ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সাত হাজার মেগাওয়াটে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে আট হাজার মেঘাওয়াটে উন্নীত করা হবে। জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অভ্যন্ড়রীণ ও আঞ্চলিক বহুমুখী পদক্ষেপ নেয়া হবে;

১৯. ২০১৩ সাল অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দারিদ্রের হার বর্তমান ৪৫ শতাংশ থেকে নামিয়ে আনা হবে। দারিদ্রের সংখ্যা সাড়ে ছয় কোটি থেকে কমিয়ে চার কোটিতে আনা হবে;

২০. ২০২১ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা বর্তমান চার কোটি ২০ লাখ থেকে নয় কোটিতে পৌছাবে;

২১. জাতীয় গুর"ত্বপূর্ণ নীতি সংসদে নির্ধারিত হবে। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সংসদ প্রধান ভূমিকা পালন করবে;

২২. ২০১৩ সাল অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে এবং ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করে ভবিষ্যতে তা যেন অব্যাহত রাখা যায় সে প্রচেষ্টা করা হবে;

২৩. ১৯৯৭ সালের আওয়ামী লীগের নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহাল এবং সংসদে সংরক্ষিত আসন ৩০ শতাংশে উন্নীত ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

evsjv‡‘k RvZxqZvev‘x ‘j (weGbwc)-Gi wbevPbx Bk‡Znvi

১. যিনি স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হবেন তিনি দলীয় পদ থেকে সঙ্গে সঙ্গে ইস্ড়ফা দেবেন। বিরোধীদল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার দেয়া হবে;

২. জাতীয় স্বার্থসংশিণ্ডষ্ট সব বিষয়ে সংসদ ও সংসদের বাইরে আলোচনা করে মতৈক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ড় নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সংসদ অধিবেশন বর্জন করার প্রবণতা রোধের লক্ষ্যে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্য সৃষ্টি করা হবে;

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোরদার এবং দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;

৪. আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করা হবে;

৫. দেশ ও জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ''দেশ বাঁচাও-মানুষ বাঁচাও'' স্লেণ্ডাগান ধারণ করে নিরলসভাবে কাজ করা হবে;

৬. সক্ষম ও নিরপেক্ষ প্রশাসন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি ও যথার্থ গণমুখী প্রশাসন খুবই প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে;

৭. বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে সংসদে বিস্ড়ারিত আলোচনা করে প্রতি পাঁচ বছর পরপর যথাসময়ে যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। রাজনৈতিক দল ও দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরাজমান হিংসা, দ্বেষ ও শত্রুতার সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে গঠনমূলক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮. দ্রব্যমূল্য রোধে কার্যকর পদক্ষেপ তথা চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম কমিয়ে জনজীবনে আস্থা ও স্বস্ড়ি ফিরিয়ে আনা হবে,

৯. দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসন, দারিদ্র বিমোচন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

১০. আইন রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, উন্নত সরঞ্জাম, আধুনিক অস্ত্র ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে অভ্যন্ড়রীণ শান্ড়ি-শৃঙ্খলা রক্ষার উপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হবে;

১১. দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং সংবিধান ও আইনের অধীনে কার্যকরভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনমত সৃষ্টির জন্য নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো, সংবাদ মাধ্যম ও জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে;

১২. নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করার বিধান করা হবে;

১৩. জাতীয় অর্থনীতি এবং শিল্প ও বাণিজ্যের অব্যাহত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাত ও সমবায়কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

১৪. জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে তেল, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;

১৫. যত দ্রুত সম্ভব বিদ্যুৎ, কয়লা ও গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা ব্যবহার করা হবে;

১৬. দেশের সব নাগরিকের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভের দ্বার অবারিত করা এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যাতে কোনো মানুষ নিরক্ষর না থাকে এবং কোনো শিশু যাতে শিক্ষাঙ্গনের বাইরে না থাকে তা নিশ্চিত করা হবে;

১৭. জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালী করা হবে;

১৮. সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং কারো সাথে বৈরিতা নয়–এই মনোভাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা হবে;

১৯. মৌলবাদ, উগ্রতা ও সহিংসতা কার্যকরভাবে প্রতিহত করা হবে;

২০. প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগ,পদোন্নতি ও পদায়নের বিষয় মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে;

২১. নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের শীর্ষ পদে নিয়োগ পদ্ধতি প্রস্ড়াবের জন্য একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে।

Rvgvqv‡Z Bmjvgxi wbevPbx Bk‡Znvi

১. ক্ষমতায় যেতে পারলে জামায়াতে ইসলামী হরতাল ও অবরোধের মত কর্মসূচি বেআইনী ঘোষণা করার উদ্যোগ নেবে;

২. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা,নির্বাচনী আইন, বিধিমালা ও পদ্ধতির যথোপযুক্ত এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে দুর্নীতি দমনে যথাযথ সহযোগিতা করা হবে;

৩. জোটের শরিক দল দুর্নীতি করলে জামায়াত প্রতিবাদ করবে;

৪. প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলামী মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও সালাত কায়েম করার যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেবে। বই ও গণমাধ্যমে ধর্মভিত্তিক প্রচারণা এবং কটূক্তিকারীদের প্রতিরোধ ও শাস্ড়ির বিধানের জন্য বণ্ঢাসফেমি জাতীয় আইন প্রণয়ন করবে;

৫. সরকারি কর্মচারিদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা বাড়ানো এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ২০-৩০ বছর বয়সী নাগরিকদের ক্রমান্বয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে;

৬. মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর গুর"ত্ব দেয়া হবে;

৭. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে টিসিবিকে সম্প্রসারণ অথবা নতুন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভোগ্যপণ্য ক্রয় ও ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করা হবে;

৮. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা শক্তিশালী ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সুদ মওকুফ এবং সহজ শর্তে কৃষিঋণ প্রদান করবে;

৯. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে আরও সম্প্রসারণ করা হবে;

১০. শিল্পের সম্প্রসারণ, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও শিল্পপণ্য রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি-বেসরকারি উদ্যেগে পরিকল্পিতভাবে শিল্প স্থাপন করা হবে;

১১. নগর ও বিভাগীয় শহরে নারী ও শিশু যাত্রীদের জন্য পৃথক যানবাহন চালু করা হবে এবং দেশের তেল, গ্যাস, কয়লা সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হবে;

১২. জাতীয় কয়লানীতি প্রণয়ন ও বিকল্প সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হবে।

RvZxq cwUi wbevPbx Bk‡Znvi

১. দ্রব্যমূল্যকে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য খাদ্য সামগ্রীর ওপর প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দেয়া হবে;

২. দেশ থেকে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি সমূলে নির্মূল করা হবে। জাতীয় পার্টি হরতালের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তাই হরতাল এবং সংঘাতময় রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে;

৩. এককেন্দ্রিক সরকারের পরিবর্তে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘোষণা দিয়ে বলা হয় যে, দেশকে আটটি প্রদেশে ভাগ করে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ সরকার গঠন করা হবে। প্রাদেশিক সরকারই সংশিণ্টষ্ট প্রদেশের উন্নয়নসহ সার্বিক-শাসন কাজ পরিচালনা করবে;

৪. আদালতসহ পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা চালু, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন কার্যক্রম, খাদ্য জ্বালানি নিরাপত্তা, দেশ রক্ষার সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক করা ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় পুলিশের সংখ্যা বাড়ানোর অঙ্গীকার করা হয়;

৫. জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কয়লার বহুমুখী ব্যবহার, বৈদেশিক সাহায্যে রংপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হয়;

৬. শিক্ষার উন্নয়নে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ড় অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হবে;

৭. স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা, গ্রামের দুস্থ মানুষ ও কৃষকদের সেবায় পলণ্ডী ব্যাংক করা হবে;

৮. যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার নির্মানসহ কুতুবদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হবে;

৯. সামাজিক খাতের উন্নয়নে পথকলি ট্রাস্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক উপজেলায় কারিগরি স্কুল এবং গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন করা হবে;

১০. আলণ্ডাহ, রাসূল (সাঃ) ও শরিয়তের বির"দ্ধে কটূক্তিকারীদের শাস্ড়ির বিধান সংবলিত আইন প্রণয়ন করা হবে;

১১. নারী অধিকার সুরক্ষায় পারিবারিক আদালতের কার্যকারিতা আরও শক্তিশালী করা হবে;

১২. অর্থনীতি চাঙ্গা করতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সুদৃঢ় করার জন্য মুক্তিযোদ্ধার সন্ড়ানদের চাকুরি প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়।

wjev‡ij †W‡gv‡µwUK cwUi wbevPbx Bk‡Znvi

১. দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের কঠোর শাস্ড়ি দেয়ার লক্ষ্যে কঠোর আইন প্রণয়ন করা। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করে দুর্নীতি দমনে তাদের কাজে সহায়তা করা হবে;

২. সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত একটি আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে;

৩. জাতীয় নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নিজ নিজ মর্যাদার ভিত্তিতে তাদের প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৪. ঘৃণা ও বিভক্তির রাজনীতি পরিহার করে ভালোবাসা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা হবে;

৫. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও অর্থপূর্ণ করা হবে;

৬. শিক্ষার সুযোগ প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হবে;

৭. সশস্ত্রবাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর আলোকে আধুনিকায়ন করা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো হবে।[১৭]

5.6 wbevPbKvjxb MYgva¨‡gi fwgKv

নবম সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে চরম রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ও সংঘর্ষ বাধে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের হাত থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়রের সময় ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ড় দশদিনে নজীরবিহীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতার

[১৭] বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡`‡ki mwaviY wbevPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৬৩-৬৮।

ঘটনা ঘটে। এসময় ৫০ ব্যক্তি নিহত হয় বলে রিপোর্ট থেকে জানা যায়। সংবাদপত্রের রিপোর্টের ভিত্তিতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান অধিকার এর রিপোর্ট অনুসারে নিহতদের ২০ জন বিএনপির, ১৩ জন আওয়ামীলীগের, ৯ জন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এবং একজন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির। মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এর নিয়োগকে কেন্দ্র করে এসব সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে । এর পরে হত্যাকান্ডসহ চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘর্ষ অবহ্যাত থাকে। যা সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচার করা হয়।

নির্বাচনসংশিণ্টষ্ট সন্ত্রাস-সংঘর্ষ নিয়ে রিপোর্টে যে দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয় তা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্ত্র উদ্ধারের কার্যক্রম, তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ, অস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি।

নবম সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি। ঐদিন নির্বাচন না হয়ে তার আগেই দেশে জর"রি অবস্থা জারি হওয়ার পর নজীরবিহীন ঘটনা ঘটতে থাকে। এরমধ্যে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান, প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক রাজনৈতিক নেতা গ্রেফতার এবং সন্ত্রাসবিরোধী চলমান অভিযান, এসবের কারণে আসন্ন নির্বাচনের সময় সন্ত্রাস উলেণ্টখযোগ্যভাবে কম হবে এমন আশা করেন অধিকাংশ মানুষ। তারপরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সম্ভাব্য সব ধরণের সূত্রের সাথে যোগাযোগ করে অনেক তথ্য উপাত্ত নিয়ে সাংবাদিকগণ তাদের নির্বাচনী রিপোর্টিং চালিয়ে যেতে থাকেন।

cv_x‡' i g‡bvbqb, wbevPbx cZxK I AvmbmsL¨v

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের প্রথম দিনে শতাধিক প্রার্থীর এবং ৪ ডিসেম্বর শেষ দিন ৫৭৭ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষিত হয়। ৫ ডিসেম্বর বিল ও ঋণ খেলাপি হিসেবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ অন্যান্য দলের ১২১ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষিত হয়। বহু নাটকীয় ঘটনার পর জাতীয় পার্টি ১১ ডিসেম্বর মহাজোটে থাকার সিদ্ধান্ড় ঘোষণা করে। ঐদিন ঘোষণা করা হয় যে, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪১৪ জনের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করার পর চূড়ান্ড় প্রার্থী থাকছেন ১৫৯৭।

mviwY 5.4 : ivR‰bwZK ' j, cZxK Ges †IwIZ AvmbmsL¨v

'‡ji bvg	cZxK	Avmb msL¨v
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	চেয়ার	২
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাতপাখা	১৬৬
ইসলামী ঐক্যজোট	মিনার-২, ধানের শীষ	৪
ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন	চাবি	১১
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা	৪৬
গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর	৫
গণফ্রন্ট	মাছ	১৪
গণফোরাম	উদীয়মান সূর্য	৪৫
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	খেজুর গাছ-৫, ধানের শীষ-২	৭
জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল	৩৭
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	হুক্কা-১, ধানের শীষ-১	২

জাতীয় পার্টি	লাঙ্গল	৪৬
জাতীয় পার্টি- জেপি	বাইসাইকেল	৭
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	মশাল-২, নৌকা-৪	৬
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	তারা	৪৪
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	আম	২৯
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	বাঘ-১, কুলা-২০	২১
ফ্রীডম পার্টি	কুড়াল	২
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	২৫৯
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	হাতঘড়ি	১৮
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	বটগাছ ৩১	৩৯
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	হাতপাখা-১	৩২
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	রিক্সা	৮
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	কাঁঠাল	১০
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	ধানের শীষ	২
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	ধানের শীষ	২৫৬
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	দাড়িঁপালণ্ডা	৩৯
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	ফুলের মালা	৩১
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	কুঁড়েঘর	১৪
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	গাভী	৫
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন	৫
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	মই	৫৭
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ি-২, নৌকা-৩	৫
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	কাস্তে	৩৭
বাংলাদেশ বিপণ্ডবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল	৫
বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এম.এল)	চাকা	১
বিকল্প ধারা বাংলাদেশ	কুলা	৬২
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি	ছাতা	১৮
স্বতন্ত্র	বিভিন্ন প্রতীক	১৪১
মোট		১৫৩৮

উৎস: নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

‡fvU MnY I RbM‡Yi AskMnY

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনের দিনটি ছিল শান্তি পূর্ণ এবং সাধারণ ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। সকল দেশি এবং বিদেশি পর্যবেক্ষক নবম সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে এমন অভিমত প্রকাশ করেন।[১৮]

নির্বাচন সংক্রান্ত সব আশঙ্কা দূর করে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কেননা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যত আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে তা বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে ইতোপূর্বে আর হয়নি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার সকল প্রকার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এ নির্বাচনে নতুন ভোটারদের

[১৮] The Daily Star, 30 December, 2008

উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এছাড়া মহিলা ভোটারদের উপস্থিতির হারও ছিল পূর্বের নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি। সকল প্রকার বৈরী আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে মহিলা ভোটাররা তাদের ভোট প্রয়োগ করে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়। নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক হিসাবে প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

জাতীয় পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো জনমত জরিপের অভাবে সাংবাদিকগণ জনগনের রাজনৈতিক সমর্থন সম্পর্কে জানতে রাজনীতিবিদদের সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে। বর্তমানে বাংলাদেশে হাতে গোণা যে ক'টি জনমত জরিপ হয়েছে, সেগুলো ছোটখাট এবং অনিয়মিত। ফলে সাংবাদিকদের পক্ষে ভোটারদের মনোভাব বোঝা বা নির্বাচনের ফলাফল অনুমান করা খুবই কঠিন। তাই মানুষ কীভাবে ভোট দেবেন তা জানার জন্য সাংবাদিকগণ মানুষকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে রিপোর্ট তৈরি করেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ অতীতের অনেক নির্বাচনে দেশের অনেক জায়গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছে এবং অনেক জায়গায় তাদেরকে বিশেষ দলের প্রার্থীদের ভোট দিতে বলা হয়েছে।[১৯]

MYgva¨‡gi †Pv‡L wbevP‡bi wPÎ

অতীতের বহু নির্বাচনে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোটারদের আতঙ্কগ্রস্ড় করা হয়েছে। কিন্ড়ু ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় ভোটারদেরকে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে দেখা গেছে, যদিও নির্বাচনের আগে পরে সহিংসতার অনেক ঘটনা ঘটেছে। সাংবাদিক বা নিবার্চন পর্যবেক্ষকগণ ভোটার সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য জেনে তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করেন -

ক) দলীয় কর্মীদের ভয়ে ভোটাররা আতস্কগ্রস্ড় কি না;

খ) সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সম্পর্কে ভোটাররা সন্দিহান কি না;

গ) প্রচারকালে ও ভোটের দিন সন্ত্রাসের সম্ভাবনা আছে কি না;

ঘ) ভোট দেয়ার ব্যাপার নিশ্চিত কি না;

ভোটের দিনে সাংবাদিকদের রিপোর্ট ও পর্যবেক্ষন-

নির্বাচন সংক্রান্ড় রিপোর্টের জন্য ভোটের দিনটি অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ন। ভোটের দিনে একজন সাংবাদিক বা পর্যবেক্ষক কতগুলো বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন-

ক) ব্যালট বাক্স : প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ছোট ২ টি অথবা বড় একটি (প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি অতিরিক্ত)

খ) ব্যালট পেপার: ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার টিক ততটি ব্যালট পেপার।

গ) ভোটার তালিকা: প্রতি ভোটকক্ষের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার এক কপি।

ঘ) অমোছনীয় কালি : প্রতি ভোটকক্ষের জন্য এক শিশি এবং কেন্দ্রের সবকটি ভোটকক্ষের জন্য অতিরিক্ত এক শিশি।

ঙ) রাবারের সীল মোহর : প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি ।

[১৯] আহমেদ, বোরহান উদ্দিন, cv_x , wbevPb G‡R›U, ‡cwjs G‡R›U Ges wbevPb mswkó KgKZv‡'i ÁvZe¨ : RvZxq msm' wbevPb c×wZ AvBb I wewagvjv fvl¨, গোধূলি, ঢাকা, ২০০১ ।

চ) বর্গাকার সীল মোহর : প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি এবং প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি অতিরিক্ত।

ছ) ষ্ট্যাম্প প্যাড : প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি ।

জ) গালা : প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা পাউন্ডের এক প্যাকেট।

ঝ) পিতরেল সীলমোহর: প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি ।

ঞ) চটের থলি : ভোটকেন্দ্রের দ্রব্যাদি বহনের জন্য কেন্দ্র প্রতি একটি।

ট) প্যাকেট : বিভিন্ন প্রকার ব্যালট (ব্যবহারের পর) মুড়িবই এবং ভোটার লিষ্ট রাখার জন্য প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের জন্য ১৫ টি প্যাকেট রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে সরবরাহ করা হয়। ভোটের দিন বিশেষ করে ভোট গণনার সময় যে সমস্ড় অনিয়ম ঘটে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য সাংবাদিকরা দিয়েছেন।

‡fvU Mn‡Yi w‘b mvsevw‘KMY wbgwjwLZ welq m¤ú‡K wi‡cvU K‡ib -

- ব্যালট পেপারে ভোটারের স্বাক্ষর বা আঙুলের ছাপ রাখা হচ্ছে কি না;
- প্রতিটি মুড়ি বই এর প্রথম নম্বরটি লিখে রাখা হচ্ছে কি না;
- মোট কয়টি মুড়ি বই ব্যবহৃত হলো তা হিসাব রাখতে হবে। সর্বশেষ মুড়ি বইয়ের শেষ ব্যালট পেপারটির ক্রমিক নম্বর লিখে রাখা হচ্ছে কি না;
- একজন ভোটারের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ এবং ভোট দিয়ে বের হতে কত সময় লাগে তার একটা হিসাব নেয়া । প্রতি ঘন্টায় কত জনের ভোট দেওয়া হচ্ছে তার একটা হিসাব লিখে রাখা হচ্ছে কি না;
- অবাঞ্ছিত কোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে ঢুকে কোনো রকম প্রভাব খাটালে তার বিবরণ জানা;
- ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে ভোটার, প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্টদের কোন অভিযোগ আছে কি না;
- নির্বাচিত কমকর্তাদের কোন অভিযোগ আছে কি না;
- দেশী বা বিদেশী পর্যবেক্ষকদের কোনো মতামত আছে কি না;
- নির্ধারিত বয়সসীমার (১৮) নিচে কেউ ভোট দিতে এলে তার নাম এবং ক্রমিক নম্বর জেনে নেয়া;
- জাল ভোট সংক্রান্ড় অভিযোগ কয়টি তার হিসাব রাখা;
- ঠিক ক'টার সময় ভোট গ্রহণ শেষ হলো খেয়াল রাখা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের নির্বাচনে নানা ধরনের প্রতারণা অনেকটা স্থায়ী হয়ে গেছে সাংবাদিকগন এসব প্রতারনা নিয়ে রিপোর্ট করেন। এক্ষেত্রে -

- অন্য ভোটারের বেশে এসে তাঁর ভোটটি দিয়ে যাওয়া অর্থাৎ জাল ভোট দেয়া।
- নির্বাচন বুথে প্রবেশের মুহূর্তে ভোটারকে কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে প্রভাবিত করা।
- ব্যালট এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী অনেক সময় নিয়ে সরবরাহ করে ভোটারদের নির"ৎসাহিত করা।
- যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টি করে ভোটারদের আসতে নির"ৎসাহিত করা।
- প্রতিবন্ধী ভোটারদের সাহায্যের অজুহাতে নির্দিষ্ট প্রার্থীর প্রতীকে ছাপ দিয়ে দেয়া।
- জোর করে ব্যালট বাক্স ছিনতাই এবং তা নষ্ট করা।
- ব্যালট পেপার, সিল, বাক্স বা অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী বা কাগজপত্র চুরি করা এবং ধ্বংস করা।

- নির্বাচনী কর্মকর্তারা কোনো চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবাদ করলে তাদের মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য ঘুষ দেয়া।
- ভোটকেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষমান ভোটারদের নিরুৎসাহিত করার জন্য বা অসুবিধায় ফেলার জন্য কেন্দ্রের বাইরে সাঁটা ভোটার তালিকা চুরি বা বিনষ্ট করা।
- ভোটার সংখ্যার বেশি ব্যালট পেপার সরবরাহ করা।
- ভোটকেন্দ্র দখল, সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং ইচ্ছামত ব্যালট পেপারে সিল মারা। ভোটার এবং পোলিং এজেন্টদের জোর করে কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করা ইত্যাদি।[২০]

B‡j KUwbK wgwWqv I wbe©vPb

নির্বাচনের সময় জনগণকে নির্বাচন সংক্রান্ড় অনেক তথ্য জানানোর দায়িত্ব ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো নেয়। রেডিও ও টেলিভিশন নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনকালীন কিছু কিছু বিষয়ের ওপর ঘন ঘন অনুষ্ঠান প্রচার করে, যেমন: ভোটারের অধিকার, ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া, ভোটের গুরুত্ব, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এর প্রয়োগ ইত্যাদি। এ ছাড়া ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং নিয়মিতভাবে প্রচারের জন্য নির্বাচন কমিশন কিছু কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করে।

সাধারণভাবে নির্বাচনকালীন সময়ে আমাদের দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার সুযোগ দেয়া হয়। গত নির্বাচনে এ ধরণের নজির দেখা গেছে। তবে সেক্ষেত্রে রেডিও-টেলিভিশন আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে দলগুলোর নির্বাচনী ওয়াদাসমূহের বিশেণ্ডষণমূলক কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারত বা পারে। ১৯৯১ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সময়ও রেডিও টেলিভিশনের অনুরূপ ভূমিকা ছিল। ২০০১ সালে লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর ২০০৮ সালের নির্বাচনের সময়ও গণমাধ্যম পূর্বের ন্যায় ভূমিকা পালন করে। সুতরাং রেডিও-টেলিভিশনের সাংবাদিক ও প্রযোজকদের এ ব্যাপারে কিছু পূর্ব-প্রস্তুতি ও পূর্ব-পরিকল্পনা থাকা উচিত, যাতে নির্বাচনে একটি ন্যায্য প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় । কারণ গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে হলে সমতা বিধানের এই কৃষ্টি গড়ে তোলা প্রয়োজন। বেসরকারি টিভি-চ্যানেলগুলোর কাছেও জনগণের প্রত্যাশা অনেক। চ্যানেলগুলো নির্বাচনী চ্যানেল না হয়ে, সত্যিকারের গণমূখী ভূমিকা রাখবে বলে জনগণ আশা করেন। এই চ্যানেলগুলো নিয়মিত সংবাদ প্রচারের পাশাপাশি অনুসন্ধানী ও বিশেণ্ডষণমূলক সংবাদ পরিবেশন করে ভোটারদের সিদ্ধান্ড়গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বেসরকারি রেডিওগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

নির্বাচনের সময় ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের উদ্যোগ নেয়। যেমন: প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি বিতর্ক অনুষ্ঠান, জনগণের সাথে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা, সংলাপ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান ইত্যাদি। আবার নেতা বা প্রতিনিধিরা সে অনুষ্ঠানে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার, কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের প্রশ্নের জবাব দেন। এ ধরণের

[২০] নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

অনুষ্ঠান নির্বাচনী ওয়াদা ও অন্যান্য মন্ড়ব্য করার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের আরো বেশি স্বচ্ছ, বাস্ড় ববাদী হতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আশা করা যায়।

বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রচারাভিযানের হালচিত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে তুলে ধরা হয়। এছাড়া নিজেদের উদ্যোগে নিজেদেরই নির্বাচনী সংবাদ স্টুডিওতে পাঠানোর জন্য ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলো দলগুলোর প্রতিও আহবান জানায়।

রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণাকালে একটি রাজনৈতিক দল দেশের বিভিন্ন স্থানের ভোটারদের কাছে একই সময়ে একই বার্তা নিয়ে হাজির হয়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এ সুবিধাকে পুঁজি করে সংশিণ্টষ্ট কর্তৃপক্ষ রেডিও-টেলিভিশনের সম্প্রচার সময় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বিক্রিও করে। সেক্ষেত্রে আগ্রহী দলগুলো অর্থের বিনিময়ে তাদের নির্বাচনী-বার্তা রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেয়।[২১]

ভোট গণনা শুর" হলে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গুর"ত্ব বেড়ে যায়। সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও-টেলিভিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সবসময় প্রশ্ন দেখা দিলেও, নির্বাচনের ফলাফল দ্র"ত পাবার জন্য জনগণকে ওই মাধ্যম দুটোর ওপর বরাবরই নির্ভর করতে দেখা গেছে। জনগণের এই নির্ভরশীলতার কথা মাথায় রেখে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ঘন্টায় ঘন্টায় বিশেষ বুলেটিন প্রচার করে। পাশাপাশি রেডিও-টেলিভিশনের উচিত নির্বাচনী সন্ত্রাস, অনিয়ম ও যে কোনো গুর"ত্বপূর্ণ ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরা। উচিত সকল প্রার্থীই যাতে যথাযথ ট্রিটমেন্ট পান তা নিশ্চিত করা। নির্বাচনী বুলেটিনকে আরো আকর্ষনীয় করে তুলতে বিজয়ী, নিকটতম প্রার্থী বা অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত প্রার্থীর পরিচিতি বুলেটিনে তুলে ধরা যেতে পারে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বুলেটিনে পর্যাপ্ত দৃশ্যচিত্রও থাকা উচিত। নির্বাচনের পর ভোট গণনা চলাকালীন রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজের বিভিণ্ন স্ড়রের লোকজনের সাক্ষাতকার সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত (বা তথাকথিত স্বায়ত্বশাসিত) রেডিও-টেলিভিশনে কর্মরত সাংবাদিকদের সরকারি নীতির বাইরে স্বাধীনতভাবে কাজ করার সুযোগ অত্যন্ড় কম, বেসরকারি রেডিও-টেলিভিশনের সাংবাদিকদের ওপরও আছে নানামুখী চাপ। কিন্তু যেসব সাংবাদিক এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন, তারা চেষ্টা করলে তা করতে পারেন। নির্বাচনী খবরাখবরের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেন। সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুসারে নির্বাচনের বিভিন্ন খবরাখবরের ট্রিটমেন্ট সংবাদ মুল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত, এ নীতিতে অটল থাকাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

beg RvZxq msm‘ wbevPb ch‡e¶b

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষনের জন্য ব্যাপক সংখ্যক দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক নিয়োজিত থেকেছিল। পর্যবেক্ষকদের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী এবার প্রতিটি নিবাচর্ন কেন্দ্র (এবং প্রতিটি বুথে) পর্যবেক্ষক থাকে। নির্বাচন কমিশন ১৩৮টি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেয়।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন কমিশন ২০০৮ এর সেপ্টেম্বরে বেসরকারি সংস্থা ও পর্যবেক্ষকদের জন্য পর্যবেক্ষন নীতিমালা ও আচরণ বিধি প্রণয়ন করে।

---

[২১] Gain, Philip (ed.) 2006, Handbook on Election reporting (3rd Edition). SEHD.

এই নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আগ্রহী সংস্থাকে নির্বাচন কমিশনে তালিকাভূক্ত হতে হবে, যার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ড় বৈধ থাকবে। তালিকাভূক্ত সংস্থাসমূহকে এসময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কমিশন প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হতে হবে। বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে এবং কোনো একটি নির্বাচনী এলাকার সবগুলো ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণে সমর্থ হতে হবে। এই নীতিমালায় পর্যবেক্ষকদের যোগ্যতা বিষয়ে বলা হয়েছে-

ক) বাংলাদেশের নাগরিক হবে।

খ) বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর হবে এবং এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে হবে।

গ) নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

ঘ) নির্বাচন কমিশনে তালিকাভূক্ত সংস্থার মনোনীত হতে হবে।

ঙ) নির্বাচন কমিশনের ই-০৩ ফরমে উলিণ্ঢখিত পর্যবেক্ষকদের অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে হবে এবং পর্যবেক্ষকগণ আচরণবিধি ও অন্যান্য আইন মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

এছাড়া এই নীতিমালায় পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহের দায়িত্ব হিসেবে যা বলা আছে তারমধ্যে অন্যতম হলো নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করে রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দেয়া; সংস্থার মনোনীত পর্যবেক্ষকদের পরিচিতি ও তথ্য এবং কোন ভোটকেন্দ্রে নিযুক্ত হবেন তা এ পরিকল্পনার সাথে সংযোজন করা; সংস্থার মনোনীত পর্যবেক্ষকদের নির্বাচনী আইন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া; এবং নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষণ ফলাফল ও সুপারিশ (ই-০৪ ফরমে উলিণ্ঢখিত) নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া ইত্যাদি।

- একটি নির্বাচনী এলাকা বা একটি মেট্রোপলিটন থানা বা উপজেলা পর্যবেক্ষক নিয়োগের মূল ইউনিট বলে বিবেচিত হবে।
- নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য কেবল তালিকাভূক্ত সংস্থার মনোনীত পর্যবেক্ষকরা অনুমতি পাবে।
- পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ইউনিটে দুটির বেশি পর্যবেক্ষক সংস্থাকে দেয়া হবে না।
- একটি সংস্থা থেকে প্রতিটি বুথ এবং ভোট কেন্দ্রে একজন করে পর্যবেক্ষক থাকবে এবং ভোট গণনার সময় একজন এবং ফলাফল সমন্বয়ের সময় প্রতি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে একজন করে পর্যবেক্ষক থাকার অনুমোদন পাবে।
- এছাড়া প্রতিটি সংস্থা ভোটগ্রহণ চলাকালে ৫ সদস্যের একটি ভ্রাম্যমান দল পরিচালনা করতে পারবে।
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য রিটার্নিং অফিসার পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করবে। কোনো প্রার্থী যদি কোনো পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতা নিয়ে আপত্তি তোলে তবে রিটার্নিং অফিসার তা সংশিণ্ঢষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থাকে জানাবে এবং পর্যবেক্ষক পরিবর্তনের অনুরোধ করবে।
- পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র প্রদানের একমাত্র কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশন। রিটার্নিং অফিসারদের চাহিদা মোতাবেক কমিশন পরিচয়পত্র সরবরাহ করবে। পর্যবেক্ষণের সময় পর্যবেক্ষক সার্বক্ষণিকভাবে পরিচয়পত্র বহন ও প্রদর্শন করবে।

- নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা তাদের নিয়োগদাতা সংস্থা আয়োজিত আলোচনা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ করবে, যাতে তারা নির্বাচনী আইন ও বিধিমালা বুঝতে পারে এবং তারা সতর্কতার সাথে সংস্থার নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে।
- নির্বাচন পর্যবেক্ষনের সময় পর্যবেক্ষকরা ভোটারদের অধিকার ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনকে সম্মান করবে। কোনভাবেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্ড়ক্ষেপ করবে না।

সততা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা এবং নির্বাচন কর্মকর্তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যবেক্ষকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন করে নির্বাচন কমিশন। অনুমোদিত পর্যবেক্ষকরা নিচের আচরণবিধি অবশ্যই মেনে চলবে। যথা-

১. গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংবিধান, আইন এবং বিধিনিষেধ মেনে চলবে এবং অন্যদেরও এগুলো মেনে চলতে বলবে।
২. নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন কমিশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কাজের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে এবং নির্বাচন সংক্রান্ড় প্রশাসনিক কাজে বে-আইনি এবং অযাচিতভাবে হস্ড়ক্ষেপ করবে না।
৩. প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারের সম্মতি ছাড়া কোনো নির্বাচনী উপকরণ বা যন্ত্রপাতি স্পর্শ বা সরানো যাবে না।
৪. নির্বাচন পর্যবেক্ষনের যে কোনো পর্যায়ে কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে এবং কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো প্রার্থীর সম্পৃক্ততার পরিচয় প্রকাশ হতে পারে এমন কোনো কিছু প্রদর্শন করা যাবে না।
৫. কোনো দলের বা প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কিংবা বিরোধীতা প্রকাশ করে এমন কোনো নির্বাচনী উপকরণ কিংবা লেখা বহন, পরিধান, কিংবা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে হবে।
৬. নির্বাচন কমিশনের অথবা নির্বাচন কমিশনের অধীন কর্তৃপক্ষের আইনী নির্দেশসমূহ মেনে চলতে হবে। এরমধ্যে রয়েছে নির্বাচন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থানসমূহ যেমন, ভোটকেন্দ্র পরিত্যাগ করা সংক্রান্ড় বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার বা নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কারো নির্দেশ মেনে চলা।
৭. কোনো রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, এজেন্ট এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ বা গ্রহণের চেষ্টা এবং কোনো ধরনের সহানুভূতি বা সম্মতি আদায়ের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৮. নির্বাচন সংক্রান্ড় কোনো অনিয়মের বিষয়ে নির্বাচন কর্মকর্তাকে অবহিত করা যাবে কিন্তু নির্বাচন কর্মকর্তার সিদ্ধান্ড়ের পরিপন্থি কোনো উপদেশ প্রদান করা যাবে না।
৯. নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী দলগুলোর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি আসার আগে জনগণ, প্রার্থী, রাজনৈতিক দল এবং গণমাধ্যমের সামনে পর্যবেক্ষণ কিংবা ফলাফল বিষয়ে ব্যক্তিগত মন্ড়ব্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ তথ্যের অতিরিক্ত কিছু বলা যাবে না।

নির্বাচন পর্যবেক্ষনে দেশের ভেতরে সবচেয়ে বড় যে সংস্থাটি কাজ করছে সেটি হলো ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্র"প (ইডবিণ্টউজি)। মোট ৩৪টি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এ সংস্থাটি। আর আন্ডর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হলো ওয়াশিংটন ভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট (এনডিআই), ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ওয়াশিংটনভিত্তিক আরেকটি সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট (আইআরআই), জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকবৃন্দ, কমনওয়েলথ জাপানী এবং আস্ট্রেলিয়ার পর্যবেক্ষক দল।[২২]

‡'kxq ch‡e¶K ms¯'v (B‡jKkb IqwKs M"c (BWweDwR)Ô i fwgKv

২০০৭ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষনের জন্য বাংলাদেশের ৩৪টি মানবাধিকার এবং উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্র"প (ইডবিণ্টউজি)। আন্ডর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের একটি কোয়ালিশনের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে ইডবিণ্টউজি। এই কোয়ালিশনের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছে এশিয়া ফাউন্ডেশন। উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে রয়েছে কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), ডিএফআইডি, ডেনমার্ক দূতাবাস, নরওয়ে দূতাবাস এবং অস্ট্রেলিয়া এইড। ইডবিণ্টউজি তিনটি স্ড়রে তাদের কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে। সেগুলো হলো-

১। দেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, অর্থাৎ নির্বাচন পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে পর্যবেক্ষণ এবং নির্বাচনের দিন প্রতিটি বুথে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা;

২। দেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার ভোটার এবং নাগরিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ এবং

৩। নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারে অ্যাডভোকেসি।

ইডবিণ্টউজি সদস্য সংগঠনগুলোর ১ লক্ষ ৬৫ হাজার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক, ৩ হাজার ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক দেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণের কাজ করেছে। এই নির্বাচনে প্রতিটি বুথে একজন করে পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে ইউবিণ্টউজি। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের এই জটিল কাজটি ব্যবস্থাপনার জন্য দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি ইউনিয়নের একজন করে সমন্বয়কারী ছিল। বুথের সংখ্যা বেড়ে গেলে ইডবিণ্টউজির সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যাও বেড়ে যায়।

নির্বাচন ও দেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারণের ধারণা ও মতামত বিষয়ে ইউবিণ্টউজি ২০০৭ সালের ফেব্র"য়ারি থেকে ২০০৮-এর নভেম্বর পর্যন্ড় ২০টি পারসেপশন স্টাডি করেছে। এছাড়া এর ভোটার সচেতনতা কর্মসূচিও রয়েছে। ইউবিণ্টউজি এ যাবত ৭টি ম্যানুয়াল তৈরি করেছে। এগুলো হলো: ১। নির্বাচনী সহিংসতা প্রতিরোধ ম্যানুয়াল; ২। গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব এবং দায়বদ্ধতা নির্দেশিকা; ৩। যুব ভোটার (প্রথমবারের মত ভোটার হয়েছেন এমন) সচেতনতা নির্দেশিকা; ৪। নির্বাচনী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে নির্দেশিকা; ৫। জাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্বাচনী অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশিকা; ৬। শারীরিকভাবে অসামর্থ ব্যক্তিদের নির্বাচনী অধিকার বিষয়ক নির্দেশিকা এবং ৭। পুলিশ নির্দেশিকা।

[২২] তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫,পৃ.৩১-৩৩।

ইউবিণ্ঢউজি'র সদস্য সংগঠন 'অধিকার' এর ভূমিকা-

AwaKvi

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে। মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং এর বির"দ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে অধিকার।

অধিকার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণে বিশ্বাস করে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের ভোটাধিকারের প্রয়োজন রয়েছে-এমন ধারণাকে জনপ্রিয় করতে অধিকার সক্রিয়। ভোটারদের সচেতন করে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রচার চালায় অধিকার।

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্র"পের সদস্য হিসাবে অধিকার ২০০৭ সালে সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রস্তুতি নেয়। নির্বাচনের দিন ৪০টি জেলার ৬০টি সংসদীয় আসনে ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষনের কাজ করে অধিকার। এতে নিয়োজিত থাকে প্রায় ৬০০ জন পর্যবেক্ষক। নির্বাচনের ১৫দিন আগে থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ড় তারা পর্যবেক্ষণ করে। এছাড়া অধিকার ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এভার (ইলেকশন, ভায়োলেন্স, এডুকেশন অ্যান্ড রিসলিউশন) নামের প্রকল্পের আওতায় সহিংসতা পর্যবেক্ষণের কাজ করে। এ কাজটি চলে ডিসেম্বর, ২০০৭ পর্যন্ড়। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ১৫ দিন আগে থেকে অধিকার এভার প্রকল্পের কাজ আবার শুর" করে। এশিয়া ফাইন্ডেশন এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেকশন সিস্টেম (আইএফইএস)-এর সহযোগিতায় অধিকারের এ কাজটি পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া মাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, ডেমোক্রেসি ওয়াচসহ বেশকিছু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ১৯৯১ ও ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করে।

‡dgv

২০০৮-এর নির্বাচনে এককভাবে ৭০টি আসনে দেড় মাসব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি আসনে দুইজন করে পর্যবেক্ষক থাকে। নির্বাচনের দিন ফেমার ৭ হাজার পর্যবেক্ষকও আসনগুলোতে দায়িত্ব পালন করে। পাশাপাশি ইডবিণ্ঢউজি'র সদস্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেমা ৫৩টি আসনেও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। এতে প্রায় ১২ হাজার পর্যবেক্ষক থাকে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ফেমার ভ্রাম্যমান দলও কাজ করে।

5.7 wbevPb cieZx mg‡q MYgva¨‡gi fwgKv

ক্ষুদ্র কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সকল সময়েই গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তবে এই অবস্থান গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট দলের দৃষ্টিকোণ থেকে নেয়া হয়। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র এবং কিছু কিছু টিভি চ্যানেলের ক্ষেত্রে বিনা দ্বিধায় বলে দেয়া সম্ভব যে, তারা কোন নির্দিষ্ট দলের পক্ষে রয়েছে। উন্নত বিশ্বের সংবাদপত্রও কোন কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই সমর্থন যতো না দলের পক্ষে তার চেয়ে বেশী দলের কিছু নীতি ও আদর্শের পক্ষে। ফলে নীতি বা আদর্শ বিরোধী অবস্থান নিলে সংবাদপত্র ও তার সমর্থিত দলের বির"দ্ধে সংবাদভাষ্য এমনকি প্রতিবেদনও প্রকাশ করে থাকে। বাংলাদেশে এটি বিরল। নির্দিষ্টভাবে বললে বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রের মধ্যে নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনকালীন সময়ে যেসব পক্ষপাতিত্বের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে তা হচ্ছে -

- পছন্দনীয় দলের অতীত বা বর্তমান ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রতিবেদন কম ছাপানো বা কম গুর"ত্ব দিয়ে ছাপানো এবং অপছন্দনীয় দলের ব্যর্থতা বড় করে দেখানো ।
- সমর্থিত দলের জনসভার ছবি এবং বিবরণ ঘটা করে ছাপানো এবং অন্য দলের ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থান গ্রহণ।
- সম্পাদকীয় পাতায় নির্দিষ্ট দলের লেখকদের লেখা ছাপানো এবং বিরোধীদের লেখা নির"ৎসাহিতকরণ।
- সমর্থিত দলের পক্ষের রাজনীতিবিদগণ আইনজীবী বা নাগরিক সামাজের নামী ব্যক্তিত্ব হলে তাদের রাজনৈতিক পরিচয়কে আড়াল করে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাদের মতামত গ্রহণ করে কোন বিষয়ে প্রচারনা চালানো।
- বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ করার চেয়ে পক্ষের লোকদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে, বিশেষ বিশেষ উদ্ধৃতি হাইলাইট করে প্রতিদিন নির্দিষ্ট স্থানে ছাপিয়ে এবং অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রতিদিন ওয়েবভিত্তিক জনমত জরিপ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে জনমত প্রভাবিত করার চেষ্টা।
- গুর"ত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্নে পছন্দনীয় বক্তব্য প্রদান করবে শুধুমাত্র এমন বিশেষজ্ঞদের মতামত অতিরিক্ত গুর"ত্ব দিয়ে ছাপানো।
- নির্বাচনে সাফল্যের সম্ভাবনার ওপর প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন।
- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর সমর্থিত দল পরাজিত হলে, বিজয়ী দলের বিপক্ষে অতিরঞ্জিত প্রতিবেদন ছাপানো।
- গণমাধ্যমের মালিকদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং কখনো কখনো বিশেষ কিছু এনজিও-র সঙ্গে জোটবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ গনতন্ত্র বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে আরো প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। এনজিও, বিদেশী কোম্পানী, বহুজাতিক সংস্থারা পুরস্কার প্রদান ও বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ এবং বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা প্রদান করে কোন কোন সাংবাদিকদের মধ্যে অনুগত শ্রেণী গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়, এটিও সাংবাদিকদের দায়িত্বশীলতাকে ব্যহত করে।

wbevP‡bi djvdj

২৯ ডিসেম্বর, এদিন বহু প্রতীক্ষিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে এদেশের জনগণ, ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী তথা সাধারণ জনগণও মনে করেন যে, এই নির্বাচন হয়েছে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য। নির্বাচনের পূর্বে প্রচারকাজে নিয়োজিত মাইকের হর্ন মানুষকে কষ্ট দেয়নি, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটেনি। এক কথায় সমগ্র নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল গোছানো, সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ভোটাররা এবারে নির্ভয়ে ভোট দিতে পেরেছেন এবং নির্বাচন পরবর্তী দখল ও সন্ত্রাসী ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। এক কথায়, এই নির্বাচন ছিল এদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে মাইলফলক। [২৩]

[২৩] দৈনিক প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি, ২০০৯

সারণি ৫.৫ : ‡RvU I ‘ j Iqvix djvdj (300wU Avmb)

‡RvU I ‘‡j i bvg	cvß Avmb
মহাজোট = প্রাপ্ত আসন	২৬২
আওয়ামী লীগ	২৩০
জাতীয় পার্টি	২৭
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৩
ওয়ার্কার্স পার্টি	২
Pvi ‘ jxq †RvU = cvß Avmb	৩৩
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৯+১=৩০
জামায়াতে ইসলামী	২
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	১
Ab¨vb¨ cvß Avmb =	০৫
স্বতন্ত্র	৪
এলডিপি	১
‡gvU	300

উৎস : দৈনিক জনকণ্ঠ ৩০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮

wefvM Iqvix Ges ‘ jwfwËK wbevPbx djvdj

‘ jmgn	ewikvj	PUMvg	XvKv	ivRkvnx	Ljbv	wm‡jU	‡gvU
gnv‡RvU আওয়ামী লীগ	১৬	৩২	৮৭	৪৮	৩০	১৭	২৩০
জাতীয় পার্টি	২	২	৫	১৪	২	২	২৭
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-	-	১	১	-	-	২
ওয়ার্কার্স পার্টি	-	২	-	-	-	-	২
‡gvU	-	-	-	-	-	-	261
Pvi ‘ jxq HK¨‡RvU বিএনপি	২	১৭	-	৮	-	-	৩০
জামায়াতে ইসলামী	-	২	-	-	-	-	২
বিজেপি	১	-	-	-	-	-	১
‡gvU	-	-	-	-	-	-	33
অন্যান্য দল/স্বতন্ত্র	-	২	১	১	১	-	৫
‡gvU	21	57	94	72	36	19	300

দৈনিক সংবাদ, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সংসদের তিন-চর্তুথাংশ আসনে বিজয়ী হয়। এমন অভাবনীয় ফলাফল বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই বিরল। ১৯৭৩ সালের পর এটি আওয়ামী লীগের জন্য এক ঐতিহাসিক বিজয়। আর চরম ভরাডুবি হয় বিগত সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল বিএনপির। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন ভরাডুবি আর কখনও কোন শাসক দলের হয়নি। আওয়ামী লীগ জনরায়ে সংসদের তিনশ আসনের মধ্যে এককভাবে ২৩০ টি আসন পেয়ে বিজয়ী হয়। আর জোটগতভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬২ টি আসনে বিজয়ী হয়। গত নির্বাচনে জোটগতভাবে ২১৬ টি আসনে বিজয়ী বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট এবার পেয়েছে মাত্র ৩০ টি আসন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় নেতা বিজয়ী হয়েছেন। একইভাবে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের প্রায় সব মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদসহ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করেন।

আওয়ামী লীগের এ ঐতিহাসিক বিজয়ে তিনটি আসন থেকে বিজয়ী হয়েছেন মহাজোট নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি গোপালগঞ্জ-৩, বাগেরহাট-১ ও রংপুর ৬ আসন থেকে বিজয়ী হয়েছেন। একই সঙ্গে এ জোটের বড় মাপের নেতা-নেত্রীদের একমাত্র রওশন এরশাদ ছাড়া অন্য কেউ পরাজিত হননি। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ. এম. এরশাদ রংপুর-৩, কুড়িগ্রাম-২, ও ঢাকা-১৭ আসন থেকে বিজয়ী হন। একই ভাবে বিএনপি'র চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়াও মোট ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩ টি আসনেই জয়লাভ করেন। নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়। কমিশনের প্রাথমিক হিসেবে ৮০ শতাংশের বেশী মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ২৯৭টি আসনে বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী মাহাজোটের শরিক দল জাতীয় পার্টি (এ) ২৭, জাসদ ৩, ওয়ার্কার্স পার্টি ২টি আসনে, অলি আহমেদ একটি আসনে বিজয়ী হয়েছেন। নোয়াখালী ৩ আসনের ফলাফল কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেছে দেশের সব বিভাগেই একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ আসনে বিজয়ী হয়। ঢাকা বিভাগে আওয়ামী লীগ ৮৭ টি আসনে, চট্রগ্রাম বিভাগ ১৬, রাজশাহী বিভাগে ৪৮, খুলনা বিভাগে ৩০ এবং সিলেট বিভাগে ১৭ আসনে বিজয়ী হয়েছে। বিএনপি ঢাকা ও সিলেট বিভাগে কোনো আসনে বিজয়ী হতে পারেনি। দলটি চট্রগ্রাম বিভাগে ১৫, রাজশাহীতে ৮, বরিশালে ২ ও খুলনা বিভাগে ২টি আসন পায়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তিনশ আসনের মধ্যে ২৯৩ আসনে বিজয়ী হয়। দীর্ঘকাল ক্ষমতার বাইরে থাকার পর ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে সরকার গঠন করতে সক্ষম হলেও নিরস্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। দেশের ইতিহাসে এবার কোনো শাসক দলের এমন বিপর্যস্থ কখনও ঘটেনি। সবচেয়ে বেশী সময় ধরে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় থাকা বিএনপির বিপর্যয়ের দিক দিয়ে ১৯৮৮ সালের শাসক দল জাতীয় পার্টি ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ৩৫টি আসনে বিজয়ের চেয়েও খারাপ ফলাফল করে।

বিএনপির মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের অধিকাংশরই ভরাডুবি হয়েছে। সংসদের স্পীকার জমির উদ্দিন সরকার, বিএনপি মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, জামায়াত আমীর মতিউর রহমান নিজামী, মহাসচিব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, ইসলামী ঐক্যজোটের প্রধান মুফতি ফজলুল হক আমিনীসহ পরাজয়ের তালিকায় রয়েছেন অধিকাংশ মন্ত্রী, এমপি ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। তবে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তিনটিতেই জয়লাভ করেন।

যদিও এই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে এবং এতে জনগণের রায়ের প্রতিফলন ঘটেছে কিন্তু এও সত্য যে, এই নির্বাচন একটি দুর্বল বিরোধী দল উপহার দিয়েছে। এটা ক্ষমতাসীন দল সংসদে তার একক প্রভাব বিস্ড়্যর করার সম্ভবনা থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকে অনেক দায়িত্বশীল হতে হবে।[২৪]

5.8 wbe©vPb m¤ú‡K© †÷K‡nvìvi‡`i fywgKv I cÖwZwµqv

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে নানা রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয়। নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ করে এবং দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানায় নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জয়ী করার জন্য।

অন্যদিকে বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে পরাজিত দলের মন্ড়ব্য বিপরীতমুখী। নবম সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট নির্বাচনের ফলাফল মানতে চায় না, তারা এ নির্বাচনকে প্রহসণমূলক এবং ষড়যন্ত্রের নির্বাচন হিসেবে উলেণ্টখ্য করে। বিরোধী দল নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখান করে এবং মন্ড়ব্য করে নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর বিজয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানি প্রতিনিধি দল, ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট, জাতিসংঘের বিদায়ী মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে গণতন্ত্রের জন্য এক মাইলফলক হিসেবে মনে করেন।

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার প্রধান ও সাংবিধানিক দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ড়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান কোনোভাবেই একক ও বিচ্ছিন্নভাবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে না। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাথে নির্বাচন কমিশন ছাড়াও বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত নাগরিক সমাজ, নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা, সংবাদ-মাধ্যম ও সর্বোপরি জনগণ। এদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে সক্রিয় অবদান রাখে।[২৫]

ZËveavqK miKv‡ii GLwZqvi ewnfZ AvPiY

হাইকোর্ট ২২ মে ২০০৮ তারিখে নির্বাচন কমিশন সর্বশেষ সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান না করে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে বলে রায় দেয়, এবং একই রায়ে নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নির্বাচন কমিশন থেকে ঘোষণা না হয়ে প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে কেন দেয়া হয়েছে

[২৪] বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡`‡ki mvaviY wbevPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.১৭০-১৭১।

[২৫] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের ওপর একটি পর্যবেক্ষনমূলক বিশেণ্টষণ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩১।

বলে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। তবে এই রায়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ২০০৮ এর ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ড়কে স্বাগত জানানো হয়।

wbevPb Kwgkb

নবম সংসদ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশন কৃতিত্বের দাবিদার। তবে এই নির্বাচন আয়োজন করতে গিয়ে সাফল্যের পাশাপাশি কিছু ব্যর্থতাও লক্ষ করা যায়। যেমন-

BwZevPK fwgKv

me ivR‰bwZK ‘‡ji AskMnY wbwðZ Kivi Rb¨ m‡ev”P c‡Póv

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এর জন্য একাধিকবার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করা হয়। প্রথমবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তফসিল ঘোষণা করেন ২০০৮ এর ২০ সেপ্টেম্বর। রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচন না করার দাবি জানায়, এবং এই তফসিল অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ১৮ ডিসেম্বর এবং উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ৩ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। এই তফসিল অনুযায়ী ১৮ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচন বহাল থাকলেও উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পিছিয়ে ২৮ ডিসেম্বর নির্ধারিত হয়। তৃতীয়বার ২৩ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে আবার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়। এই তফসিল অনুযায়ী সংসদ নির্বাচন ২৯ ডিসেম্বর এবং উপজেলা নির্বাচন ২০০৯ এর ২২ জানুয়ারি নির্ধারিত হয়।

wbevPbx c¯wZ mgqgZ m¤úb Kiv

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের জন্য প্রযোজ্য নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়ন, ভোটার তালিকা ছাপানো, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সরবরাহ, দল ও প্রার্থীর জন্য প্রতীক বরাদ্দ ইত্যাদি কাজ সময়মত সম্পাদন করে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক দর-কষাকষি করলেও নির্বাচন কমিশনের কঠোর ও পেশাদারি মনোভাবের কারণে শেষ পর্যন্ড় দলগুলো নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হয় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া মনোনয়ন চূড়ান্ড় হওয়ার পরও ১১৯ জন প্রার্থী আদালতে দ্বারস্থ হয়ে প্রার্থিতা ফিরে পায় এবং নির্বাচন কমিশনকে সেজন্য প্রার্থী তালিকা ও ব্যালট পেপার পরিবর্তন করতে হয়।

hvPvB-evQvB K‡i wbevP‡b A‡hvM¨ cv_x‡`i g‡bvbqbcÎ evwZj

মনোনয়নপত্র দাখিলের পর যাচাই-বাছাই এবং নির্বাচনে অযোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল করতে নির্বাচন কমিশন সক্ষম হয়। যেসব কারণে নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে জরুরি বিধিমালার আওতায় দায়ের করা মামলায় দুই বছরের বেশি দন্ডপ্রাপ্ত হওয়া, ঋণ ও বিল খেলাপি হওয়া, সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর কমপক্ষে তিন বছর অতিবাহিত না হওয়া, কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কমপক্ষে ৫ বছর অতিবাহিত না হওয়া ইত্যাদি। হলফনামায়

দেয়া তথ্য যাচাই বাছাই করার জন্য এবং আচরণ বিধি প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা তদারকি করার জন্য প্রতি জেলায় দুইজন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

AvPiYwewa j•N‡bi Rb¨ e¨e¯v MnY

নির্বাচন আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নির্বাচনে আচরণ বিধি লঙ্গনের জন্য বা রাজনৈতিক সংশিণ্ঢষ্টতার অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন আটক করে বা অব্যাহতি প্রদান করে, এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রেফতার করে বিচার প্রক্রিয়ার মুখোমুখি করে। এছাড়াও নির্বাচন পর্যবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বির"দ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়ায় তদন্ড় করে তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া।

‡bwZevPK fwgKv ev e¨_Zv

Am¤úY †fvUvi ZwjKvi Kvi‡Y †fvU w‘‡Z bv cviv

ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় সারাদেশে ৭২,২৭৫ ব্যক্তি ভোট দিতে পারেনি। ছবি তুলেছে ও ফরম পূরণ করেছে মোট ৮,১১,৩০,৯৭৩ জন কিন্তু চূড়ান্ড় ভোটার তালিকায় নাম এসেছে ৮,১০,৫৮৬৯৮ জনের। এছাড়াও কিছু কিছু কেন্দ্রে ভোট ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি থাকার কারণে ভোটারদের ভোট কক্ষ খুঁজে পেতে সমস্যা হয়।

wbevPb msµvš AvBb mevi †¶‡Î mgvbfv‡e c‡qvM Kivq e¨_Zv

স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচনী বিধিমালা ও নির্বাচন সংক্রান্ড় অন্যান্য বিদ্যমান আইন সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। মনোনয়নপত্রের সাথে প্রার্থীদের আট ধরণের তথ্য দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও কয়েকজন প্রার্থী কয়েকটি তথ্য না দেয়ার পরও নির্বাচন কমিশন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কয়েকটি আসনে হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। হলফনামায় দেয়া তথ্য লিফলেট ছাপিয়ে প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল নির্বাচন কমিশনের তবে এটিও তারা করতে পারেনি।

কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় নির্বাচন কমিশন আচরণ বিধি ভঙ্গকারী প্রার্থীকে সতর্ক করেছে, আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি। নির্বাচন কমিশনে ২৪ জন প্রার্থীর বির"দ্ধে সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি ভঙ্গের প্রমাণসহ তদন্ড় প্রতিবেদন দেয়া হয়। তথ্য গোপন, আচরণ বিধি ভঙ্গ ও বৈধ প্রার্থী যাচাইয়ে আরপিও'র ১২ ধারা অনুযায়ী চারজন প্রার্থীর বির"দ্ধে তদন্ড়ের নির্দেশ দেয় কমিশন। হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগে পাঁচ জন প্রার্থীর বির"দ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। এবারের নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনকে প্রার্থীতা বাতিল করার ক্ষমতা দেয়া হলেও এই ধারা এবারের নির্বাচনে প্রয়োগ করা হবে না বলে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দেয়।

m‡ev"P e¨qmxgv wbqšY Kivq e¨_Zv

নির্বাচনী আইনে প্রচারণার জন্য প্রার্থী প্রতি একেকটি আসনের জন্য সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হলেও এই আইন প্রয়োগে নির্বাচন কমিশন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।

ivR‰bwZK ‘j

ivR‰bwZK ‘j¸‡jvi e¨‡qi wiUvb ‘wLj

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই প্রথম অংশগ্রহণকারী প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনে দাখিল করে। এটি আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

wewfb ivR‰bwZK ms¯’v‡ii we‡ivaxZv Ges ‘jxq Ae¯’vb evievi cwieZb

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী আলোচনায় নির্বাচন কমিশনের প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতার বিরোধিতা করেনি, যার ভিত্তিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশোধিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনকে এই ক্ষমতা প্রদানের বিরোধীতা করে। রাজনৈতিক দলগুলো এর বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ে কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তেড়র বিরোধীতা করে, যেমন দল নিবন্ধনের বিভিন্ন শর্ত মেনে দলীয় সংবিধান সংশোধন করা। পরবর্তীতে দলগুলো নিবন্ধনের কিছু কিছু শর্ত তাদের সংশোধিত সংবিধানে অগ্রাহ্য করে, ঋণ ও বিল খেলাপ সংক্রান্ড় ধারা শিথিল করার দাবি জানায়, জাতীয় নির্বাচনের পরে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি অব্যাহত রাখে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণে সময় ক্ষেপণ করে, সব দলের জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরি হয়নি বলে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আপত্তি জানায়, সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বাতিলের দাবি জানায়, এবং নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ড় গেজেট চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে।

এসব বিবিধ কারণে নির্বাচন কমিশন কয়েকবার নির্বাচন পেছাতে বাধ্য হয়, এবং মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখ পরিবর্তন করে। এর ফলে নির্বাচনের দিনের তিন সপ্তাহের আগে নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ড় যে বিধিনিষেধ আছে তা লঙ্গিত হয়, অর্থাৎ নির্বাচনে প্রার্থীরা ২৯ ডিসেম্বর এর আগে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য তিন সপ্তাহ সময় পায়নি। তবে বিভিন্ন পর্যায়ে বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ড় সবগুলো প্রধান দলই নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি দল রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য কোনো কোনো শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

weZwKZ e¨w³‡‘i g‡bvbqb c‘vb

রাজনৈতিক দলগুলো যেসব প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয় তাদের একটি বড় অংশের বির"দ্ধে ফৌজদারি মামলা, ঋণ ও বিল খেলাপ, আয়কর ফাঁকি ইত্যাদির অভিযোগ ছিল। দেশের রাজনীতি থেকে দূর্বৃত্তদের সরানোর জন্য যে দাবি জনগণের পক্ষ থেকে ছিল তার প্রতি রাজনৈতিক দলগুলো এভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

‘jxq fv‡e wbevPbx AvBb j•Nb

দলীয়ভাবে কোনো কোনো নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করা হয়, যেমন প্রধান দুইটি জোটই রাস্ড়া অবরোধ করে জনসমাবেশ করে। প্রধান দুইিটি জোটের নির্বাচনী প্রচারণা শুর" হয় সিলেট থেকে যা প্রচারণায় ধর্মের অপব্যবহার হয়েছে বলে গন্য করা যায়। প্রধান দুই জোটের বির"দ্ধেই নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তোলে অন্যান্য দল।

cv_x

নমব সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের ভূমিকা ছিল লক্ষনীয়। তবে ইতিবাচক ভূমিকা দৃশ্যমান থাকলেও তার আড়ালে কিছু নেতিবাচক ভূমিকাও গুর"ত্বপূর্ণ ছিল।

cv_xi BwZevPK fwgKv

AvPiY wewa †g‡b Pjv

এবারের নির্বাচনে প্রার্থীদের আচরণবিধি মেনে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাদাকালো পোস্টার ছাপানো ও নিয়মমাফিক প্রদর্শন, নির্ধারিত আকারে নির্বাচনী প্রতীক প্রদর্শন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টারের ক্ষতি সাধন না করা, দেয়াল লিখন না করা, জনগণের ব্যবহৃত রাস্ড়া বা সড়কে সভা না করা, তোরণ নির্মাণ না করা, নির্বাচন পূর্ব সন্ত্রাসে জড়িত না হওয়া, বিশাল শো-ডাইন না করা ইত্যাদি নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

mnbkxj ivR%bwZK AvPiY

এবারে নির্বাচনে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রার্থীরা তাদের নিবার্চনী সভা শান্ড়িপূর্ণভাবে আয়োজন করে। এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সহযোগিতা প্রদান করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।

cv_x‡'i †bwZevPK fwgKv

wbevPbx AvBb I AvPiY wewa j•Nb

প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে-

- njdbvgvq Z_¨ bv ‡'qv t মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে আট তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক প্রার্থী সব তথ্য দেয়নি।
- wbawiZ e¨qmxgvi †ewk e¨q t প্রার্থীদের বেশিরভাগই নির্বাচনী ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করে, যদিও নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যেই ব্যয় দেখিয়েছে।
- cPviYvq AvPiY wewa j•Nb t কয়েকটি আসনে কয়েকজন প্রার্থী প্রচারণা করতে গিয়ে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে। এর মধ্যে বিভিন্ন স্থাপনা, যানবাহন, গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটিতে পোষ্টার সাটানো, ভোট কেনা, (২টি আসনে), সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয়-ভীতি দেখানো, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বির"দ্ধে অপপ্রচার, গাড়ি, মাইক্রোবাস ও মোটর সাইকেল ব্যবহার করে শোভাযাত্রা ও মনোনয়ন পাওয়ার পর আনন্দ মিছিল, অনুমোদিত সময় ও সংখ্যার অতিরিক্ত মাইকের ব্যবহার, ব্যানার ও ফেস্টুন ব্যবহার, নির্বাচনী প্রচারণায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশুদের ব্যবহার উলেণ্ঢখ্যযোগ্য।
- 'k¨gvb e¨‡qi evB‡i e¨q t দৃশ্যমান ব্যয়ের বাইরেও প্রার্থীরা মনোনয়ন কেনা, ভোট কেনা, প্রশাসনকে প্রভাবিত করা ইত্যাদির জন্য অর্থ ব্যয় করে।
- wbevPbx e¨‡qi wiUvb 'wLj bv Kiv t নির্বাচনের পরে এক মাসের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক প্রার্থী এই হিসাব সময়মত দাখিল করেনি।

bvMwiK mgvR

ivR‰bwZK ms¯‥…wZi c‡¶ cPviYv

নাগরিক সমাজ ও এর অন্দর্ভুক্ত বিভিন্ন বেসামরিক সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনী আইনে পরিবর্তন আনার পক্ষে দাবি জানিয়ে আসছে এবং এজন্য প্রচারণা চালাচ্ছে। নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত হয় এবং নতুন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইন সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়। এই প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংস্থা ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে অবদান রাখে। দেখা যায় নাগরিক সমাজের প্রস্ড়াবিত গুর"ত্বপূর্ণ পরামর্শের বেশিরভাগই সংশোধিত আইনে অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতা নির্ধারণ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ও এ সংক্রান্ড় বিভিন্ন পূর্বশর্ত, নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা পুনঃনির্ধারণ, এবং প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা প্রদান ।

mr I †hvM¨ cv_©‡'i c‡¶ cPviYv

নবম সংসদ নির্বাচনের প্রচারণায় টিআইবিসহ নাগরিক সমাজের কয়েকটি সংস্থা বিভিন্ন আসনে প্রার্থীদের এক মঞ্চে জনগণের মুখোমুখি করে, এবং প্রার্থীরাও এই প্রক্রিয়ায় সাড়া দেয়। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করার জন্য এসব সংস্থা ব্যাপক প্রচারণা চালায়। এছাড়াও কিছু কিছু সংগঠন এই নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধীদের বিপক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করে।

msev'-gva¨g

BwZevPK f~wgKv

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অন্য যেকোনো নির্বাচনের তুলনায় ব্যাপকভাবে ভিন্ন এবং ইতিবাচক। এবারই দেখা যায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দলীয় ও প্রার্থীর প্রচারণা সংক্রান্ড় গতানুগতিক সংবাদ প্রচারের ধারার বাইরে গিয়ে প্রার্থীদের হলফনামায় দেয়া তথ্য বিশেণ্ডষণ ও প্রকাশ করা হয়। এসব তথ্যের মধ্যে ছিল প্রার্থীদের আয়-ব্যয়, সম্পদের হিসাব, ফৌজদারি মামলার ধরণ ও বর্ণনা, ঋণ, কর ও বিল খেলাপ সংক্রান্ড় তথ্য, যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ড় তথ্য, নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ এবং এর ওপর বিশেণ্ডষন, মন্ড়ব্য প্রতিবেদন, বিশেষ ক্রোড়পত্র, প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, এবং আসনগুলোর ওপর মৌলিক তথ্য প্রকাশ করা হয় যা সংগ্রহে রাখার মতো। এর সাথে সাথে বিভিন্ন আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি পর্যবেক্ষণ করে সচিত্র তথ্য প্রকাশ করা হয়। এই ধরণের তথ্য প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশন কয়েকজন প্রার্থীর বির"দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে যার মধ্যে উঁচু পর্যায়ের রাজনীতিকরাও ছিলেন।

প্রায় প্রতিটি বেসরকারি চ্যানেলেই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টক শো প্রচারিত হয় যা ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

‡bwZevPK f~wgKv

ইতিবাচক ভূমিকার পাশাপাশি সংবাদ-মাধ্যমের কিছু ব্যর্থতাও ছিল। যুদ্ধাপরাধীদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি প্রমাণিত দুর্নীতি পরায়ণ প্রার্থীদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশে সংবাদ-মাধ্যমগুলো

যথেষ্ট গুর"ত্ব দেয়নি। নির্বাচনের আগে এবং পরে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ওপর সংবাদ প্রচারে কয়েকটি বেসরকারি চ্যানেল রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন করে।[২৬]

5.8.1 beg msm‘ wbewPb I MYZšvqY

গণতন্ত্র হল জনগনের সম্মতির শাসন, আর এটি একটি নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থা। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনার কতগুলো নিয়ম বা পদ্ধতি থাকে। একই সঙ্গে পদ্ধতি থাকে শাসকদের দায়বদ্ধ করার। বস্তুত গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে নিয়ম তান্ত্রিকতা অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক শাসনে সুস্পষ্ট র"লস অব এনগেজমেন্ট বা সম্পৃক্ততার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। আর এ সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। তাই নির্বাচন হল গণতান্ত্রিক প্রথম নিয়ম বা ধাপ। বস্তুত নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ড়িক যাত্রাপথের সূচনা হয়।

তবে নির্বাচন হলেই গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয় না। নির্বাচন হতে হয় সুষ্ঠু ও শান্ড়িপূর্ন। নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্ড়িপূর্ন হলে সব যোগ্য ভোটার সব ধরণের ভয় ভীতির উর্ধ্বে উঠে বিনা দ্বিধায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নির্বাচনকে হতে হয় নিরপেক্ষ যাতে দলমত নির্বিশেষে সব প্রার্থীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে এবং নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না থাকে। এছাড়াও নির্বাচন হতে হয় অর্থবহ। অর্থবহ নির্বাচনের মাধ্যমেই সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্ড়িপূর্ন ও নিরপেক্ষ হলেও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় না, যদি নির্বাচনের মাধ্যমে সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, স্বার্থান্বেষী ও অযোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে আসে। অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুনগত মানের ওপর গণতান্ত্রিক শাসন বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সেদিক থেকে বিচার করলে ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে এক মাইফলক। ২০০৬ সালের জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ড় যে জটিলতা বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে প্রভাব বিস্ড়ার করে যা গোটা সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসনসহ সর্বত্র ঝাঁকুনি দেয় তা রোধ করে স্থিতিশীল রাজনীতি ও নির্বাচনের দিকে ধাবিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

নবম সংসদ নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের নির্বাচনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য। এ নির্বাচনে সাধারণ জনগণের মধ্যে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে তেমনি জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রাও ছিল পূর্বের নির্বাচনগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। নবম সংসদ নির্বাচনে প্রায় ৮০% ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এ নির্বাচনকে বিদেশি এবং দেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে মন্ড়ব্য করেন। তাঁরা বলেন, ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে এক মাইলফলক, যা দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে সহায়ক হবে।

---

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

5.9 Dcmsnvi

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনকালে রাষ্ট্রীয় নির্বাহী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারই বলা হয়। কারণ এ সরকারটি সংবিধানের ৫৮(গ) অনুচ্ছেদের আওতায় শপথ নিয়েছিল। কিন্তু একজন প্রধান উপদেষ্টা ও ১০ জন উপদেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যই এ নির্বাহী কর্তৃপক্ষটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে বিবেচিত হতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় নীতি সংশিণ্টষ্ট নতুন সিদ্ধান্ড় গ্রহণ এবং চলমান রাষ্ট্রীয় নীতি বদলে দেয়ার মত প্রচুর সিদ্ধান্ড় এ সরকার গ্রহণ করেছে, যা সংবিধানে নির্দিষ্টভাবে বারণ করা হয়েছে। রেকর্ড পরিমাণ দীর্ঘ সময় দেশে জর"রী অবস্থা জারি রেখে এ সরকার আরও অনেক কাজ করেছে, যা এ সরকারের সংবিধান স্বীকৃত আওতার বাইরে ছিল। এ সরকার বেশ কিছু সাধু উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু অগ্রাধিকার নির্ণয়ে প্রজ্ঞাহীনতা, পদ্ধতি নির্ধারণে অদূরদর্শিতা এবং অসংযমী আচরণের কারণে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানটি কার্যত রাজনীতি ও রাজনীতিক বিরোধী অভিযানে পরিণত ও পর্যবসিত হয় এবং অনিবার্যভাবেই এ সরকারকে তাৎপর্যহীন অগ্রগতির অবস্থানে থেকে সে উদ্যোগের সমাপ্তি টানতে হয়েছে। এতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেশ ক'জন রাজনীতিক অযথা এবং অন্যায়ভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন।

তা সত্ত্বেও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখর"দ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বস্ড়রে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে গুর"ত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছে। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য ছিল-ত্র"টিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন, যেখানে লক্ষাধিক ভুয়া ভোটার বাদ দিয়ে এ সরকার একটি সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, নিরাপদ ভোটকেন্দ্র, উন্নত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকল প্রকার সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ এক যুগান্ড়কারী পদক্ষেপ ছিল, যা এ সরকারকে বহুলভাবে প্রশংসিত এবং সর্বমহলে সমাদৃত করেছে। কেননা এ নির্বাচনই সকল শঙ্কা, সন্দেহ, অবিশ্বাসের অবসান ঘটিয়ে সত্যিকার অর্থে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেশবাসীকে উপহার দিয়ে পুনরায় দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নবম সংসদ নির্বাচন ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ নির্বাচন। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে ঘটে যাওয়া কালো অধ্যায়ের অবসান ঘটে এবং নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। দেশের সাধারণ জনগনের মাঝে যে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল তা দূর হয়ে নতুনভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দিকে দেশ ধাবিত হয়। কেননা ওয়ান/ইলেভেন এর পর দেশে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য এক বড় হুমকি। তথাপি বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম সংসদ নির্বাচন দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এক মাইলফলক। এ নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে যেমন ভূমিকা রাখে তেমনি সাধারণ জনগণের নতুন করে আশার সঞ্চার করে।

Z_¨mÎ I mnvqK MšcwÄ

১. Malek, Dr. S. A.*Post one Eleven perspectives : stream of Thoughts*, News and views publications, Dhaka, 2009, p.26.
২. দৈনিক সংবাদ, ২৯ অক্টোবর, ২০০৬
৩. দৈনিক সংবাদ, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬
৪. দৈনিক প্রথম আলো, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৬
৫. দৈনিক সংবাদ, ৯ জানুয়ারি, ২০০৭
৬. দৈনিক প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি, ২০০৭
৭. বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡‘‡ki mvaviY wbe©vPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৬৩-৬৮।
৮. সপ্তাহিক কাগজ, ১১ জানুয়ারি, ২০০৯
৯. দৈনিক প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি, ২০০৭
১০. দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি, ২০০৭
১১. দৈনিক সমকাল, ২১ এপ্রিল, ২০০৮
১২. তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫,পৃ.২৩৮-২৪০।
১৩. Election working Group (2007) *Bangladesh Ninth parliamentary Election, preliminary election observation report,* 03 January, 2009.
১৪. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের ওপর একটি পর্যবেক্ষনমূলক বিশেণ্ডষণ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯-১০।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৩।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।
১৭. বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡‘‡ki mvaviY wbe©vPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৬৩-৬৮।
১৮. The Daily Star, 30 December, 2008
১৯. আহমেদ, বোরহান উদ্দিন, cv_x , wbe©vPb G‡R›U, ‡cwjs G‡R›U Ges wbe©vPb mswkó KgKZv‡‘i ÁvZe¨ : RvZxq msm‘ wbe©vPb c×wZ AvBb I wewagvjv fvl¨, গোধূলি, ঢাকা, ২০০১ ।
২০. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২১. Gain, Philip (ed.) 2006, Handbook on Election reporting (3rd Edition). SEHD.
২২. তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫,পৃ.৩১-৩৩।
২৩. দৈনিক প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি, ২০০৯
২৪. বেগম, এস এম আনোয়ারা, ZËveavqK miKvi I evsjv‡‘‡ki mvaviY wbe©vPb, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.১৭০-১৭১।
২৫. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের ওপর একটি পর্যবেক্ষনমূলক বিশেণ্ডষণ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩১।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

Iô Aa¨vq

Dcmsnvi

গণমাধ্যম নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অনন্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। গণমাধ্যম এমন একটি শক্তি যা হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে। গণমাধ্যমই গণতন্ত্রে ভোটারদের তথ্যের জন্য সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। গণমাধ্যম নির্বাচনের নানা বিষয় তুলে ধরে জনগণ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারকে সচেতন করতে পারে। নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনেক। কিন্তু গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা কতখানি? গণমাধ্যম আসলেই কী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে? সংবাদ প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের আদৌ কী কোন নিরাপত্তা আছে? এ গবেষণাকর্ম থেকে রাজনীতিতে, বিশেষত নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কিত অনেক তথ্য যেমন বেরিয়ে এসেছে তেমনি এক্ষেত্রে গবেষণার বিভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামোরও উদ্ভব ঘটেছে। তবে গবেষণাটি দ্বারা নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকায় গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রন করার মানুষিকতা পরিহার, নির্বাচনী স্বচ্ছতা এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন প্রশ্নে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশ করার স্বাধীনতা, সংবাদকর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গণমাধ্যমের মালিক ও সম্পাদকদের রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে থাকা এবং রাষ্ট্রপক্ষকেও প্রভাব ও সেন্সরমুক্ত থাকার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস।

একটি কার্যকর সংসদ ও দক্ষ সরকার পেতে হলে ভোটারদেরকে প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তর ধারণা থাকা প্রয়োজন। দেশের বেশীরভাগ মানুষ নিরক্ষর । ফলে গণমাধ্যম প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হন তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততা সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করে জনগণকে সচেতন করতে পারে। মোট কথা নির্বাচনে সহিংসতা ও দুর্নীতি বিষয়ক রিপোর্ট গণমাধ্যমে আগে থেকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ভোটার তালিকার ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে গণমাধ্যম অনেক সংবাদই প্রকাশ করেছে। এধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে অনিয়ম কমার সম্ভাবনা দেখা দেয়। নির্বাচনের জরিপ একদিকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী সম্পর্কে জনগণের মতামত তুলে ধরে। অন্যদিকে নির্বাচনের সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থী সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে এই জরিপগুলো জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে মানুষ অনেক বেশী উৎকণ্ঠায় থাকে, এক্ষেত্রে গণমাধ্যম খুব দ্রুততার সাথে নির্বাচনী ফলাফল জানিয়ে দিতে পারে। প্রত্যেক নির্বাচনের আগেই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা, নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি এবং প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে ইশতেহার প্রকাশ করে। গণমাধ্যম এই ইশতেহারগুলো বিশ্লেষণ করে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রায়শই প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে সরকারকে জবাবদিহিতার জায়গায় দাঁড় করাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে গণতন্ত্রের উত্তরণের পথও সুগম হয়।

গণতন্ত্র অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পূর্বশর্ত হচ্ছে বৈধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হলো নির্বাচন। বাংলাদেশে আজ নির্বাচনের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব না হলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে না। আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগ শেষ বিচারের জনগণের ভোটের কাছে দায়বদ্ধ। এটা নিশ্চিত করতে অবাধ ভোটাধিকারের ব্যবস্থা থাকা জরুরী। এটাও নিশ্চিত করা দরকার যে, নিয়মিতভাবে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের একটি ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করতে পারে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম ভূমিকা রয়েছে। কেননা রাজনৈতিক দলগুলোই তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে। আর সাধারণ জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়ে থাকে। তাই বলা যায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতন্ত্র অর্জন সম্ভব নয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সেটি হচ্ছে গণতন্ত্র। নিরপেক্ষ নির্বাচন আজ বাঁধার সম্মুখীন। দেশ পুরোপরি স্বাধীন হয়েছে কিন্তু গণতন্ত্র তথা নিরপেক্ষ নির্বাচন পুরোপরি স্বাধীন হতে পারে নি। বাংলাদেশে বিগত সংসদ নির্বাচনসমুহ বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় নানা অভিযোগ, নানা অনিয়ম। নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে এদেশ থেকে কালো টাকার মালিক, অস্ত্রবাজ, সন্ত্রাসীদের দৌরাত্মসহ সকল অন্তরায় অনিয়ম বন্ধ হোক চিরদিনের জন্য। পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের পাশে বাংলাদেশ লাভ করুক একটি স্থায়ী সম্মানজনক গণতান্ত্রিক আসন। কোন দেশেই কেবল সরকারি দলের একক প্রচেষ্টায় ষোল আনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্য বিরোধীদলের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ যতবেশী স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হবে, গণতন্ত্রও ততবেশী প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এরশাদের নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসন ক্ষমতা পালাবদলের মাধ্যম হিসেবে সকল প্রকার নির্বাচন ছিল অগণতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হয়েছিল ধ্বংস। কিন্তু **১৯৯১** সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল গণতান্ত্রিক এবং এর মাধ্যমে জনগণ এরশাদের অগণতান্ত্রিক শাসনামলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সুতরাং পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ব্যবস্থায় জনগণের আত্মবিশ্বাস জড়িত ছিল এবং দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছিল এরশাদ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্যই। **১৯৯১** সালের সংসদ নির্বাচন জনগণের সেই আশা এবং প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রথমবারের মতো একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্বৈরাচারী অবসানের লক্ষ্যে সৃষ্ট তীব্র ও দুর্বার গণআন্দোলনে একটি সরকারের পতন ঘটলে সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিক্রমে একটি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব নির্ধারিত হয় দেশে একটি সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই প্রথমবারের মতো সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ভোটারগণ প্রথমবারের মতো তাঁদের ইচ্ছা ও মতাদর্শ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পান। অর্থাৎ তাঁদের সামনে অনেকগুলো বিকল্প কর্মসূচী ছিল যা পূর্বের অন্যান্য নির্বাচনে ছিল না। নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসন, সশস্ত্র

বাহিনী , পুলিশ ও আনসার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে প্রকৃত অর্থেই সুযোগ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। সরকারি প্রচার মাধ্যম যথা রেডিও ও টেলিভিশন এবং দেশের অধিকাংশ খবরের কাগজগুলো নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অনন্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম বাংলাদেশের জনগণ মুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবং নিজ নিজ ইচ্ছামত প্রার্থী নির্বাচন করে। এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ এবং নির্বাচনে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছিল অর্থপূর্ণ। সুতরাং পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক এবং দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এ নির্বাচনের ভূমিকা ছিল সূদুরপ্রসারী।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনকালে রাষ্ট্রীয় নির্বাহী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারই বলা হয়। কারণ এ সরকারটি সংবিধানের ৫৮(গ) অনুচ্ছেদের আওতায় শপথ নিয়েছিল। কিন্তু একজন প্রধান উপদেষ্টা ও ১০ জন উপদেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যেই এ নির্বাহী কর্তৃপক্ষটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে বিবেচিত হতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় নীতি সংশ্লিষ্ট নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং চলমান রাষ্ট্রীয় নীতি বদলে দেয়ার মত প্রচুর সিদ্ধান্ত এ সরকার গ্রহণ করেছে, যা সংবিধানে নির্দিষ্টভাবে বারণ করা হয়েছে। রেকর্ড পরিমাণ দীর্ঘ সময় দেশে জরুরী অবস্থা জারি রেখে এ সরকার আরও অনেক কাজ করেছে, যা এ সরকারের সংবিধান স্বীকৃত আওতার বাইরে ছিল। এ সরকার বেশ কিছু সাধু উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু অগ্রাধিকার নির্ণয়ে প্রজ্ঞাহীনতা, পদ্ধতি নির্ধারণে অদূরদর্শিতা এবং অসংযমী আচরণের কারণে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানটি কার্যত রাজনীতি ও রাজনীতিক বিরোধী অভিযানে পরিণত ও পর্যবসিত হয় এবং অনিবার্যভাবেই এ সরকারকে তাৎপর্যহীন অগ্রগতির অবস্থানে থেকে সে উদ্যোগের সমাপ্তি টানতে হয়েছে। এতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেশ ক'জন রাজনীতিক অযথা এবং অন্যায়ভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। তা সত্ত্বেও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছে। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন, যেখানে লক্ষাধিক ভুয়া ভোটার বাদ দিয়ে এ সরকার একটি সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, নিরাপদ ভোটকেন্দ্র, উন্নত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকল প্রকার সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল, যা এ সরকারকে বহুলভাবে প্রশংসিত এবং সর্বমহলে সমাদৃত করেছে। কেননা এ নির্বাচনই সকল শঙ্কা, সন্দেহ, অবিশ্বাসের অবসান ঘটিয়ে সত্যিকার অর্থে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেশবাসীকে উপহার দিয়ে পুনরায় দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নবম সংসদ নির্বাচন ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ নির্বাচন। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে ঘটে যাওয়া কালো অধ্যায়ের অবসান ঘটে এবং নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। দেশের সাধারণ

জনগনের মাঝে যে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল তা দূর হয়ে নতুনভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দিকে দেশ ধাবিত হয়। কেননা ওয়ান/ইলেভেন এর পর দেশে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য এক বড় হুমকি। তথাপি বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম সংসদ নির্বাচন দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এক মাইলফলক। এ নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে যেমন ভূমিকা রাখে তেমনি সাধারণ জনগণের নতুন করে আশার সঞ্চার করে।

mcwikgvjv

আধুনিককালে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন পরিচালনা কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা থাকা তাই অপরিহার্য। বাংলাদেশে গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু অনেক বছর যাবৎই নির্বাচন কমিশন আস্থার সংকটে পড়ে। আর এমনটি ঘটে প্রতিষ্ঠান হিসেবে আস্থাভাজন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কমিশনের নিজস্ব অক্ষমতার কারণেই।

আইনি ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী করাই যথেষ্ঠ নয়, সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই দৃঢ় বিশ্বাস, সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োজিত করতে হবে, যাতে তাঁরা জনগণের আস্থা বজায় রাখতে পারেন। এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালি থাকতে হবে, যাতে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিরা কোনো রকম দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ে চিহ্নিত না হন এবং প্রতিষ্ঠানটির ওপর ন্যস্ত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেন। জনগণের আস্থা অর্জনের পরই কেবল নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সফল নির্বাচনী সংস্কারের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। শুধু আইন জারির দ্বারাই নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবে না, এজন্য স্বাধীন মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চালকের আসনে বসাতে হবে। স্বাধীন শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের জন্য এটাই হচ্ছে প্রধান ও প্রাথমিক মানদন্ড।

সামগ্রিকভাবে নির্বাচন-ব্যবস্থা সম্পর্কে আন্তরিক মূল্যায়নের কোনো প্রচেষ্টাই করা হয়নি। অব্যাহত সংস্কার-প্রক্রিয়ার জন্য কোনো রকম গভীর বিশদ সমীক্ষা বা পদ্ধতিও নির্ধারণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে সুপারিশগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো -

- নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কাঠামোর উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়া।
- অব্যাহতভাবে সংস্কার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথাযথ পদ্ধতি তৈরি করা।
- সংবিধানে কিংবা কোনো আইনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য পদের প্রার্থীতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি নির্দিষ্ট করা।
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য একটি সাংবিধানিক আইন থাকা দরকার। একটি অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে বাছাই-প্রক্রিয়া শুরু করা হবে এবং সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতার সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ সংসদীয় কমিটি কর্তৃক প্রথমে তা অনুমোদিত হবে। সংসদীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন। এ প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত নিয়োগ সংশ্লিষ্ট সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে।
- নির্বাচন প্রক্রিয়া সংস্কারে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।
- নির্বাচনী ব্যয়-সংক্রান্ত বিষয় যাচাই ও পর্যবেক্ষণের জন্য নজরদারির পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।

- নির্বাচনী প্রচারকাজের জন্য প্রার্থী ও দলকে সরকারি তহবিল থেকে নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রনাধীনে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে, যার ফলে কালো টাকা ও অবৈধ উৎসের অর্থের ব্যবহার হ্রাস পাবে।
- নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট আইন করতে হবে।
- প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে নিয়োজিত পোলিং এজেন্টদের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতার বিষয়গুলা গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- নির্বাচনী ব্যয়-সম্পর্কিত নজরদারির জন্য টিম গঠন করতে হবে।
- নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন।
- নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার অবশ্যই সহায়তা করবে।
- নির্বাচন কমিশনের আইনের শাখাকে শক্তিশালী করতে হবে।
- যথাযথ নির্বাচন-ব্যবস্থা, অর্থাৎ সরল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা চালাতে হবে।
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে নিয়ে পরামর্শমূলক পদ্ধতি অব্যাহত রাখতে হবে।
- নির্বাচন কমিশনকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়সহ অন্যান্য তথ্য জনগনের জন্য উন্মুক্ত করতে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত।
- প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই করার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারা নির্বাচনী আইনে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রার্থীর নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে প্রচারণা চালাতে উৎসাহিত করা উচিত।
- সংবাদ-মাধ্যমে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ওপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করা উচিত।
- নাগরিক সমাজ ও নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞ সংস্থাকে প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।
- প্রার্থী এবং ভোটারদের নির্বাচনী আচরণ বিধি ও তা লঙ্ঘনজনিত শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে উদ্যোগ নিতে হবে।

একটি নির্বাচনকে সবার কাছে গ্রহনযোগ্য করার জন্য শুধুমাত্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকাই যথেষ্ট নয়, এই প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমের ভূমিকাও অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সুপারিশগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো -

- সম্পাদকীয় কাভারেজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধ, প্রবন্ধ, মতামত ও সাক্ষাতকার গ্রহণে পারদর্শীদের নিয়ে টিম গঠন। সম্প্রচার মাধ্যমের জন্য নির্বাচনী অনুষ্ঠান যেমন- আলোচনা, মতবিনিময়, টকশো, সাক্ষাতকার, বিতর্কসহ নানামুখী অনুষ্ঠান পরিচালনা ও উপস্থাপনায় পারদর্শীদের নিয়ে টিম গঠন।

- টেলিভিশন সংবাদকর্মীদের নির্বাচন বিষয়ক কোন অনুষ্ঠান ও সংবাদ কাভারেজের সময় ভিডিও ধারণ, দৃশ্য সংযোজন, বিয়োজন ও সম্পাদনায় তথা সার্বিক উপস্থাপনায় বিভিন্ন দল ও প্রার্থীর সংবাদে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।
- গোপন উৎসের ওপর ভিত্তি করে প্রার্থী ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রার্থী ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে শুধু দলীয় নেতা-কর্মীদের সাক্ষাতকার ও মতামত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত।
- নির্বাচনী কাভারেজে বিভিন্ন দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সময় ও স্থান বরাদ্দ করতে হবে।
- প্রতিবেদনে প্রার্থীদের সামাজিক কার্যক্রম,শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, অবদান, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক স্বীকৃতি তুলে ধরা যেতে পারে। এতে ভোটারদের প্রার্থী বাছাইয়ে সুবিধা হবে।
- প্রতিবেদক, অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী ও উপস্থাপককে সংবাদ পরিবেশন কিংবা অনুষ্ঠান পরিচালনায় নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে হবে।
- রাজনৈতিক দল কিংবা প্রার্থীর সরাসরি অংশগ্রহণে কোন টিভি অনুষ্ঠান যেমন আলোচনা, মতবিনিময়, টকশো, সাক্ষাতকার পরিবেশিত হলে তাতে সকল প্রার্থীর ও অংশগ্রহনকারীর সমান সুযোগ থাকা উচিত।
- সম্প্রচার সময়ের ক্ষেত্রে এবং পত্রিকায় ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা উচিত নয়।
- সংবাদ ও ছবি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক কুটকৌশল অবলম্বন করে কারো ছবি ও প্রতীককে খাটো ও বিকৃত করে উপস্থাপন করা যাবে না। ছবি উপস্থাপনায় সমান ট্রিটমেন্ট দিতে হবে।
- নির্বাচনী সংবাদের ক্ষেত্রে মানুষ বরাবরই টেলিভিশনকে বেশী পছন্দ করে বলে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর দায়িত্বও বেড়ে যায়। আমাদের দেশের টিভি চ্যানেলগুলো রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণমূলক বিতর্ক অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ।
- নির্বাচন এলেই এক শ্রেণীর ব্যক্তি গণমাধ্যম কর্মীদের সমাদর বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পত্রিকায় ছবিসহ সংবাদ প্রকাশের চেষ্টা চালান। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের, বিশেষ করে জেলা ও থানা পর্যায়ের সংবাদকর্মীদের অনেক সচেতন থাকতে হবে। বিষয়টি কেন্দ্র থেকেও মনিটর করা উচিত।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রতি সুপারিশ গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন বিষয়ক কাভারেজে যেমন গণমাধ্যমের মালিক ও সম্পাদকদের রাজনৈতিক পরিচয়ের চাপমুক্ত হতে হবে, তেমনি প্রভাব ও সেন্সরমুক্ত হতে হবে রাষ্ট্রপক্ষ থেকেও। গণমাধ্যমের জন্য স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ সৃষ্টির পরিবর্তে নির্বাচন কমিশন গণমাধ্যমের দায়-দায়িত্বকে সীমিত করার চেষ্টা না করে ব্যাপক করার দিকে নজর দিবে। দেশী গণমাধ্যমকর্মী, ব্যবস্থাপক ও বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করে নির্বাচনের সময়ে গণমাধ্যমের কার্যাবলীকে আরও কীভাবে কার্যকর ও জনহিতকর করা যায় সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন ও সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

Z_¨mÎ I mnvqK MšcwÄ

আহমদ, এমাজউদ্দীন, (সম্পাদনা) evsjv‡`k msm`xq MYZš¿ t cvmwb½K wPšÍv fvebv, করিম বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ.১।

আহমদ, এমাজউদ্দিন, evsjv‡`‡k MYZš¿, M‡el‡Ki `ó‡Kvb, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আহমেদ, বোরহান উদ্দিন, cv_x , wbevPb G‡R›U, ‡cwjs G‡R›U Ges wbevPb mswkøó KgKZv‡`i ÁvZe¨ : RvZxq msm` wbevPb c×wZ AvBb I wewagvjv fvl¨, গোধূলি, ঢাকা, ২০০১ ।

আকরাম , শাহজাদা, সাধন কুমার দাস ও তানভীর মাহমুদ (২০০৮) RvZxq msm` I msm` m`m¨‡`i fwgKv-RbM‡Yi cZ¨vkv, টিআইবি ।

কলিমুল্লাহ, নাজমুল আহসান, wbevPb ch‡eÿY; wZbwU bgbv wbfi GKwU e¨wóK we‡kølY, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫।

খান, মিজানুর রহমান, msweavb I ZËvevqK miKvi weZK, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

জাহাঙ্গীর, মুহম্মদ (গ্রন্থণা ও সম্পাদনা) MYZš¿, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫।

টিম, ফাদার আর ডব্লিউ ও গাইন, ফিলিপ, ÒwbevPb ch‡eÿY wi‡cvU 1991Ó বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, সেপ্টেম্বর -১৯৯১, পৃ. ৬৫-৬৯।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, beg RvZxq msm` wbevPb cwµqv wbixÿv, ২০১০, ঢাকা পৃ.১-১০।

ঠাকুর, আবদুল হান্নান, wbevPb, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.১১১-১২৯।

তথ্যপঞ্জি, নির্বাচনী রিপোর্টিং, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, সেড, ১৯৯৫,পৃ.২৩৮-২৪০।

তাহ্মিনা, কিউ এ ও গাইন, ফিলিপ, mvsew`K mnwqKv ÒZ\_¨cwÄ wbevPbx wi‡cwUsÓ evsjv‡`‡ki msm`xq wbevP‡b cvmwb½K Z_¨ I cUfwg, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, (সেড), ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.-৩৪, ৫০-৫৪।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের ওপর একটি পর্যবেক্ষনমূলক বিশ্লেষণ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯-১০।

ফেরদৌস, রোবায়েত ও আনওয়ারুস মুহাম্মদ, MYgva¨g/ †kbxgva¨g, শ্রাবন, ঢাকা,২০০৯।

ফেরদৌস, রোবায়েত, সাইফুল আলম, মোহাম্মদ, ও হক, সাইফুল, `bxwZ, mkvmb I AbmÜvbx mvsew`KZv, টিআইবি, ঢাকা, ২০১৫।

ফেমা, RvZxq msm` wbevP‡b †cwjs G‡R‡›Ui `wqZ I KZe¨, মে ২০০৬, ঢাকা , পৃ.৭।

বেগম, এস এম আনোয়ারা, ÒZËvevqK miKvi I evsjv‡`‡ki mvaviY wbevPbÓ, অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৮-৪৭ ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন msm` wbevPb Abôvb cwiPvjbvi D‡Ï‡k¨ wiUwbs AwdmviM‡Yi Rb¨ wb‡`kvejx (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ অনুসারে প্রণীত), ঢাকা।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, wbevPbx AvB‡bi ms®vi wel‡q wbevPb Kwgk‡bi Lmiv mcwikgvjv, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা, ২০০৭ ।

ভূঁইয়া, এম সাইফুল্লাহ ও মোঃ ফয়সাল, "wbevPb I MYZš¿ t †cÿvcU evsjv‡`kÓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪,অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৯।

মনিরুজ্জামান, তালুকদার, evsjv‡`‡k MYZ‡š¿i msKU:, GKwU we‡kølY, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ.১৭।

মাছউদ, এ. আর, wbevPb AvBb, প্রকাশক: আক্তার শিরিন মাছউদ, ঢাকা, ১৯৯৭।

মঞ্জু, কামরুল হাসান, হীরা, মান্নান ও ইসলাম, শেখ শফিউল, Ôg³ cKvkÕ ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৮, পৃ.৭-৮, ১২-১৫,২১-২৬।

মজুমদার, বদিউল আলম (২০০৮), (সম্পাদিত) msm' wbevPb msµvšÍ AvBb, সুজন- সুশাসনের জন্য নাগরিক, ঢাকা।

মোস্তফা, মনোয়ার, MYZš¿, wbevPb I bvMwiK‡'i fwgKv GKwU mgxÿv , ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি), ঢাকা,২০০৬।

রেজা, ইসতিয়াক, MYgva¨g fvebv, কথাপ্রকাশ , ঢাকা, ২০১৩, পৃ.২৪-২৬।

রহমান, বিচারপতি লতিফুর, ZËveavqK miKv‡ii w'b¸wj I Avgvi K_v, অক্টোবর, ২০০৩।

শিকদার, আবদুর রব, evsjv‡'k beg RvZxq msm' (2000 - 2014) আগন্তুক, ঢাকা, ২০০২।

শহীদুল্লাহ, এ.কে.এম. বাংলাদেশ সংসদীয় নির্বাচন ১৯৯১, অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা, করিম বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.১৯-২১।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, MYZ‡š¿i weRq †nvK, evsjv‡'‡k gbI¨‡Zi msKU, বিদ্যাপ্রকাশ, ২০০৯, ঢাকা।

হায়দার, শাওন্তী, ও সামিন, সাইফুল, MY‡hvMv‡hvM ZË I c‡qvM, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা,২০১৪।

হক, মোঃ মোজাম্মেল, ivRbxwZ-wbevPb, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.৫৫৪।

হোসেন, এম সাখাওয়াত, evsjv‡'‡k wbevPbx ms¯'vi (1972-2008), প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৯।

হোসেন, সাখাওয়াত, wbevPb Kwgk‡b cvP eQi, (2007-2012), পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩।

হোসেন, ড. নাজমুল ও এল, ড. ক্যারেন ÔB‡jKkb gwbUwis IqwKs Mæc (BGgWweeøDwR) cwZ‡e'bÕ দি এশিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই-২০০২, পৃ.১৩।

হোসেন, এম. সাখাওয়াত (অব.) ÔwbevPb Kwgk‡b cvP eQiÕ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা,২০১৩, পৃ. ২০৬-২১২।

হোসেন, আমজাদ, evsjv‡'‡ki ivRbxwZ I ivR‰bwZK 'j, প্রকাশক: রবি আহমেদ, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬।

হালিম, আব্দুল, msweavb, mvsweawbK AvBb I ivRbxwZ,ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.১৭০।

Ali, Raisa, *Representative Democracy and concept of Free and Fair Election,* Deep & Deep Publications, New Delhi, 1996, p.20.

Ahmed, Nizam, *Non-party caretaker Government in Bangladesh : Experience and Prospect,* UPL, Dhaka, 2004, p. 33-34.

Akhter, Muhammad Yeahia, *Electoral Corruption in Bangladesh,* Ashgate Publication, Dhaka, 2001, p.3.

Bangldesh Election commission : *Election Activity Report, Parliamentary Elections,* 1991.

Blumler & Gurevitch, '*Political Effects of Mass Communication'*, 1983, P-245.

Commonwealth Observer Group, *1991, Parliamentary Elections in Bangladesh: The report of the Commonwealth Observer Group.* Commonwealth Secretariat, London.

Dreyer & Rosenbaum, Roper Organization, '*An extended View of Public Attitudes Towards Television and other Media'*, 1969-71, P.153.

Dahl, Robert *A, Democracy and Its critics,* Yale University Press, 1989, p.109.

Election working Group (2007) *Bangladesh Ninth parliamentary Election, preliminary election observation report,* 03 January, 2009.

Finer, S.E. *Comparative Government*, Penguin press, Great Britain, 1970, p.66.

Gain, Philip (ed.) 2006, *Handbook on Election reporting* (3rd Edition). SEHD.

Gain, Philip, Dhaka courier, September 20-26, 1991, by –elections: Return to past Follies.

Hossain, Monowar, 1992, *A study on voter Behaviour in Bangladesh durring 1990 and 1991 Election.*

Hakim, Muhammad A., *Bangladesh Politics*, The University Press Limited, Dhaka, 1993, p. 46.

Hossain, Monowar, 1992. *A studuy on voter behabiour in Bangladesh during 1990 and 1991 Elections*.

Huntington, Samuel P. : *Democracy's third wave, JOURNAL OF DEMOCRACY*, Spring, 1991.

Hasanuzzaman, Al Masud, *Role of opposition in Bangladesh Politics,* UPL, Dhaka, 1998, p. 179.

Harun, Shamsul Huda, *Bangladesh Voting Behaviour: A psephological Study*, 1973.

Huntington, Samuel P., *The Third wave : Democratization in the late twentieth century,* University of Oklahama Press, 1991, p.67.

Harrop, M. and Miller, W. L., *Elections and voters: A comparative Introducation,*
Macmillan Education, London, 1994, p.245-246.

Jahan, Rounaq, *Pakistan Failure in National Integration*, columbia university press, New York, 1972.

Jahan, Rounaq, *Bangladesh Politics, Problem and Issues*, (Dhaka: University Press, 1980) p.183-185.

Lincoln, Abraham, *Famous Speeches of Abraham Lincoln,* p.147.

Mackenzie, W.J.M, *Free Election : An Elementary Text Book,* London, 1964, P. 159.

Maniruzzaman, Talukdar, *Politics and Security of Bangladesh,* UPL, p.149-153.

Malek, Dr. S. A.*Post one Eleven perspectives : stream of Thoughts,* News and views publications, Dhaka, 2009, p.26.

Mannan, Md. Abdul, *Elections and Democracy in Bangladesh,* Academic press and Publishers library Dhaka, 2005, p.48.

Quoted in Mohajan, V.D., *Recent Political thought,* S. Chand & Company Ltd., New Delhi, 1990, p.65.

Rahman, Md. saidur, *Law on Election in Bangladesh,* Dhaka-2001. p. xi.

Sabine, George H, *A History of Political Theoroy,* Henry Holt and company, New York, 1959. p. 47

Schumpeter, Joheph, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Union Paper backs, 1987, p.269.

Sargent, Lyman Tower, *Contemporary, Political, Ideologies : Comparative analysis,* 1981, p.131

Taylor, R.H. (ed.) *The Politics of Elections in south East Asia,* woodrow willson center Press, New York, 1996, p.3.

The Encyclopedia of Britannica, vol-6, University of Chicago, Chicago, p. 5-6.

Timm, R.W.and Gain, Philip CCHRB, 1991, *Election Observation Report, Election to the 5th Parliament, 1991.*

W.F.Willoughby, The *Government of modern states,* West View Press, New York, p.114

cwÎKvmgn

অল ইন্ডিয়া রিপোর্ট, ১৯৮৩, পৃ. ১১৫১

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১ জুন, ১৯৯০

দৈনিক সংবাদ, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯০

দৈনিক সংবাদ, ২১ মার্চ, ১৯৯০

বাংলাদেশ টাইমস, ২ মার্চ, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জানুয়ারি, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জানুয়ারি, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জানুয়ারি, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জানুয়ারি, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ মার্চ, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ মার্চ, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ মার্চ, ১৯৯১

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ, ১৯৯১

The Bangladesh Observer, 6 January, 1991

The Bangladesh Observer, 9 January, 1991

The Bangladesh Observer, 12 January, 1991

The Bangladesh Observer, 28 January, 1991

The Bangladesh Observer, 8 February, 1991

The Bangladesh Observer, 19 February, 1991
The Bangladesh Observer, 21 February, 1991
The Bangladesh Observer, 25 February, 1991
The Bangladesh Observer, 27 February, 1991
The Bangladesh Observer, 28 February, 1991
The Bangladesh Observer, 5 March, 1991
The Bangladesh Observer, 9 March, 1991
The Bangladesh Observer, 19 March, 1991
The Bangladesh Observer, 4 August, 1991
The Bangladesh Observer, 19 August, 1991
The Bangladesh Observer, 21 August, 1991
The Bangladesh Times, 23 February, 1991
The Bangladesh Times, 27 February, 1991
The Daily Bangladesh Observer, 15 June 1996
দৈনিক সংবাদ, ৫ মে ,১৯৯৬
দৈনিক সংবাদ, ৯ অক্টোবর, ২০০৬
দৈনিক সংবাদ, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬
দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ নভেম্বর, ২০০৬
দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর, ২০০৬
দৈনিক প্রথম আলো, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৬
দৈনিক প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৬
দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৬
দৈনিক সংবাদ, ২৯ অক্টোবর, ২০০৬
দৈনিক যুগান্তর, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৬
দৈনিক যুগান্তর, ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৬
দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক সংবাদ, ৯ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৭
দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি, ২০০৭

দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৭

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ নভেম্বর, ২০০৮

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ নভেম্বর, ২০০৮

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ ডিসেম্বর, ২০০৮

দৈনিক যুগান্তর, ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৮

দৈনিক যুগান্তর, ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৮

দৈনিক প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি, ২০০৮

দৈনিক প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর, ২০০৮

দৈনিক প্রথম আলো, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৮

দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৮

দৈনিক প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর, ২০০৮

দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ নভেম্বর, ২০০৮

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ নভেম্বর, ২০০৮

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ নভেম্বর, ২০০৮

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ নভেম্বর, ২০০৮

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ নভেম্বর, ২০০৮

দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৮

দৈনিক সমকাল, ২১ এপ্রিল, ২০০৮

দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৮

The Daily Star, 21 September, 2008

The Daily Star, 18 December, 2008

The Daily Star, 19 December, 2008

The Daily Star, 30 December, 2008

দৈনিক প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি, ২০০৯

দৈনিক প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি, ২০০৯

দৈনিক প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি, ২০০৯

দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জানুয়ারি, ২০০৯

cwiwkó

cwiwkó-1

আলোচ্য গবেষণাটিতে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। কেননা কোন গবেষণাকর্ম একটিমাত্র পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। তাই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য সাক্ষাতকার পদ্ধতি ও কন্টেন্ট এ্যানালাইসিসসহ অন্যান্য পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই ধরণের তথ্যই সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের জন্য উদ্দেশ্যভিত্তিক পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালার আলোকে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মতামত সাক্ষাতকারের মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের উৎসের সাক্ষাতকার ও মতামত জরিপের জন্য বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ৫৫ জন উত্তরদাতা থেকে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ

১। নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, পর্যবেক্ষক ও নির্বাচন কমিশনের কর্মকতা-১০ জন

২। গণমাধ্যমের সাংবাদিক (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া)-৩০ জন

৩। সাধারণ জনগণ তথা ভোটার-১৫ জন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকার ক্ষেত্রে উপরোক্ত তিন ধরণের নাগরিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পেশা, অবস্থান, লিঙ্গ, বয়স, প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদার ব্যক্তিকে সাক্ষাতকার ও প্রশ্নমালার আবদ্ধ উন্মুক্ত পদ্ধতিতে মতামত সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে নিম্নোক্ত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে।

cwiwkó-2

wbevP‡b MYgva¨‡gi fwgKv t †cwÿ Z evsjv‡‘k (1991-2008)

নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, পর্যবেক্ষক ও নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা

গ্রুপ : 'ক'

সাক্ষাতকারদাতার পরিচিতি ঃ

১. নাম ঃ

২. পেশা ঃ

৩. ঠিকানা ঃ

৪. ফোন নম্বর ঃ

৫. প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

৬. পদমর্যাদা ঃ

প্রশ্ন ঃ ১. অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণ বিধি কতটুকু মেনে চলেন?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ ২. একটি নির্বাচনকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কিরূপ ভূমিকা হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ মতামত দিন .....

প্রশ্ন ঃ ৩. নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে গণমাধ্যমের নিকট থেকে আপনি কাঙ্খিত সহযোগিতা পান কিনা?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ ৪. গণমাধ্যমকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া কভার করতে আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন।

উত্তর ঃ মতামত দিন .....

প্রশ্ন ঃ ৫. প্রার্থী, ভোটার এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের নির্বাচনী আচরণ বিধি ও তা লঙ্ঘনজনিত শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকার, কমিশন ও গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা পালন করা উচিত।

উত্তর ঃ মতামত দিন .....

wbevP‡b MYgva¨‡gi fwgKv t †cwÿZ evsjv‡`k (1991-2008)

গণমাধ্যমের সাংবাদিক (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া)

গ্রুপ : ‘খ’

সাক্ষাতকারদাতার পরিচিতি ঃ

১. নাম ঃ

২. পেশা ঃ

৩. ঠিকানা ঃ

৪. ফোন নম্বর ঃ

৫. প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

৬. পদমর্যাদা ঃ

প্রশ্ন ঃ ১. নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নে আপনার সঠিক তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা কতটুকু?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ ২. গণমাধ্যমই গণতন্ত্রে ভোটারদের তথ্যের জন্য সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

উত্তর ঃ মতামত দিন ....

প্রশ্ন ঃ ৩. নির্বাচনের সময়ে একজন সাংবাদিক বা গণমাধ্যম বা আপনার প্রতিষ্ঠান কী আসলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে?

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে মতামত দিন ....

প্রশ্ন ঃ ৪. সংবাদ প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের আদৌ কি কোনো নিরাপত্তা আছে?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ ৫. গণমাধ্যম নির্বাচনের নানা বিষয় তুলে ধরে জনগণ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সরকারকে সচেতন করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে পারে।

উত্তর ঃ আপনার মতামত দিন...

wbevP‡b MYgva¨‡gi fwgKv t †cwÿZ evsjv‡‘k (1991-2008)

সাধারণ জনগণ (ভোটার)

গ্রুপ : ‘গ’
সাক্ষাতকারদাতার পরিচিতি ঃ

১. নাম ঃ

২. পেশা ঃ

৩. ঠিকানা ঃ

৪. ফোন নম্বর ঃ

৫. প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

৬. পদমর্যাদা ঃ

প্রশ্ন ঃ ১. নির্বাচন সম্পর্কে গণমাধ্যম যথাযথ ভূমিকা পালন করে কিনা?
উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ ২. গণমাধ্যমই গণতন্ত্রে ভোটারদের তথ্যের জন্য সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে মতামত দিন ....

প্রশ্ন ঃ ৩. আপনি কি মনে করেন, নির্বাচনে গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ ৪. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর ঃ মতামত দিন ....

প্রশ্ন ঃ ৫. গণমাধ্যম নির্বাচনে দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে আপনাকে সজাগ ও সচেতন করতে পারে। আপনি কি এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত?

উত্তর ঃ

cwiwkó-3

MYcRvZšx evsjv‡'k msweav‡b ZËveavqK miKvi

Ab‡"Q' : 58 L| নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার : (১) সংসদ ভাঙ্গিয়া দেয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভঙ্গ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে। (২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকটি দায়ী থাকিবেন। (৩) (১) দফায় উল্লিখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা ৫৮ ঘ (১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎ-কর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে। (৪)৫৫ (৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় অভিযোগ সহকারে) (১) দফায় উল্লিখিত মেয়াদ একইরূপ বিধানাবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে ।

Ab‡"Q' : 58 M| নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন, উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ইত্যাদি।

১। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

২। সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা ভঙ্গ হইবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হইবেন এবং যে তারিখে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেয়া হয় বা ভঙ্গ হয় সেই তারিখ হইতে যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেয়ার বা ভঙ্গ হইবার অব্যাবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রীসভা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

৩। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাহাঁকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যাবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

৪. যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত বিচারক পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে সর্বশেষ অনুরূপ বিচারকের অব্যবহিত পুর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

৫. যদি আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি যতদূর সম্ভব প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

৬. এই পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি ৩,৪,৫ দফাসমূহের বিধানাবলীকে কার্যকর করা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীন তাহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন

7. ivócwZ

ক. সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য;

খ. কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অঙ্গীভূত কোন সংগঠনের সদস্য নহেন;

গ. সংসদ-সদস্যদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নহেন এবং প্রার্থী হইবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হইয়াছেন;

ঘ. বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন এই রূপ ব্যক্তিগনের মধ্য হইতে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

৮. রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগ দান করিবেন।

৯. রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

১০. প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা এই অনুচ্ছেদের অধীন উক্তরূপ নিয়োগের যোগ্যতা হারাইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবে না।

১১. প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন।

১২. নতুন সংসদ গঠিত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

Ab‡”Q‘ 58 N| wb‘jxq ZËveavqK miKv‡ii Kvhvejx t

(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবে এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কশিন সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

Ab‡”Q‘ 58 0| msweav‡bi KwZcq weav‡bi AKvhKiZv t

এই সংবিধানের ৪৮ (৩), ১৪১ ক (১) এবং ১৪১ গ (১) অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন ৫৮ খ অনুচ্ছেদের (১) দফার মেয়াদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তাঁহার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণান্তে কার্য করার বিধান সমূহ অকার্যকর হইবে।

cwiwkó-4

msm‘ wbevP‡b ivR%bwZK ‘j I cv_xi AvPiY wewagvjv, 2008

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ৩ আশ্বিন ১৪১৫ / ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৬৯- আইন/২০০৮।- The Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91B এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১| wk‡ivbvg I ceZb|- (১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২| msÁv।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালা-

(ক) ''নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল'' অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.0. No. 155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল ;

(খ) উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংসদের কোনো আসন শূন্য ঘোষণা হইবার পর হইতে উক্ত আসনের জন্য অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(গ) "প্রার্থী" অর্থ কোনো নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি;

(ঘ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা।

3| †Kv‡bv cwZôv‡b Pv‘v, Ab‘vb BZ¨w‘, c‘vb wbwl×|- কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বা অন্যত্র অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে পারিবে না।

4| mwKU nvDR, WvK-evs‡jv, BZ¨w‘ e¨envi|- (১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোনো সরকারি কার্যালয়কে কোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোনো ব্যক্তিকে সরকারি ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা এবং Warrant of procedure ও প্রাধিকার অনুযায়ী সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনা কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সর্কিট হাউজ ব্যবহারে অগ্রাধিকার পাবেন।

5| wbe©Pbx cPviYv |- নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে বিধি ৬ হইতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

6| mfv mwgwZ Abôvb msµvšÍ evav wb‡la|- কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না;

খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;

গ) সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না;

ঙ) কোনো সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোন গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজনকারী পুলিশের শরনাপন্ন হইবেন এবং এই ধরণের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

7| †cv÷vi, wjd‡jU ev n¨vÛwej e¨envi msµvšÍ evav wb‡la : (১) কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোনো প্রকার পোস্টার , লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথা-

ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদুৎ ও টেলিফোনের খুটি বা অন্য কোনো দন্ডায়মান বস্তুতে;

খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং

গ) বাস, ট্রাক, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোনো প্রকার যানবাহনে; তবে শর্ত থাকে যে, দেশের যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।

২। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টর, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

৩। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন ২৩"×১৮" এর অধিক হইতে পারিবে না এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পোস্টারে তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবে না ।

৪। উপ- বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেই ক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারবে।

৫। উপ- বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত ছবি সাধারণ ছবি (Potrait) হইতে হইবে এবং কোনো অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থণারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোনো অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

৬। নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত সাধারণ ছবি (Potrait) এর আয়তন ২৩"×১৮" এর অধিক হইতে পারিবে না।

৭। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না ।

8| hvbevnb e¨envi msµvšÍ evav wb‡la| - কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) কোনো ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনোরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;

(গ) নির্বাচনী প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার কিংবা অন্য কোনো আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার কিংবা অন্য কোনো প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন কিংবা বিতরণ করিতে পারিবে না;

(ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবেন না।

9| †‘Iqvj wjLb msµvšÍ evav wb‡la| - কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার চালাইতে পারিবেন না; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোনো দালান, থাম , বাড়ি বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক-দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন কিংবা অন্য কোনো স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোনো লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

10| †MBU ev †ZviY wbgvY, c¨v‡Ûj ev K¨v¤ú ¯vcb I Av‡jvKm¾vKiY msµvšÍ evav wb‡la|-

কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবে না কিংবা চলাচলের পথে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোনো প্যান্ডেল তৈরি করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোনো সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোনো বক্তব্য বা কোনো শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(চ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনোরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনোরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।

11| D¯wbgjK e³e¨ ev weewZ c'vb, D"Q•Lj AvPiY Ges we‡¯dviK enb msµvšÍ evav wb‡la|- কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি-

ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হরণ করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোনো ধরণের তিক্ত বা উস্কানিমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা আ ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

খ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগিরকের জমি, ভবন বা অন্য কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারাও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না;

ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং Arms Act, 1978 এর সংজ্ঞায় অর্থে Fire Arms বা অন্য কোনো Arms বহন করিতে পারিবেন না।

12| cPviYvi mgq| - কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে জন্য কোনো ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্যে নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না;

13| gvBK e¨envi msµvšÍ evav wb‡la|- কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি অন্য কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮(আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

14| miKvwi mweav‡fvMx KwZcq e¨w³i wbevPbx cPviYv msµvšÍ evav wb‡la|- (১) সংসদের কোন শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারের কোনো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী

কিংবা উক্ত মন্ত্রীদের পদমর্যাদা সম্পন্ন সরকারি সুবিধাভোগী কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন পূর্ব সময়ের মধ্যে কোনো সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না, তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্বাচনী এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।

(২) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনী এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোথাও কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

15| wbewPbx e¨qmxgv msµvšÍ evav wb‡la|- কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোনো অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

16| †fvU‡K‡›` c‡ekwaKvi (১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশণ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোনো রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

17| wbewPb ce Awbqg|- (১) এই বিধিমালার যে কোনে বিধানের লঙ্ঘন 'নির্বাচন' পূর্ব অনিয়ম' হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্ত রূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশনের বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোনো নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোনো তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে কমিশনের নিকট কোনো নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন

(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোনো নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা

(খ) তাৎক্ষনিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪। উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি Represtntation of the people order, 1972 (p.o.No. 155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবর সুপারিশ প্রদান করিবে।

18| wewagvjvi weavb j•Nb kw¯Í‡hvM¨ Aciva|- (১) কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

19| i‖nZKiY| - নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ৬০ আইন/৯৬, তারিখ **১৩** বৈশাখ **১৪০৩** মোতাবেক ২৬ এপ্রিল **১৯৯৬** দ্বারা জারিকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় বিধিমালা, **১৯৯৬** এতদ্বারা রহিত করা হইল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে
মুহম্মদ হুমায়ূন কবির
সচিব।

cwiwkó-5

RvZxq msm‘ wbevPb, 1973-2008

wbevP‡bi ZwiL	‡fvU‡K‡›‘i msL¨v	‡cwjs KgKZv‡‘i msL¨v
৭ মার্চ, ১৯৭৩	১৫,০৮৪	১,৯২,৪২৩
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯	২১,৯০৫	২,২৩,৩৫৫
৭ মে,১৯৮৬	২৩,২৭৯	২,৯২,৭২৭
৩ মার্চ, ১৯৮৮	তথ্য পাওয়া যায়নি	২,৮৩,২৩৭
২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১	২৪,১৫৪	৩,৬০,৯৮৫
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬	২১,১০৬	৩,১৪,৪৮০
১২ জুন ১৯৯৬	২৫,৯৫৭	৩,৭০,২০৪
১ অক্টোবর ২০০১	২৯,৯৭৮	৪,৭৭,৮৪২
২৯ ডিসেম্বর ২০০৮	৩৫,২৬৩	৫,৬৭,১৯৬